গোপাল হালদার

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৭

দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৯

তৃতীয় সংস্করণ :—শ্রাবণ, ১৩৬৪

প্রকাশক : শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর : মন্মথনাথ পান

কে. এম. প্রেস

১।১, দীনবন্ধু লেন

কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট-শিল্পী

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ :

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা পঞ্চাশ ন. প.

স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র
ও
স্বর্গীয় সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের
উদ্দেশে

নিবেদন

এই গ্রন্থের ঘটনাকাল [illegible]। লেখার পরিকল্পনা তখন হইতেই মাথায় ছিল, কিন্তু লেখা হইয়া উঠিল ১৯৪৮-এর মে-জুনে, প্রেসিডেন্সি জেলে।

যাঁহারা 'একদা' পড়িয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই বুঝিবেন—এই গ্রন্থ তাহারই পরার্ধ। ইহাও বুঝিবেন—সেই অর্ধের মতই এই অর্ধও আবার স্বতন্ত্র, স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

বলা নিষ্প্রয়োজন—গ্রন্থের কোনো চরিত্রই যেমন মিথ্যা নয়, তেমনি পরিচিত বা অপরিচিত কোনো ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গেই তাহার সম্পর্ক নাই। ইতি

৫ই মে, ১৯৫০ লেখক

তৃতীয় সংস্করণের কথা

তৃতীয় সংস্করণে 'অন্যদিন' পরিবর্তিত হয় নাই, কিন্তু অনেক স্থলে পরিশোধিত হইয়াছে।

আর-একটি কথা বলা প্রয়োজন: 'অন্যদিন' আসলে স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রন্থ। কিন্তু তাহা 'একদা'র 'পরার্ধ' নয়; 'একদা' ও 'আর-একদিনের' ত্রিপার্বিক কাহিনীর মধ্যপর্ব। ইতি

৭ই আগস্ট, ১৯৫৭ লেখক

লেখকের অন্যান্য বই :

কথা-সাহিত্য :

একদা ; আর-একদিন ; পঞ্চাশের পথ ; উনপঞ্চাশী ; তেরশ' পঞ্চাশ ; ভাঙন ; স্রোতের দীপ ; 'উজান গঙ্গা'; ধূলিকণা ; (গল্প-সংগ্রহ) ইত্যাদি

প্রবন্ধ-সাহিত্য :

সংস্কৃতির রূপান্তর ; বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা ; স্বপ্ন ও সত্য ; আড্ডা ; বাঙলা সংস্কৃতি-প্রসঙ্গ ইত্যাদি।

বিশ্ববিদ্যালয়

১

প্রাঙ্গণ পার হইয়া শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে প্রভাত-আকাশের প্রথম দূত।

চোখ মেলিতে না মেলিতে অমিতের চোখে আসিয়া পড়িল আর-একটি দিনের আলো। আশ্চর্য বাঙলাদেশ, আশ্চর্য তার শরৎ কাল! সাত দিন বুঝি আজ? না আট দিন? প্রতিদিন প্রভাতে চোখ মেলিতেই আগ্রহভরে অমিত তাকাইয়াছে বাহিরের প্রাঙ্গণের দিকে, দেখিয়াছে নূতন দিনের আলোক আসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে সেই প্রাঙ্গণের শিশিরার্দ্র ঘাসে, বর্ষা-বিধৌত অশ্বত্থের পাতায়, সম্মুখের স্তব্ধ-নিথর পুকুরের জলে, আর প্রাচীর-পারের দূর ঝাউগাছের চূড়ায়। আট দিনের প্রভাত আজ—নিদ্রাজড়িত চোখের উপর আজও লাগিয়া গেল শরতের সোনা-মাখানো দিনের মায়া। সমস্ত মন ও দৃষ্টি আজও বলিয়া উঠিল—আশ্চর্য বাঙলাদেশ, আশ্চর্য তার শরৎ কাল। কত সাধারণ, আর কত অসাধারণ তাহা। সাত দিন আগেকার প্রভাতে এ সত্য এমনি সবিস্ময়ে অমিত মানিয়াছিল চলন্ত ট্রেনের কামরা হইতে। আসানসোল ছাড়াইয়া তখন উদীয়মান সূর্যের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে দিল্লী এক্সপ্রেস; আবদ্ধ কামরার পিঞ্জর হইতে অমিত দেখিল—বাঙলাদেশ!—শরৎ কালের বাঙলাদেশ। কত কাল দেখে নাই তাহা অমিত। কিন্তু দেখিয়াছেও কত বার আগে। তথাপি এ যেন আর দেখা নয়—আবিষ্কার। এ যেন আর পরিচিত পথ-ঘাট-প্রান্তর নয়,—এক আবির্ভাব! দেখিয়াও তাই শেষ করা যায় না এ দেখা—শেষ করা যায় না কোনো দেখা।···কোনো দেখাই শেষ করা যায় না—অমিতের মুগ্ধ দৃষ্টি যেন এই প্রভাতের প্রাঙ্গণের দিকে তাকাইয়াও

তাহাই আবার স্বীকার করিতেছে : দেখিয়া শেষ করা যায় না কাহাকেও—আকাশকে নয়, পৃথিবীকে নয়, আলোককে নয়, অন্ধকারকে নয়, মানুষকে নয়, পশু-প্রাণীকে নয় ; কোনো দেখারই শেষ নাই।

আশ্চর্য বাঙলাদেশ! আশ্চর্য তার শরৎ কাল! কথা না বলিয়াও কথা কহিয়া উঠিল অমিতের মন।

এমন দিনের আগমনী গাইবে না, অমিত?

অমিত আর স্থির থাকিতে পারিল না। বিছানা ছাড়িয়া গারদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সাত দিনই সে এমনি দাঁড়াইয়াছে ;—বাঙলাদেশের প্রভাতকে এমন করিয়া প্রণাম জানাইয়াছে। ভাষাহীন আনন্দের এই প্রণাম তাহার,—তাহার ও আরো অনেকের। ইহার মধ্যে আসিয়া মিশিয়াছে তাহাদের দীর্ঘ বৎসরের দিন-রাত্রির নিশ্চল প্রতীক্ষা, আর দীর্ঘ দিন-মাসের বাঁধ-ভাঙা অধীর আগ্রহ!···এক-একটা দিনই এখন এক-একটা পরীক্ষা। ছয় বৎসর যেন ইহারই প্রস্তুতি। ছয় বৎসরের চাপা-পড়া আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা অবশেষে দিন ও প্রহরের হিসাবে আসিয়া পৌছিতেছে ; এবার তাহারা আর শাসন মানিতে চায় না। এক-একটি প্রভাতের মধ্যেই আকুলি-বিকুলি খায় ছয় বৎসরের প্রত্যাশা ; এক-একটি প্রশ্নের মধ্যে উদ্দাম হইয়া উঠে ছয় বৎসরের প্রতীক্ষা। ছয় বৎসরের প্রত্যাশা আর ছয় বৎসরের প্রতীক্ষা·· প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা···

মাথা ঝাঁকিয়া কোন্ একটা অনিবার্য চিন্তাকে অমিত ঝাড়িয়া ফেলিল। আবার সানন্দ দৃষ্টি মেলিয়া দিল প্রাঙ্গণ ছাড়াইয়া প্রাচীর ছাড়াইয়া বাহিরের ঝাউ-অশ্বত্থের দিকে, নবালোকিত নীল আকাশের বুকে। আর, আবার মনে-মনে বলিয়া চলিল—আশ্চর্য বাঙলাদেশ, আশ্চর্য তার আশ্বিনের এই প্রভাত। ···আশ্বিনের বাঙলা যেন স্নেহ-সজল বাঙালী মায়ের মত—পরগৃহ হইতে কন্যার আগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। চক্ষে স্নেহাশ্রুবিন্দু, বক্ষে আনন্দের ধীর আলোড়ন···যেন বাঙালী মা···

মন জাল বুনিয়া যায়।

অমিতের জন্য আর বসিয়া নাই তাহার মা। সকাল না হইতে আর

দেখিতে আসিবেন না—অমিত ঘুমাইতেছে, না, জাগিয়া বসিয়া আছে। রাত্রির আঁধারে সন্তর্পণে আসিয়া আর দুয়ারে দাঁড়াইবেন না, দেখিবেন না—অমিত পড়িতেছে, না, শুইয়া পড়িয়াছে। এদিকে সকালবেলা হাত-মুখ ধুইয়া চা না পাইলে অমিত রাগ করে। চায়ের দেরি থাকিলে অমিত বিছানা ছাড়িয়াও উঠিতে চাহে না। আবার চায়ের পেয়ালার টুং টাং শব্দ শুনিলেই সে উঠিয়া আসিবে,—মা তাহা জানেন। উঠিয়া মায়ের সহিত এ-কথা ও-কথা বলিয়া একটা গল্প ফাঁদিবে; চাহিবে মায়ের গম্ভীর উদ্বিগ্ন মুখে একটা স্বাচ্ছন্দ্য ফুটাইয়া তুলিতে। কিন্তু তাহা আর এখন সম্ভব হয় না। মাও জানেন, আগেকার দিন হইলে অমিত এরূপ গল্প ফাঁদিত না;—মায়ের সহিত চা লইয়া অমিত করিত মিথ্যা কলহ, মাও করিতেন অমিতের উপর মিথ্যা রাগ!

তা বেশ, আমি যখন চা করতে জানি না, তুমি চা-করতে-জানা বউ আনলেই পার।

অমিত অমনি উত্তর দিত: কোন্ গরজে? তুমি চা করতে জান না বলে পরের মেয়েকে এনে খাটাতে হবে এ বাড়িতে?

তাই নিজের মাকে খাটাতে হবে, না?

নিশ্চয়। মজা পেয়েছ—ভালো করে চা-টুকুও তৈরী করতে পার না?

খুশিতে হাসিয়া উঠিত দুষ্ট বোনটা, অনু। মা কিন্তু তখন রাগ করিতেন: পারব না আমি। এর চেয়ে ভালো হবে না আর চা।

না হলে তোমাকে ছাড়ছে কে?

কেন, তোমার চাকরি করি না কি?

নিশ্চয়।

মায়ের পক্ষ লইবার জন্য ছোট ভাই মনু তখন তৈয়ারী হইতেছে। অনুর বাড়াবাড়ি সে দেখিতে পারে না: কেন, অনু করে কি? চাটুকুও করতে পারে না?

মা অমিতকেই উত্তর দিবেন: কবে থেকে করি তোমার চাকরি?

জন্ম থেকে;—আর মৃত্যু পর্যন্ত।

এবার মায়েরও মুখে গর্ব ও আনন্দের হাস্য ফুটিয়া উঠিতে চাহিবে।

'জন্ম থেকে,—আর মৃত্যু পর্যন্ত'—কতবার মায়ের সঙ্গে এমনি ছল-কলহে অমিত তাহার দিন আরম্ভ করিয়াছে। সাধারণ বাঙালী মায়ের মতই তো তাহার মা;—অমিত ভাবে, রঙে সাধারণ, রূপে সাধারণ, কথায় সাধারণ। হয়তো স্নেহ-ভালোবাসায়ও অসাধারণ নন। কত সাধারণ,—আর কত অসাধারণ তবু মা।···সাধারণ বাঙালী মায়ের মতই ছিল তাঁহার জীবন, আর হয়তো জীবনান্তও ঘটিল তেমনি সাধারণ বাঙালী মায়ের মতই।—সেই মাঝারি গোছের রঙ তখনি ঔজ্জ্বল্য হারাইতে শুরু করিয়াছিল। করিবেই তো, উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তাঁহাকে তখন পাইয়া বসিতেছে। তাঁহার দিনে শান্তি নাই; রাত্রিতে তিনি স্বস্তি পান না—অমিত কি করিতেছে? কোথায় চলিয়াছে? পিতার শান্ত স্থির মূর্তি তখন গম্ভীর হইতেছে, মায়ের বুক রাত্রি-দিন ভয়ে দুরু-দুরু কাঁপে। পঞ্চাশের দিকে আগাইয়া চলিয়াছেন তখন মা; রঙের ঔজ্জ্বল্য, স্বাস্থ্যের বাঁধন সবই চিড় খাইবার কথা—বয়স হইতেছে; আর কত খাটিবেন? তবু তাঁহার নাতিস্থূল কোমল দেহে তখন ক্লান্তি ছিল না, আলস্য ছিল না;—ক্লান্তি আসিবেও না, আলস্যও না। কিন্তু অমিতের ভাবনায় ভাবনায় মায়ের মুখে পড়িল কালো ছাপ, দেহে আসিল কেমন অস্থিরতা। চিড় খাইল না, কিন্তু ক্ষয় হইয়া যাইতে লাগিল বুঝি সেই প্রাণ আর তাহার অধিষ্ঠান সেই দেহ।

বুড়ী ঝি অমিতকে ছাড়িত না: তোমার জন্য শেষ হলেন, বাপু, মা। ভাত কোলে করে বসে থাকবেন সারা দুপুর। চক্ষেও দ্যাখো না নিজের মায়ের চেহারাটা?

দেখিত না কি অমিত মায়ের সেই উদ্বেগ-ভরা, জিজ্ঞাসা-ভরা, আশঙ্কা-ভরা রূপ? দেখিত না কি সেই ছায়া-পরিম্লান দেহের নির্বাক্ জিজ্ঞাসা, নিরুপায় মিনতি? আর কলহহীন থমথমে দিন-রাত্রির অস্বচ্ছন্দ সম্পর্ক মাতায়-পুত্রে, পিতায়-পুত্রে, সমস্ত গৃহে—দেখিত না কি অমিত? বুঝিত না কি অমিত মাকে?

অমিত রাগ করিয়া উত্তর দিত: ভাত কোলে করে বসে থাকতে তাঁকে বলেছে কে? জানই তো, দেরি হলে আমি হোটেলে খেয়ে

নেব, বাড়ি ফিরব না।—বলিত আর সঙ্গে সঙ্গে অমিত নিজের উপরও রাগ করিত।

মা তাহাও জানিতেন, জানিতেন তাহার অর্থও। তাই আরও বেশী উৎকণ্ঠায় বসিয়া থাকিতেন। আর ইহাও অমিত জানিত—বলিলেও অন্য কথা মা শুনিবেন না, বসিয়া থাকিবেন। ঠাকুর-চাকর চলিয়া যাইবে, বেলা গড়াইয়া যাইবে; পরিচিত পদক্ষেপের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিবেন তবু অমিতের মা। ইহাও তিনি জানেন—সে পদক্ষেপ আর এ-বেলা শোনা যাইবে না; দুয়ারের কড়া আর নড়িবে না। মধ্যাহ্নের রাঁধা ভাতও আর খাইবার যোগ্য নাই; অমিতকে তাহা খাইতেও মা দিবেন না। তবু বসিয়া আছেন মিনিট গুনিয়া, ঘণ্টা গুনিয়া।

অমিত জানে বসিয়া আছেন বাবাও; কিন্তু আপনার গৃহে। স্থির, সংযতচিত্তে, ঈজিচেয়ারে চোখ বুজিয়া বসিয়া আছেন; কিন্তু কান রহিয়াছে সদরের কড়া-নড়ার অপেক্ষায়। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কাটাকুটির ফাঁকে তখন এই চেতনাও নাড়া দিয়াছে অমিতকে। বাসের কর্কশ চীৎকার ও দুর্গন্ধ ধোঁয়া এবং দ্বিপ্রহর রৌদ্রের দুঃসহ তেজ যখন স্নানাহারহীন অমিতের স্নায়ুতন্ত্রীকে তীক্ষ্ণ, অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, কলিকাতার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ছুটিবার কালে তখনো অমিতের মনের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছাইয়া রহিয়াছে এই চেতনা—মা বসিয়া আছেন, বসিয়া থাকিবেন;—বসিয়া আছেন, বসিয়া থাকিবেন—দিনে, রাত্রিতেও। খিদিরপুরে আর বেলেঘাটায়, টালা আর টালিগঞ্জে কথা বলিতে বলিতে আর কথা না বলিতে-বলিতে অমিতের সতর্ক সুতীক্ষ্ণ চক্ষুর মধ্যে জ্বলিয়া উঠে সেই একটি বাঙালী মায়ের অবসন্ন ক্লান্ত রূপ···অপেক্ষায় তিনি বসিয়া আছেন জানালার ধারে, হাতের বাঙলা সংবাদপত্র ঘরের মেঝেয় লুটাইতেছে; ঘুমে মাথা ঢুলিয়া পড়িতেছে, অপরাহ্নের দীর্ঘ ছায়া দীর্ঘতর হইতেছে ঘরের মেঝেয়···'জন্ম থেকে, আর মৃত্যু পর্যন্ত,' অমিত, মুক্তি নাই, মুক্তি নাই তোমারও। বিরাটকাল তোমাকে কাড়িয়া লইতেছে, নিবিড় মমতা তোমাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। এ কী অসংখ্য আহ্বান ইতিহাসের, তোমার কাছেও! এ কী দুশ্ছেদ্য বন্ধন জীব-

চেতনার তোমার মধ্যে। মুক্তি নাই, মুক্তি নাই তোমারও। 'মা বড় জ্বালা; মরেও না'—বলিয়াছিলে অমিত? মুক্তি পাইয়াছ কি, অমিত?—জিজ্ঞাসা করে অমিত নিজেকে আবার। জিজ্ঞাসা করে আর উত্তর দেয়ঃ

মুক্তি পাইয়াছেন আজ মা।…

চার বৎসর পূর্বে অমিত অনুর পত্র পড়িয়াছেঃ

"রাত-দুপুরে উঠে দেখি মা ঘরে নেই! তোমার ঘরে আলো জ্বলছে। গিয়ে দেখি, মা তোমার বিছানা পাতছেন। মশারি টাঙাবেন—দড়িটাকে কিছুতেই বাঁধতে পারছেন না দেয়ালের আংটাটার সঙ্গে। বললাম, 'এ কি করছ, মা?' হাত ছাড়িয়ে নিলেন। বললেন, 'কখন আসবে, কত রাত্রিতে অমি আসবে, ঠিক আছে কিছু? বিছানা করে রাখি তো।' জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে তাঁর শরীর।…কর্তৃপক্ষকে খবর দিলাম; তোমার ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছি।"—অমিতও দরখাস্ত করিয়াছে—দরখাস্তের পর দরখাস্ত, টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রামঃ "শুধু এক সপ্তাহের ছুটি চাই মাকে শেষবার দেখতে।" —অনু আবার লিখিয়াছে, "ওরা তদন্ত করতে এসেছিল। বলে গেল,—তুমি আসছ শীঘ্রই, ছুটি হয়ে গিয়েছে। মাকেও বাবা বুঝিয়ে বললেন—তুমি আসবে দু-এক দিনের মধ্যে। মনে হল, মা আশা পেলেন। কেমন ভালোর দিকে চলল। দুপুরে একটু ঘুম পেয়েছিল সেদিন। হঠাৎ জেগে চমকে দেখি—মা বিছানায় নেই। উঠে বসে আছেন সেই জানালার কাছে। বললেন, 'অমি আসছে।' শুনতে চান না কোন কথা। বুঝোতে চাইলে কেমন তাকিয়ে থাকেন চোখ মেলে…অনেক করে এনে শুইয়ে দিলাম।…দু দিন পরে শুক্রবার …দুপুর-বেলা মা আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন—"

তার-পর পত্র-পরীক্ষকের জমাট কালির সুদীর্ঘ আঁচড়ে পত্রের লেখা বিলুপ্ত।

পরের সোমবারই অবশ্য অমিত জানিল, মা নাই। আর তার পরেকার বুধবার পৌঁছিল বাঙলা সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের শীলমোহরযুক্ত উত্তর—অমিতের নামে পূর্ববর্তী বুধবারের লেখাঃ "তাহাকে জানানো যাইতেছে যে তাহার মাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে। অতএব, তাহাকে ছুটি দিবার আর কোনও কারণ নাই।"

আর কারণ নাই, অমিতের মন বলিয়া উঠিল,—মুক্তি পাইয়াছেন মা। 'মা বড় জ্বালা,' অমিত; এবার তিনি মরিয়াছেন। তোমাকে মুক্তি দিয়া গিয়াছেন।···আর জানালায় বসিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিবেন না তিনি তোমার পথ চাহিয়া। এমনি করিয়া মায়া-ভরা দৃষ্টি লইয়া অমন কেহ আজ আর অপেক্ষা করিবে না এই প্রভাতের আলোকে তোমার জন্য, অমিত। আকাশে দিনের আলো ফুটিবে, আরও সুন্দর হইয়া ফুটিবে সেই আলো বাঙলাদেশের বুকে, আগমনীর আহ্বান বাজিয়া উঠিবে বাঙলাদেশের আলো-বাতাসে·· কিন্তু তোমার গৃহে কাহারও প্রাণে সেই বাঁশি আর বাজিবে না···'মা বড় জ্বালা', না অমিত?

এ কি! অমিত চমকিয়া উঠিল। নিজেকে তিরস্কার করিল, এ কি, অমিত, এ সব কি ভাবিতেছ? এই সুন্দর শরৎ-প্রভাতের দিকে তাকাইবে না? শরতের বাঙলাদেশকে দেখিতেছ না?—না, না, অমিত অন্য কথা ভাবিবে। দ্যাখো তো, এমন শরৎকাল আসে আর কোন্ দেশে? আসে কি উত্তর-ভারতে? আসে কি দক্ষিণ-ভারতে? দেখিয়াছে এমন শারদশ্রী ইংলণ্ডের মানুষ? দেখিয়াছে রূপমুগ্ধ কবি কীটস্? সেখানে প্রবীণ হেমন্ত হরিৎপাণ্ডুর শস্যক্ষেত্রের আল বাহিয়া চলে মন্থর চরণে, ব্যজনতাড়িত পক্ককেশ প্রৌঢ় 'অটাম' বিশ্রাম করে গোলাবাড়ির কোণে সমাগতপ্রায় বার্ধক্যের অবসাদে। মহাকবি কীটস্, দেখিতে যদি আমাদের শারদ-লক্ষ্মীকে! এখানে শ্রান্তি নাই, অবসাদ নাই; প্রতিটি প্রভাত যেন আগমনী, অনাগতের আশ্বাস। সে আশ্বাসই কি বহিয়া আনিল আজ এই প্রভাতের আলো? ওগো মুক্ত আকাশের দূত, জান নাই তোমার স্বপ্নে স্বপ্নে বহিয়া গিয়াছে বন্দী পৃথিবীর কত দিন আর কত রাত্রি? কত দিনের সংগোপন প্রত্যাশা আর রাত্রির সুতীব্র প্রতীক্ষা—কত নিরুদ্ধ প্রত্যাশা আর অসম্পূর্ণ প্রতীক্ষা!

'প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা?' না।—হাত দিয়া শব্দ দুইটিকে অমিত যেন দূরে সরাইয়া দিল। প্রাঙ্গণ ও আকাশের দিকে আর-একবার তাকাইয়া তখনি মুখ ফিরাইল। দিনের আলো এখনি ফুটিয়া উঠিবে; হাত-মুখ ধুইতে হইবে।

ঘরে নাক ডাকিতেছে এখনো কাহার ? লক্ষ্মীধর বাবুর। ভাগ্যবান লক্ষ্মীধর বাবু! দিন বা রাত্রি, বর্ষা বা গ্রীষ্ম,—কোনো ঋতুরই উপর পক্ষপাতিত্ব নাই তাঁহার নাসিকার। দুইজনের গৃহেও উহার বাধা নাই, বাধা নাই এই বিশজনের ব্যারাকেও।·· জ্যোতির্ময়ও মাথার উপর চাদরটা টানিয়া দিয়াছে। তাহার সকাল বেলাকার এই মিষ্টি ঘুমটুকুর প্রতি আকাশের আর সূর্যের অনন্ত কালের ঈর্ষা। দুই-ঘণ্টার মত আকাশ আরও অন্ধকার হইয়া থাকিলেই বা কি ক্ষতি ছিল ? কি ক্ষতি হইত পৃথিবীর যদি ভারতবর্ষের আকাশে সূর্যদেব এমন প্রত্যূষে না উঠিয়া একটু দেরি করিয়াই বা উঠিতেন ? শুধু জ্যোতির্ময় ভোর বেলাকার এই নিদ্রাটুকু নিষ্কণ্টক ভোগ করিতে পারিত—আটটা পর্যন্ত। কিন্তু জ্যোতির্ময়ও পরাজয় মানিবে না—চাদরে মুখ ঢাকিয়া আরও এক-ঘণ্টা অন্তত এই ঘুমের মাধুর্যকে সে বাড়াইয়া লইবে, অবজ্ঞা করিবে লক্ষ্মীধর বাবুর নাসিকা-গর্জন ! মনে মনে হাসিয়া অমিত টুথ পেস্ট লইয়া ‘সাত খাতার’ আঙিনায় বাহির হইয়া গেল—শহরের কলে জল আসিয়াছে নিশ্চয়। আঙিনায় নীহার মিত্র শ্লথ-নিরুদ্দেশ ভাবে পদচারণা করিতেছে। মুখ শুষ্ক, দেহ ক্লান্ত, মাথার চুল অবিন্যস্ত ;—যেন সে বহু পথ পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছে। অমিতের সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই নীহার মিত্রের ম্লান ওষ্ঠপ্রান্তে ক্লান্ত হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তেমনি একটু বেদনাময় হাস্যে অমিত তাহাকে সম্ভাষণ জানাইল। একবার জিজ্ঞাসা করিল, ‘আজও—?’ নীহার মিত্র চলিতে চলিতেই ঘাড় নাড়িয়া ক্ষীণ নির্বাক হাসি হাসিয়া জানাইল—বলা নিষ্প্রয়োজন। ক্লান্ত ওষ্ঠ, কণ্ঠ যেন আর ক্লান্তিভরে মুখ ফুটিয়া বলিতে চাহে না—নীহার মিত্রের কাল রাত্রিতেও ঘুম হয় নাই। এখনো তাহার অনিদ্রার একটা নূতন পর্ব চলিয়াছে। অনেক রাত্রির মত গত রাত্রিও সে নিদ্রাহীন যাতনায় কাটাইয়াছে। এ যাতনা অসাধারণ নয়, নীহার মিত্র একাই এ যাতনা সহ্য করে না। কারাবাসের ইহা একটা মামুলী পীড়া। কিন্তু কী অসহ্য তবু এই যাতনা ! না অমিত তাহা ভাবিবে না, ভাবিতে চাহে না। অমিত ভালো করিয়াই জানে নিদ্রাহীন রাত্রির সেই নির্দয়তাকে—ভালো করিয়াই জানে তাহা।

নল ছাপাইয়া জল পড়িতেছে নহরে। মোটা নল হইতে অনেকটা জলধারা সবেগে উৎসারিত হইয়া পড়ে। সুবৃহৎ কলিকাতার বিপুলসংখ্যক অধিবাসীদের প্রাণধারা যেন জাগিয়া উঠিতেছে সকাল বেলাকার এই জলধারার সঙ্গে। ভিতরের আঙিনার নিম ও প্রাচীর-পারের বাহিরের কৃষ্ণচূড়ার মাথায় ভর করিয়া সূর্যালোক এখনি নামিয়া আসিবে এই ওয়ার্ডের নীচু আর্দ্র মেজেয়— আসিবে তাহা কলিকাতার দেবদারু-নারিকেলের মাথায় ভর করিয়া, রাত্রি-শেষের সিক্তস্নাত পথে পথে পা ফেলিয়া। আপার সার্কুলার রোডের পশ্চিম পারের বাড়িগুলির গায়ে উষার সোনা-মেশানো আলো এখন প্রভাতের রুপা-ঢালা রৌদ্র হইয়া উঠিবে। পূর্বপারের খর্বকায় গাছগুলির পাতায়ও এতক্ষণে সেই সূর্যালোক আগুন জালিয়া দিয়াছে। শ্যামবাজারের মোড়ে বাসের উচ্চকিত গর্জন ও ট্রামের একটানা আত্মঘোষণা এবার পথযাত্রীর পদধ্বনির ও কণ্ঠধ্বনির সঙ্গে মিশিয়া শহরের কোলাহলে পরিণত হইতেছে। হাফশার্ট ও হাফপ্যান্ট পরা ডাঃ বোস এতক্ষণে ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিতেছেন। দোকানের কাঠের পাটখানা ধুইয়া-মুছিয়া গোষ্ঠ পানওয়ালা এবার স্থির হইয়া বসিতেছে। 'বিনোদ কেবিনের' চায়ের খরিদ্দাররা 'সিঙ্গল' কাপ শেষ করিয়া আর-এক 'হাপ কাপের' জন্য প্রস্তুত হইতেছে—সম্মুখে দৈনিকের পলিটিক্স, খেলা ও রেসের হিসাব। দক্ষিণের জানালার ধারে সংবাদপত্রের সত্য ও মিথ্যার উপরে এতক্ষণে উদ্বেগে, আগ্রহে, শঙ্কায় অমিতের পিতাও ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। সকালের এই আলোকে বুঝি তিনি ভালো করিয়া দেখিতে পান না বাঙলা দৈনিকের ছাপা লেখা।···চোখে বুঝি কমও দেখেন এখন বাবা? না, কম দেখিবেন না। এই তো সেদিন চশমা পরিবর্তন করিয়া আনিয়াছেন। আকাশের আলোই এখনো তাঁহার সেই ঘরে তেমন করিয়া ফোটে নাই। কিন্তু তিনি স্থির থাকিতে পারেন না; সকাল হইতে না হইতে তাঁহার সংবাদপত্র দেখা চাই! কালও অনেক রাত্রিতে ফিরিয়াছে অমিত, তিনি তাহা জানেন। এখনো হয়তো সে শুইয়া আছে। কিংবা শোনা যায় তাহার গলা—জোর করিয়া গল্প জুড়িবার ভান করিতেছে। চায়ের কোণে শোনা যায় তাহার একক কণ্ঠ; আপনারই সৃষ্ট আড়ষ্টতা ভাঙিয়া ফেলিবার জন্য বৃথাই অমিতের এই চেষ্টা।

তবু শোনা যায় তাহার কণ্ঠ, অমিত জানাইতে চায়, সে বাড়িতেই আছে। বাবাও জানেন—আছে, অমিত বাড়িতেই আছে এখনো। কিন্তু কতক্ষণ? পৃথিবীজোড়া দুর্যোগের ঝটিকা কখন কোন তটে আছড়াইয়া পড়িতেছে, কোথায় উপড়াইয়া ফেলিতেছে কাহাকে কখন—গৃহ হইতে, পরিবার হইতে, জন্ম ও জীবনের নিশ্চিত উত্তরাধিকার হইতে;—কোথায় উড়াইয়া নিবে বুঝি তাঁহার অমিতকেও—। অমিত জানে, তাহার পিতা সমাগত এই নিয়তির ঝটিকাভাস খুঁজিয়া পাইতে চাহেন দৈনন্দিন সংবাদের ভস্মস্তূপ হইত।

জানালার সামনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বাবা পড়িতেছেন সংবাদপত্র···পড়িবেন প্রতিটি সংবাদ—এই জটিল কালের জটিল ভগ্ন ভগ্ন কাহিনী। কিন্তু তাঁহার রেখাঙ্কিত শান্ত মুখের কোনো রেখায় উহার কোনো আভাস ফুটিবে কি? প্রৌঢ়ত্বের পরিণত স্নিগ্ধ আলোক তাঁহার চক্ষে ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাঁহার জীবন-রচনার কুশলতায়। এই বার্ধক্য-সীমায় পৌছিয়া দুইটি প্রশান্ত জিজ্ঞাসু চক্ষের মধ্যে এখনো কি সেই আলো অমিতের জন্য শঙ্কায় বেদনায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে থাকিবে? না, অমিত জানে, তাহা হয় নাই। তাঁহার আত্মসমাহিত জীবনের মধ্যে কোনো অধৈর্য দেখা যায় নাই; আচরণে অস্থিরতার বা বিক্ষোভের আভাসও আসে নাই। প্রভাতে নির্বাক চক্ষে তিনি দেখিবেন অমিত কোথায়। স্থির কথাবার্তার মধ্য দিয়া চা শেষ করিবেন, আরম্ভ করিবেন দিনের কাজ। শুধু তাঁহার নূতন দৃঢ়তর গাম্ভীর্যে, দৃষ্টির স্থির জিজ্ঞাসায় বুঝা যাইত—পৃথিবী টলমল, জীবন মথিত সমুদ্রের মত অশান্ত, আর সেই চির-সংযত চিত্ত আপনার মধ্যে আপনি আলোড়িত।···সেই আগেকার মত স্বচ্ছন্দ গল্প-আলাপের সম্ভাবনা এখন আর নাই, আর সম্ভব নয় পিতার ঘরে বসিয়া একসঙ্গে সকলের চা-পান—অমিতেরও; অন্নুর-মন্নুর কলহে দীর্ঘায়িত করিয়া তোলা তাহাদের চায়ের আসর;—মায়ের শত তাড়না আর আপত্তি সত্ত্বেও পড়া ফেলিয়া জমিয়া-বসা বাবার ঘরে পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভগিনীতে। না, আর তাহা হয় না। অমিতের ত্রস্তবিক্ষিপ্ত জীবন-গতি গৃহের সেই অন্তরঙ্গ আবেষ্টনীকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে। তেমন চা-পান আর সম্ভব নয়, সংবাদ-পত্রের সংবাদ লইয়া আর পিতা-পুত্রে তেমন তর্ক ওঠে না, সকলে মিলিয়া আর

আসর জমে না। কতদিন বাবার গৃহে চা লইয়াই আর অমিত প্রবেশ করে নাই, বাহিরে চায়ের চৌকিতে বসিয়া-দাঁড়াইয়া কোনোরূপে চা শেষ করিয়া ফেলে। বাবাও নীরবে চা পান করেন। অমিত দুই-একটা কাগজ উলটায়। যে-কোন অছিলায় নিজের ঘরে গিয়া বসে। তখন বাবা ভ্রমণে বাহির হইয়া যান।...পদক্ষেপ অগ্রসর হইয়া যায় অমিতের দুয়ারের সম্মুখ দিয়া সিঁড়ির দিকে। কানের উপরে ধ্বনিত হইতে থাকে সেই সুপরিচিত স্থির পদধ্বনি। পদক্ষেপে, জুতায়, লাঠির শব্দে সমস্ত কিছুতে একটা সুনিশ্চয়তা,—কোথাও শিথিলতা নাই।—সুপরিস্ফুট একটি গোটা মানুষের গোটা চরিত্র। অখণ্ড মানব-সত্তা অনায়াস মর্যাদায় আপনাকে প্রকাশিত করিয়া যায় আপনারও অজ্ঞাতে। অমিত তাহা দেখিয়াছে—দৈনন্দিন কত সামান্য প্রকাশের মধ্যেই দেখিয়াছে মানুষের সেই অখণ্ড সত্তা—কত সাধারণ আর কত অসাধারণ তাহাও। দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করিতে করিতেও অমিতের কড়া-নাড়ার অপেক্ষায় সে উৎকর্ণ রহিবে। শেক্‌সপীয়রের বহুপঠিত পাতায় আবার দাগ কাটিতে কাটিতে দেখিবে অমিতকে, তাহার বন্ধুদের, 'হাম্‌লেট্‌স্ অব্ দি এজ্'। 'ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স' পড়িয়া পড়িয়া সে জানিতে চায়, বুঝিতে চায়—এ কোন বিষম কালের বিষম পরীক্ষা তাঁহার অমিতকে ছিনাইয়া লইতেছে—তাহার গৃহ হইতে, পিতৃ-সাধনার পথ হইতে, মাতৃ-মমতার স্নেহনীড় হইতে।....

আজ মা নাই ; বাবা আজ একা। অমিত জানে—আপন একান্ত সত্তায় আজ সত্যই তিনি একাকী। আর তাই অনেক বেশী সংযত, প্রশান্ত, সৌম্য তাঁহার আচরণ চিন্তা হৃদয়। অনেক ধ্যানের মধ্য দিয়া তাঁহার জীবন গঠিত। ঊনবিংশ শতকের জ্ঞানে ও ধ্যানে রচিত একটি মিল্‌টনিক সনেটের মত তাহা স্থির, বেদনা-সমুজ্জ্বল।...একা আজ বাবা, মা নাই। অমিত জানে, সেই প্রশান্ত আলোক আজ ঘিরিয়া ধরিয়াছে তাহার মাতৃহীন ভাই আর বোনটিকে। স্নেহ-মমতায় তিনি ঢাকিয়া দিয়াছেন হয়তো সেই অস্বচ্ছন্দ সংসারের অভাবের রূঢ়তা। অমিত জানে, অপরাজেয় সেই পিতৃ-হৃদয়, অপরাজেয় সেই পুরুষকার। হয়তো আজ তিনি মনুর সঙ্গে তুলিয়া লইয়াছেন তাহার অধীত প্রাচীন ইতিহাসের গবেষণা-সম্পদ ; হয়তো অনুর সঙ্গে তিনি সহপাঠী হইয়াছেন

প্রাণবিজ্ঞানের নূতনতম তত্ত্বের। হয়তো সে চিত্ত সানন্দে অভিনন্দন করিবে এবার অমিতের নৃ-বিজ্ঞানের খেয়ালকে ; উৎসাহভরে খুলিয়া বসিবে অমিতের পড়া আধুনিক অর্থনীতি ও রাজনীতির তত্ত্ব—কেইনসের গবেষণা কিংবা ভার্গার বিশ্লেষণ। বাবা ছাড়া কে বুঝিবে অমিতের কথা ? কেই বা না বুঝিলে নষ্ট অমিতের এই জীবন-সত্য ?···হয়তো অমিতের আগমনীও আজ মায়ের অভাবে তাঁহারই প্রাণে বাজিয়া উঠিতেছে। অমিতের আশায় হয়তো তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। সংবাদপত্রের পাতায় চোখ রাখিয়া এতক্ষণে সন্ধান করিতেছেন আভাস ও উত্তর—আজ গৃহে আসিতেছে কি অমিত ? জিজ্ঞাসায় উদ্‌গ্রীব তাঁহার মন, তবু বাবা অমিতদের মত আশায় ও নিরাশায় বিচলিত হইবেন না : একালের অশান্ত যৌবনের মত তাঁহারা অধীর হইবেন না—'প্রত্যাশায় বা প্রতীক্ষায়'···

এ কি অমিত ! কি ভাবিতেছ আবার ? হাসিয়া কৃষ্ণচূড়ার পুষ্পহীন চূড়া হইতে আপনার শূন্য দৃষ্টি ফিরাইয়া অমিত আবার নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল—দাঁত মাজিবে আর কতক্ষণ ? মুখ ধুইবে না ?

অমিত মুখ ধুইতে লাগিল। জলের শীতল স্পর্শে যেন চেতনার আর-একটা নূতন হিল্লোল জাগিয়া উঠিল।·· শরতের সোনালি রৌদ্র ওয়ার্ডের কার্নিশের ফাঁক দিয়া আসিয়া তাহার পায়ের কাছে পড়িয়াছে—অরুণ আলোর একটি অঞ্জলি।···'শরৎ তোমার অরুণ আলোব অঞ্জলি'···গীতহীন কণ্ঠেও গান কল-কল করিয়া উঠিতে চাহে। আকাশের আলোক সুরে বাঁধিয়াছেন কবি ! · কিন্তু কেমন আছেন কবি ? হঠাৎ থামিয়া গেল কণ্ঠের সঙ্গীত, জলের কল-ধ্বনি—কেমন আছেন কবি ? বুকে অধীর উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠিল। এই প্রাচীরের পার হইতে তাহাদের প্রণাম কালিম্‌পং-এর পাহাড়-চূড়ায় পৌঁছিল না। সহস্রের সঙ্গে এক হইয়া তাহারা উৎকণ্ঠিত চিত্তে জানাইতে পারিল না—'সূর্য, তুমি তোমার মুখ ঢাকিয়ো না। আমরা বড় নই, বিরাট নই। কিন্তু তোমাকে আমরা দেখিয়াছি। আমাদের কবির মধ্যে আমরা ভাষা পাইয়াছি, বাণী পাইয়াছি, আমরা বন্দিজাতি, ইতিহাসের মধ্যে তাই আমরা বাঁচিয়া উঠিয়াছি।

বাঁচিয়া উঠিয়াছি, হাঁ নিশ্চয়ই আমরা বাঁচিয়া উঠিয়াছি।—অমিত টুথ ব্রাশ ঝাড়িতে ঝাড়িতে যেন জোর করিয়া নিজেকে বলিতে লাগিল···আমাদের পরিচয় রাজা-রাজ্যে নয়, কীর্তি-কাহিনীতেও নাই। আমাদের পরিচয় শুধু, কবি, তোমার প্রাণের সঙ্গে আমাদের প্রাণও বাঁধা। তুমি আমাদের দেখিয়াছ—জানিয়াছ ; কিন্তু তোমাকে দেখিতে হইবে আমাদের এই রক্তঝরা ইতিহাসও। দেখিতে হইবে আমাদের ভবিতব্যকেও—আমাদের জীবন দিয়া যে সত্যকে আমরাও সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছি সহস্র ব্যর্থতার মধ্যে, তোমাকে সেই পরম অধ্যায়ও দেখিতে হইবে কবি !···

একদিন সেই বিক্ষুব্ধ, হতাশ শত যুবকের অন্তরে তর্কের তুফান উঠিয়াছিল—কবি, তুমি দিলে তাহাদের ললাটে এই কলঙ্কের ছাপ ?

'এ যুগের এই মানুষের এই কি পরিচয়, অমিত ? কবির সৃষ্টিতে এই থাকবে তার ইতিহাস ?'—বই শেষ করিয়া সেদিন আলোচনা করিতে করিতে শেষ বারের মত প্রশ্ন করিয়াছিলেন সুশীলদা—সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়। 'চার অধ্যায়' শেষ হইয়া গিয়াছে, সম্মুখে পড়িয়া আছে সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থ। বিক্ষোভে ও অপমানে কাব্যের সত্যকে অস্বীকার করিবার জন্য অধীর-প্রায় সকলে। এ কি লাঞ্ছনা কবির হাতে তাঁহার জাতির যৌবনের ! এক খণ্ড 'চার অধ্যায়' পোড়াইয়া ফেলিলেও সুধীনের মনের ক্ষোভ মিটিবে না। মহাত্মাজীর হাতে অবজ্ঞা লাভ করিতে তাহারা অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল বা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট হইতেও তাহারা অভিনন্দন পাইবে না, ইহা জানা কথা। বাঙলার কবির নিকট হইতেও কি তাহারা এমন বিকৃত পরিচয় লাভ করিবে ?—যে কবি সেদিনও বেদনাদগ্ধ প্রাণে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন মনুমেন্টের তলায়, তাঁহার বেদনাহত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাঁহার বিধাতাকে···

> যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
> তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ॥

অমিত অনেকের সঙ্গে তর্ক করিয়াছে, তর্ক করিয়াছে সুধীনের সঙ্গেও। কিন্তু তর্ক নয়, আলোচনা করিতে হইয়াছে সুশীলদার সঙ্গে। তাঁহার সহিত তর্ক চলে না, চলে যুক্তি ও চিন্তার বিনিময়। না বলিলেও তাহারা জানে—

উহার উদ্দেশ্য পরস্পরের বুদ্ধির ও বিশ্বাসের সংস্কার। একসঙ্গে অনেক গ্রন্থ তাহারা পড়িয়াছে। মধ্যাহ্নের সুতীব্র দাবদাহ তখন বাহিরে ঝরিয়া পড়িতেছে। ঘুমাইবার সাধ্য কি অগ্নিশালায়। কেহ সেই অগ্নিকুণ্ডকে ভুলিতেছে পাশা লইয়া, দাবা লইয়া। একান্তে কেহ 'পেশেনস্' খেলিয়া চলিয়াছে—একা-একা নিজের তাস মিলাইতেছে, চুরি করিতেছে। কেহ বা দৃঢ়চিত্তে বই পড়িয়া যায়—অগ্রাহ্য করিয়া গ্রীষ্মের উত্তাপ আর পাশাখেলার সমবেত চীৎকার। এমন কত মধ্যাহ্ন গিয়াছে অমিতেরও—সুশীলদার সঙ্গে· এমন কত দিন অমিতও বসিয়াছে কোনো সুগম্ভীর গ্রন্থ লইয়া। হয়তো ইতিহাস, হয়তো রাজনীতি বা অর্থনীতি, কিংবা সমাজ-বিজ্ঞান। বসিয়াছে তাহারা আহারান্তে বিশ্রামের পর, আর বই বন্ধ করিয়া উঠিয়াছে সূর্যের তীব্র তির্যক দৃষ্টি যখন পশ্চিম আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছে গৃহমধ্যে, মেঝেয়, আসবাব-পত্রে, টেবিলের নিঃশেষিত চায়ের পেয়ালায়-পিরিচে, তারপর প্রাচীরের গায়ে, আর শেষে একাগ্র সমাসীন সুশীলদার চিন্তা-সুগম্ভীর মুখে।

সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণভাবে গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। স্বল্পভাষী, দশ জনের মধ্যে বসিয়া কথা বলিতে পারেন না, তাহা শিখেনও নাই। বয়স পঁয়তাল্লিশ ছাড়াইয়া চলিয়াছে। সুদীর্ঘ, সুদৃঢ় সেই দেহের উপর কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের ছাপ আরও গভীরতর রূপেই আঁকা হইয়া গিয়াছে। মাথায় প্রকাণ্ড টাক। কানের কাছে ও পিছনে ছোট করিয়া ছাঁটা চুলের মধ্যে এখনো অবশ্য যথেষ্ট কালো চুল রহিয়াছে, কিন্তু সুপরিসর টাকই তবু সমস্ত মাথাটিকে জুড়িয়া বসিয়াছে। মুখের ও দেহের রেখায় বার্ধক্যের আভাসই পরিষ্কার। স্থির মুখের উপর সেই রেখা গভীর হইয়া পড়িয়াছে, দেহের রক্ত-স্রোতে শিথিলতা দেখা দিতেছে। গৌরবর্ণের দীপ্তি নিবিয়া পাণ্ডুরতা এখন আসিতেছে। শান্ত চোখেরও চতুর্দিকে জমিতেছে কালির রেখা। তবু সুদীর্ঘ সেই দেহের সুগঠিত কাঠামো দেখিয়া বুঝিতে বাকি থাকে না—বিধাতার অকুণ্ঠিত দান সঙ্গে লইয়াই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন এই দেহের অধিকারী মানুষ। আর সেই সুগঠিত দেহের এখনকার শান্ত পদক্ষেপ, ক্লান্ত-গতি দেখিতে দেখিতে সন্দেহ থাকে না—এ পৃথিবীর অনেক ঝটিকা আর অনেক

উত্তাপের পীড়নে এই সমুন্নত দেহ আজ ফাটল-ধরা জীর্ণ মন্দির মাত্র ! উনিশ শ' পাঁচ হইতে এমনিতর কত দেহের মন্দিরে-মন্দিরে দেবতার আরতি আরম্ভ হয়। তারপর ত্রিশ বৎসরের মধ্য দিয়া সেই পূজা এখনো অসমাপ্ত এ জীবনে। দেউলে ভাঙন ধরিয়াছে ; বিগ্রহের গায়ে কি তাই বলিয়া লাগিয়াছে কোনো মলিন স্পর্শ ?

ফ্রেজারের 'গোল্‌ডেন বাউ'-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ শেষ করিয়া এঙ্গেল্‌সের 'পরিবার গোষ্ঠী রাষ্ট্র' লইয়া বসিয়াছেন সুশীলদা অমিতের সঙ্গে। 'সমাজবাদী চিন্তার ইতিহাস' শেষ করিয়া সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসায় লইয়া বসিয়াছেন মার্কসের 'ক্যাপিটেল'। না বুঝিয়া তিনি কিছুই গ্রহণ করিবেন না, কিন্তু না জানিয়া বর্জনই বা করিবেন কেন কিছু ? গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু বয়স ও আকৃতির জন্য নয়, প্রকৃতির ও আচরণের জন্যও সকলের নিকট হইতে ভীতি-মিশ্রিত মর্যাদা লাভ করেন। দশজনের সহিত মিলিয়া-মিশিয়া তিনি আসর জমাইতে পারেন না। কি করিয়া অন্যেরা জানিবে তাঁহার মার্গ-সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ ?—আর তাই প্রাণপণে সেই সঙ্গীতের আসর হইতে তাঁহার দূরত্ব রক্ষা। এখানেও সঙ্গীতের আসরে আসিলে তিনি বসেন দূরে একান্তে। তাঁহার স্থির দৃষ্টি সকলের অজ্ঞাতে যাচাই করিয়া বাছিয়া লইয়া চলে নানা জনের গল্প, গান, হাস্য-পরিহাস, কৌতুক-রঙ্গ। হয়তো তিনিও উপভোগ করেন সেই জমাট-বাঁধা আড্ডার আনন্দ। কিন্তু উচ্ছলতায় কোথাও মাত্রাচ্যুতি ঘটিলে তাঁহার মর্যাদাবোধে তৎক্ষণাৎ তাহা ধরা পড়িবেই, চোখ এড়াইয়া যাইবে না। তাঁহার নির্বাক প্রতিবাদ গোপন রহিবে না। শান্ত নীরব নেত্রে সব দেখিয়া সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় নীরব থাকিবেন। তারপর সকলেরই অজ্ঞাতে আসর হইতে কখন সরিয়া পড়িয়া নিজের কোণটিতে আশ্রয় লইবেন—কিংবা অভ্যস্ত পদচারণার ক্ষুদ্র পথ-রেখাটিতে। কোনো এক সুনিভৃত অবকাশে হয়তো অমিতের সঙ্গ পাইবেন, কিংবা অমূল্যের সাহচর্য। মৃদু কণ্ঠে তখন গল্প জমিবে, শান্ত কণ্ঠে পরিহাস ফুটিবে। মনে পড়িবে ভুলিয়া-যাওয়া কথা, স্বচ্ছ কৌতুক, সহজ রঙ্গ-কাহিনী। অর্ধোদয় যোগের প্রথম জাতীয় সেবা-সংগঠন, উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ ও দামোদরের বন্যা—দেশের জনতার

সহিত এক হইয়া দেশকে স্বীকৃতির সেই প্রথম সাধনা ;—তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের দিনে রায়মঙ্গলের মোহনায়, বনে-জঙ্গলে উচ্চকিত দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা স্বাধীনতার সমরাস্ত্রের জন্য, ডুলাণ্ডা হাউসের পুলিশ-নির্যাতনের পরীক্ষা পার হইয়া হাজারিবাগ জেলে সত্তর দিনের অনশন ;—আবার গ্রামের জীবনের সহস্র তুচ্ছ সুন্দর কথা,—সাধারণের সাধারণ কাহিনী ;—উচ্ছ্বাস নাই উচ্ছলতা নাই ; শৃঙ্খলা আছে সেই গল্পে, আর আছে মৃদু একটু মাধুর্য ; জমানো স্বচ্ছতা ; স্বাচ্ছন্দ্য। কে জানিত সেই গম্ভীরপ্রকৃতি মানুষের মনেও এমনি স্বচ্ছন্দ একটি সকৌতুক আলোচনার, স্বচ্ছন্দ বন্ধুত্বের লুক্কায়িত ভাণ্ডার আছে? আছে একটি স্থির আবেগের প্রক্ষালিত বেদীতল ?

গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ তবু সুশীলদা। মণীন্দ্র কিংবা সুধীন্দ্র বুঝিত না কি করিয়া এমন গম্ভীর মানুষের সহিত অমিতের মত কৌতুকপ্রিয়, আড্ডাপ্রিয় মিশুকে প্রকৃতির মানুষ আনন্দ লাভ করে? হয়তো গম্ভীর মোটা-মোটা বইগুলি পড়িবার জন্যই তাহাদের পরিচয় ও সৌহার্দ্য। সুশীলদার ভয়ে উহারা দূরে দূরে থাকে। অমিত সুশীলদার সঙ্গে মোটা-মোটা বই পড়িয়া চলে—সত্যই গম্ভীর বই। মধ্যাহ্নের প্রদীপ্ত সূর্য অপরাহ্নের তীরে গিয়া ঠেকে—মাথার উপরকার অগ্নিবৃষ্টি নামিয়া আসিয়া গৃহের ভূমিতল হইতে ওঠে প্রথম টেবিলে, তারপর সুশীলদার মুখে।

এবার 'বিরতি'—গ্রন্থ রাখিয়া হাসিয়া বলেন সুশীলদা।—আমরা কিন্তু সেকালে বলতাম 'বিশ্রাম'।—'বিরতি' শব্দটা তাঁহার নিকট হাস্যকর।

তারপর ?—অমিত প্রশ্ন করিত।

তারপর ছুটতাম ফুটবলের মাঠে। সমস্ত বাঙলাদেশের যৌবন আপনাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিল ফুটবলের মাঠে। মোহনবাগানের আগেই বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন এ সত্য—বেদান্ত ছেড়ে তিনি ফুটবল খেলতে বলেছিলেন।

টাক-পড়া মাথা, ভাঙন-ধরা দেহ, ক্লান্তগতি সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, গম্ভীর প্রকৃতি, মিতভাষী, গ্রামাফোনেও ফৈয়াজ খাঁর কণ্ঠ শুনিতে না শুনিতেই যিনি সচকিত হন—মনঃসংযোগ করিতে পারেন না গ্রন্থে,—ফুটবলেরও উপাসক

ছিলেন নাকি একদিন তিনি? হাসি পায়, বিস্ময় জাগে, কিন্তু অমিত সম্ভ্রমও বোধ করে।

'চার অধ্যায়' শেষ করিয়া সেদিন শান্ত উদাস নেত্র তুলিয়া গম্ভীর-প্রকৃতি সুশীলদা বলিলেন: এ বই তোমার ভালো লাগলো, অমিত?

কার্তিকের ক্লান্ত সূর্য তখন অগ্নি হারাইয়া সন্ধ্যার দিকে চলিয়াছে।

অমিতের 'চার অধ্যায়' ভালো লাগিয়াছে। লাগিবে না কেন? সকলের সহিত সে তর্ক করিয়াছে: যে-সত্য নিয়ে সাহিত্যের পরিচয়, সে-সত্য তো তোমার-আমার মত বাঙালী বিপ্লবীর জীবনের এ-প্রয়াস, ও-প্রয়াস মাত্র নয়। সে সব ঘটনা, চিন্তা ও প্রয়াসের স্থূল রূপের মধ্যে থেকেই সাহিত্য ছেঁকে তোলে তার সত্য—মানব-সত্য, মানুষ যেখানে মানুষ, জীবন যেখানে জীবন। – এ সত্য গভীরতর। এখানেই তো সাহিত্যের তাই জয়, সে বাইরের সত্যের কারবারী নয়।

অমিতের সঙ্গে অনেকে তর্কও করিয়াছে। কিন্তু সুশীলদা তর্ক করিবেন না। শান্তভাবে বলিলেন, এই কি বাঙলাদেশের বিশেষ একটা কালের বিশেষ একটা গোষ্ঠীর মানুষের চিত্র? এ দেশের বিপ্লবী চিন্তা ও কর্মের মধ্যে এ সত্যই কি বিকশিত হইয়াছে? না, সেই ঘাত-প্রতিঘাতে বিকশিত হইয়াছে এই জাতীয় মানুষ, এমনি মানব-সত্য? তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে সত্য যে এখানে পরাজিত।

অমিত সুশীলদাকে বুঝাইতে চাহিয়াছে, বুঝাইতে পারে নাই: বাঙালী বিপ্লব-প্রয়াসের পরিপ্রেক্ষিতকে নিজের সৃষ্টির প্রয়োজনে কবি গ্রহণ করেছেন —যতটুকু তাঁর চাই, যে-ভাবে তাঁর চাই—ততটুকু, সেই ভাবে।—হয়তো তাঁর গৃহীত পরিপ্রেক্ষিতটাই আমাদের বিবেচনায় অযথার্থ কিন্তু তা মেনে নিয়ে দেখলে মানুষগুলি সত্য হয়ে দাঁড়ায়…।

বুঝাইতে পারিল না অমিত। সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের শান্ত চক্ষুর মধ্যে তবু বিক্ষোভ জমে নাই। শ্রান্ত মুখে কোনো উদ্ধত বিরক্তি জাগে নাই। গম্ভীর, আরও গম্ভীর হইলেন সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্ত দৃষ্টি আরও শান্ত, আরও গম্ভীর হইয়া রহিল। শেষে দীর্ঘশ্বাস পড়িল:

ত্রিশ বৎসরের বাক্যহারা ইতিহাসের উপর এই রইল কি তবে এ কালের মহাকবির তিরস্কার—বিপ্লবের সাধনা শুধু আত্মার আত্মবিনাশ ?

সময় সেদিন বহিয়া গেল। বী টাইম্-পীসের কাঁটা টিক-টিক শব্দে অগ্রসর হইতেছে। অমিতের মুখে কথা যোগাইল না।···

ইতিহাসের কথা তুমি বোলো না, অমিত ? ইতিহাসে এরূপ সাক্ষ্যই কিন্তু থাকবে। তারপর একদিন যুগান্তরের শেষে নিরাপদ-আলস্যে ইতিহাস ঘটা করেই লিখবে হয়তো সেদিনের ভাগ্যবান নেতৃত্বের আত্মদানের সালঙ্কার স্তুতি ;—হয়তো তোমাদের মূঢ় সাহসের জন্যও আঁকবে একটু কৃপামিশ্রিত মৃদু প্রশংসা বা মৃদু ভৎর্সনা। কে জানবে তার পিছনের এই মানুষের কথা—অমিতদের এই জ্বলন্ত জিজ্ঞাসা, এই নিরন্তর প্রশ্ন, অনির্বাণ পিপাসা ; এই রক্তাক্ত চরণের পথান্বেষণ ও রক্তাক্ত হৃদয়ের পথাবিষ্কারের সত্য ? ইতিহাসের কতটুকু সত্য তবে সত্য ?

সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে জল নাই। কিন্তু বেদনায় সে চোখ তখন অতল-সমুদ্রের মত নিথর।

অমিত তখনো বলিতে চাহিয়াছিল,—ইতিহাস শুধু কাগজের পিঠে কলমের আঁচড়ে লেখা হয় না সুশীলদা। বরং কর্ম দিয়ে, প্রয়াস দিয়ে সে ইতিহাস লেখা হয়। আর লেখা হয় তা গণদেবতার আত্মবিশ্বাসে। মানুষই তার সেই ইতিহাসের স্রষ্টা। এ যুগের ইতিহাসও গড়ে উঠছে আমাদেরই এ যুগের দৃষ্টিতে, এ যুগের সৃষ্টিতে। তার মধ্যেই আমাদের পরিচয়—পুঁথিশালার পোকারা তার উদ্দেশও পাবে না।

'এ যুগের দৃষ্টি, এ যুগের সৃষ্টি—তাতেই পরিচয় আমাদের জীবনের',—ঠিক অমিত, ঠিক। এ পরিচয় পুঁথিশালায় থাকে না, কিন্তু এ পরিচয়ও ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসদেরই উদ্ভাসিত করে দিতে হয়। এই বাক্য-বঞ্চিত মানুষের কথা—তাদের বুক-জ্বালা জিজ্ঞাসা, তাদের বুক-ভরা ভালোবাসা—তাদের বারে বারে এই পথ-হারানো আর পথ-নির্মাণের কাহিনী—এ সব তবে বলবে কে, অমিত ? যে কবি জ্বলে নি এমন করে, যে ঔপন্যাসিক ভালোবাসে নি এমনি ভাবে, যে দার্শনিক কোনোদিন করল না পথে পদার্পণ, যে ঐতিহাসিক কোনদিন জানল না পথের মানুষকে—তারা ?···

একবার স্তব্ধ হইল শান্ত স্বর। তারপর অমিতের মুখের উপর পড়িল দুইটি বেদনাহত চোখের সানুনয় দৃষ্টি ··

'এ যুগের দৃষ্টি, এ যুগের সৃষ্টি' ··আর, আর, অমিত, এ যুগের এই মানুষের পরিচয়—এ দায়িত্ব হাতে তুলে নাও তোমরা, অমিত। এই মানুষের পরিচয়—তোমার পরিচয়—তুমি দেবে না, অমিত ?···

'তোমার পরিচয় তুমি দেবে না অমিত ;' অমিত চমকিয়া উঠিল।

চমকিয়া উঠিবার কথা—পাঁচ বৎসরের ও-পার হইতে শীত-সন্ধ্যার একটি সস্নেহ স্বর কানে আসিয়া পৌছে···ব্রজেন্দ্র রায়ের স্নেহ-বাৎসল্য-ভরা এই অনুযোগ—তাহা যেন ক্লাসিক্‌সের সংযত নির্দেশ, সেই ক্লাসিক্‌স-গঠিত জীবন হইতে। আর মনে আসিতে থাকে আরও অনেক স্নেহ-শঙ্কিত সূর্যাস্তমাখা মধুর সায়াহ্ন···

দাঁড়াইয়া উঠিল অমিত।—সন্ধ্যা হচ্ছে সুশীলদা।

চোখে তেমনি প্রতীক্ষায় উন্মুখ দৃষ্টি রহিয়াছে তখনো। একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করিতে করিতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়। চলো।—তারপর ঃ যাঃ! চা জুড়িয়ে গিয়েছে কখন!

হাসিলেন দুই জনেই স্বচ্ছ আনন্দে।

কয়দিন পরেই সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় হাসপাতালে গেলেন। মরুভূমির প্রথম হেমন্তের হিম-শীতল স্নানের জল তাঁহার রক্তাল্প ভগ্নদেহ সহ্য করিতে পারিল না! শীতে গ্রীষ্মে কাহারও নিকট নিজের ভঙ্গুর দেহ লইয়া কথা বলা, অভিযোগ জানানো তাঁহার স্বভাব নয়—মর্যাদায় বাধিত। মুখ ফুটিয়া তাই বলেনও নাই যখন এই উত্তাপহীন দেহ এই জলে বারে বারে সঙ্কুচিত হইয়াছে। জ্বর-বুকে ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। তারপর আর দুইদিন মাত্র। জানা গেল—বারে বারে আঘাতে-আঘাতে যে শ্বাসযন্ত্র ও হৃদযন্ত্র বহুদিন হইতে দুর্বল হইয়া আসিয়াছিল, এখানকার এই কার্তিকের হিমে উহার নিউমোনিয়া হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয় ; আর—ডাক্তার জানাইলেন, নিউমোনিয়া হইলে এমন মানুষকে রক্ষা করাই কি কাহারও সম্ভব ?

দেউল ভাঙিয়া পড়িল—কিন্তু তাহার দেবতা ?

আর তোমার দেবতা, অমিত ?·· নামহারা মানুষের মিছিলে নামিয়া পড়িয়াছেন সে দেবতা—তাঁহার মন্দির আজ ধূলায় না ?

সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়কে অমিত আর দেখে নাই, দেখিবে না। দেখিবে না অনেককে—অনেককে—

কিন্তু না, এ চিন্তা থাক।

শেভিং ব্রাশ হইতে জল ঝাড়িতে ঝাড়িতে অমিত ফিরিয়া আসিল। নিত্যকারের অভ্যাসমত কখন কামানো শেষ করিয়া সে ক্ষুর, ব্রাশ ধুইতে আসিয়াছে—ধুইয়া ফেলিয়াছে। ব্যারাকে ও আঙিনায় নিদ্রোত্থিত বন্ধুদের দেখিয়াছে, চিনিয়াছে। চোখে চোখে সম্ভাষণও হয়তো সকলকে জানাইয়া গিয়াছে অভ্যাসবশে। হয়তো কুশল জিজ্ঞাসাও করিয়াছে, কে জানে ? ক্লাসিক্‌সের শিষ্ট অনুশাসন কি অমিতই মান্য করে না—ব্রজেন্দ্র রায়ের মত, তাহার পিতার মত ? সভ্যতার সদাচার হইতে সে ভ্রষ্ট হয় নাই, হইবে না। এমন কি, অমিত জানে না কখন কেমন করিয়া সেই সদাচার সে আজও পালন করিয়া গিয়াছে। এতক্ষণ সে দেখিয়াছে বরং কার্তিক-অপরাহ্নের সেই শান্ত শঙ্কিত-দৃষ্টি ব্রজেন্দ্র রায়ের মুখ, শীত-সন্ধ্যার সেই স্নেহময় সম্ভাষণ ; শুনিয়াছে দূরবর্তী আর-এক যুগের পার হইতে ভাসিয়া-আসা তাঁহার অনুযোগ—'তোমার পরিচয় তুমি দান করো, অমিত।···বুড়োদের কাজ হাতে তুলে নাও' ব্রাশ ঝাড়িতে ঝাড়িতে অমিত যেন পশ্চাতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া আসিতেছে সেই স্মৃতি, সেই কথা।

না, এ চিন্তা নয়, এ চিন্তা নয়। এ চিন্তা নয় · ইহা সত্য নয়, সত্য নয়। সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ও অমিতকে জানেন নাই, ভুল করিয়াছেন। ব্রজেন্দ্র-নাথের মতই অমিতকে তিনি ভালোবাসিয়াছেন, ভালো করিয়া জানেন নাই।···ভালোবাসা আর ভালো করিয়া জানা তো এক কথা নয়। বরং ভালোবাসিলে ভালো করিয়া আর জানা যায় না। তাই কি অমিত ? ভালো না বাসিলে কাহাকেও জানা যায় ? সত্যই কি জানা যায় ? তুমিই কি জানিতে অমিত, মানুষকে ভালো না বাসিলে ? ··কাহাকে, কাহাকে ভালোবাসো তুমি অমিত ? কাহাকে ?

সচকিত হইয়া উঠিল অমিত। ত্রস্ত হইয়া উঠিল, গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে অনেককে ভালোবাসে, অনেক মানুষকে। আর,—মানুষকে।

মানুষকে ভালোবাসো তুমি, অমিত? হাঁ, ভালোবাসো। ভালোবাসো বলিয়াই তুমি তাহাকে জানিতে চাও, আর দেখিতে চাও। আর বুঝিতে পার এ জানার অন্ত নাই, এ দেখার শেষ নাই···কোনো দেখাই শেষ করা যায় না—মানুষকে নয়, পশু-প্রাণীকে নয়; পৃথিবীকে নয়। বিশেষত মানুষকে নয়; কোনো মানুষকেই নয়। তুচ্ছতম মানুষকেও দেখিয়া দেখিয়া শেষ করিতে পার কি তুমি, অমিত? অতি-চেনা, অতি-স্থূল মানুষকেও কি মনে হয় না মিরাকল্ অব্ মিরাকল্স্, 'What a piece of work is man'—না, না, হ্যামলেটের চেনা মানুষ নয়—সে মানুষও নয়। সে যুগ নাই, সে মানুষ নাই, সে হ্যামলেটও নাই। বলুক ব্রজেন্দ্রনাথ ও অমিতের পিতা অমিতদিগকে 'হ্যামলেট্স্ অব্ দি এজ।' না, তাহারা হ্যামলেট নয়।···অমিত তুমি হ্যামলেট নও, তুমি প্রিনস্ অব্ ডেনমার্ক নও। তুমি ইউরোপীয় রিনাইসেন্সের নব-জাগ্রত মানব-সত্তা নও। না, তুমি ভারতবর্ষের এ-কালের কলোনিয়াল ট্র্যাজিডির স্বাক্ষরও শুধু নও। তুমি ভারতবর্ষের আগামী দিনের মুক্ত মানুষের পুরোধা, তুমি মহামানবের আগমনী-গায়ক। ইতিহাসের নব জাতকের আভাস তোমরা, অমিত; আর সেই নবজাতকের স্রষ্টাও তোমরা। তোমরা—তুমিও।

আবার অমিত নিজেকে বলিয়া চলে:

·· না, তুমি হ্যামলেট নও। তুমি এ যুগের মানুষ।—মানুষের সৃষ্টি-শক্তি আজ পৃথিবীকে নতুন করিয়া রচনা করিতে শিখিতেছে, মানুষ আজ শিখিতেছে নিজেকেই রচনা করিবার বিদ্যা। ইহাই এ যুগের দৃষ্টি, ইহাই এ যুগের সৃষ্টি। আর এই মানুষের পরিচয়-রচনাতেই তোমাদের পরিচয়। এই দায়িত্ব হাতে তুলিয়া লও তোমরা, অমিত। অর্থাৎ; 'বুড়োদের কাজ হাতে তুলে নাও তোমরা, অমিত!'

···ক্লাসিক্সের সত্যই কি এই শক্তি আছে অমিত, আজো? ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ছাত্র ছাড়া কাহারও পক্ষে সহজে বুঝা সম্ভব কি—সভ্যতার এই

গতিছন্দ ?—কি জানি, অমিত জানে না। কিন্তু ক্লাসিক্‌স-পড়া মানুষকে সে দেখিয়াছে—তাহার পিতা আর পিতৃবন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথকে। মানিতে হইবে—অমিত তাঁহাদের মধ্যে একটা সত্য দেখিয়াছে। তাহা কি ক্লাসিক্‌সের দান ? না, তাহা উনবিংশ শতকের আলোকোজ্জ্বল লিবারলিজম-এর দান ? অমন কথায় কথায় জীবনকে মিলাইয়া লওয়া শেক্‌সপীয়রের সঙ্গে, মিলটনকে আর মাইকেলকে গাঁথিয়া ফেলা আবৃত্তিতে আর তুলনায় ! বার্কের বক্তৃতা আর চক্‌স-শেরিডেনের বক্তৃতা লইয়া অমিতের সঙ্গে তাঁহারা বিচার ও বিতর্ক করিতেন। নূতন করিয়া তাঁহারা ব্রিটিশ আইন ও রাষ্ট্রবিধি এবং উহার ইতি-হাসকে অমিতের তর্ক হইতে বুঝিতে চাহিতেন। গ্যয়টে আর ভিক্তর হুগোকে ছাড়াইয়া কালিদাস-রবীন্দ্রনাথ লইয়া তাঁহারা উৎসাহিত হইয়া উঠেন, অমিতকে পরাস্ত করেন। আবার ইলিয়ড-ওডেসি ছাড়াইয়া মহাভারতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়েন স্তবপাঠনিরত স্নান-শুচি স্থিরকণ্ঠ ব্রাহ্মণের মত। প্রশান্ত মর্যাদাময় তাঁহাদের সেই জীবন। মহাভারতের বিপুল ব্যাপ্তি ও সুগম্ভীর পরিণাম—তখন অমিতের হৃদয়কেও অবনত করিয়া দেয় প্রাচীন ভারতের উদ্দেশে। সংযত-বাক্‌ শিল্পের মত তাঁহারা জীবন ও সংসার রচনা করিতেন। কীটসের সেই ওড্‌-এর মত ব্রজেন্দ্র রায়ের জীবন, মিলটনের সনেটের মত ঘননিবদ্ধ অমিতের পিতার দিন-রাত্রি : তাহাই কি ক্লাসিক্‌সের দান—এই স্নিগ্ধ সংযত প্রশান্তি-মর্যাদাময় আত্মসমাহিতি ? তাহা হইলে অমিত ক্লাসিক্‌সের এই সত্য দেখিয়াছে। কিন্তু অমিত ইতিহাসের গতিমুখর যুগের মানুষ—গতিচঞ্চল জীবন-মহাকাব্যের ছাত্র সে। সে ইতিহাসের ছাত্র—সে ক্লাসিক্‌সের সংযত গম্ভীর শিল্পমূর্তি নয়। না, হ্যামলেটের দেখা সে মানুষ নাই,—সে যুগ নাই। হ্যামলেটও নাই। আজ অন্য যুগ, অন্য দিন।

তথাপি অমিতের মনে কোথা দিয়া মিশিয়া যায় ব্রজেন্দ্রনাথ ও সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়। হয়তো ভালোবাসার মধ্য দিয়া। ভালোবাসার মধ্য দিয়াই তাঁহারা অমিতের মনে এক হইয়া উঠেন। অথচ তাঁহারা দুইজন দুই পৃথিবীর দুই মানুষ ; বুদ্ধিবাদী প্রিয়ভাষী সরকারী কর্মচারী ; আর মুক্তিবাদী স্বল্পভাষী 'স্বদেশী' কর্মী। দুই পৃথিবীর মানুষ তাঁহারা, দুই পৃথিবী হইতে ভালো-

বাসিয়াছেন তাঁহারা অমিতকে। সেই ভালোবাসার মধ্য দিয়া দুই মানুষ অমিতের চেতনায় একসঙ্গে একত্র হইয়া দাঁড়ান। ইঁহাদের কাহাকে তুমি অস্বীকার করিবে, অমিত? কে তোমার পর ও অনাত্মীয়? কোন পৃথিবী তোমার অগ্রাহ্য?

২

চা লইয়া আসিয়াছে রঘু ওড়িয়া। ছয় বৎসর পরেও সে ভোলে নাই অমিতকে—অমিতও তাহাকে ভোলে নাই। ইতিমধ্যে বহু বার রঘু এই জেলে আসিয়াছে গিয়াছে। বার কয় ঘানি-ঘরে গিয়াছে; ছোবড়া পিটাইয়াও দিন কাটাইয়াছে; 'সাত খাতায়'ও ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সেবা-নৈপুণ্যের ত্রুটি নাই রঘুর। বহু বহু কর্মীর আদর-অনাদর মাথায় বহন করিয়াই একটু সলজ্জ হাসিয়া হয়তো তাহাদের চা ও টোস্ট, আহার ও পানীয় যোগাইয়াছে; তাহাদের বিছানা ও জিনিস-পত্র পরিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু অমিতের মত এমন করিয়া কি কেহ রঘুকে আর জানিয়াছে? না, রঘুই জানিয়াছে অন্য কাহাকেও?...

দুই মাস একান্ত-বাসের পর ছয় বৎসর পূর্বে যখন অমিত প্রথম এখানে পদার্পণ করিয়াছিল, তখন এমনি এই ঘরে চা লইয়া ঢুকিতে দেখিয়াছিল রঘু ওড়িয়াকে। সেদিন অমিত যেন মৃত্যুলোকের প্রত্যাবৃত্ত মানব-ছায়ার মত আসিয়াছিল। সমবেদনশীল লোকের অভাব এ স্থানে ছিল না। রঘু ওড়িয়া তখন ছয় মাস জেলের বাকি তিন মাস শেষ করিবার জন্য রহিয়াছে এই 'কি ভায়'। দড়ি পাকাইতে পাকাইতে পাকিয়া গিয়াছে তাহার দড়ির মত পাকানো শরীর। বয়স নাকি ত্রিশের কোঠায় পৌঁছে নাই। কিন্তু তাহার চেহারায় কাল-জয়ী ছাপ—কোন বয়সের এ মানুষ, তাহা জানিবার উপায় নাই। চল্লিশ ছাড়াইয়া যে-কোনো বয়স হইতে পারে। দেহের নিজ রঙ

পুড়িয়া একটা পোড়া-পোড়া রঙ ফুটিয়াছে। বৈশিষ্ট্যহীন চক্ষু। চোয়ালের উঁচু হাড়ের নীচে চোপসানো ভাঙা গাল। সাধারণ মোটা নাকটা হঠাৎ ওষ্ঠের প্রান্তে আসিয়া অসাধারণ ভাবে লাফাইয়া উপরে উঠিতে চাহিয়াছে। রঘুর সমস্ত মুখটিকে হাস্যব্যঞ্জক বৈশিষ্ট্য দিয়াছে এই নাসিকার উল্লম্ফন। নহিলে কোথাও শ্রীলেশ নাই রঘু ওড়িয়ার রূপে—সে প্রয়াসও রঘুর নাই। ঘোড়া-ছাঁটা ক্লিপের সাহায্যে জেলে প্রথম দিনেই তাহাদের মাথা মুড়াইয়া দেওয়া হয়। মাসে একবার করিয়া সার বাঁধিয়া বসিয়া সেই কেশ-মুণ্ডন আর গুম্ফ-শ্মশ্রু-বিমর্দন বিধিগত—উহার নামে রক্তপাতও অনিবার্য ; মুখের চামড়া মাসে তখন নাকি একবার করিয়া ট্যানড হইয়া যায়। তাহারই মধ্যে তবু সেই কদমছাটা চুলে কত জন বদ্রিনাথের মত সযত্ন কেশ-বিন্যাসের গোপন চেষ্টা করে। গোপনে গোপনে বহু আয়াসে সেফটি ব্লেড সংগ্রহ করিয়া চামড়া চাঁচিয়া দাড়ি কামায়, গোঁফ ছাঁটে, নহরের জলে নিজের রূপকে বারে বারে দেখে। ইহাও এখানকার নিয়ম—এই নিয়ম ভাঙা। কিন্তু প্রসাধনের এইরূপ কোনো প্রযত্ন রঘু ওড়িয়ার নাই। নিজের থালা-বাটি যত্ন করিয়া মাজে, জাঙ্গিয়া-কুর্তা সাফ করে—বস্, এই পর্যন্ত। তথাপি এই বাইশ-মহলা বাড়ির সকল মহলেই রঘুর পরিচয় আছে। গলায় 'খোকড়' সে রাখে না। সোনা-দানা গলায় পুরিয়া আনিয়া জেলের জীবনটাকে একটু সহনীয় করিবার চেষ্টাও যে করিবে, রঘু এমন নয়। সীসার ঢেলা দাঁতে বাঁধিয়া গলায় পুরিয়া 'খোকর' তৈয়ারী করিতে রঘুর বিশেষ কষ্ট হইত না—গলাটা একটু পচ ধরিত, মাস পাঁচ-ছতে সকলেরই তাহা সহ্য হইয়া যায়। তারপরে খোকর তো রীতিমত টাকার থলে —জেলখানা তাহার জোরে রীতিমত হোটেল। কিন্তু রঘু আর প্রত্যাশা করে না টাকার থলে। আসুরিক বলে ও সাহসে সকলের মারপিটকে সর্বাগ্রে চ্যালেঞ্জ করিয়া—মারপিট সহিয়া আর মারপিট করিয়া—জেলখানার সেই নিয়মিত পথে আপনার স্থান এখানে করিয়া লইবে, এমন বল, এমন সাহসও ওড়িয়া-সন্তান রঘুর নাই। সেই পথ হেমা ঘোষের মত খুনীদের জন্য ; সেই পথ খোদাবক্সের মত পেশোয়ারী ডাকাতদের জন্য। বাঁচিতে হইলে অপরকে মারিয়াই বাঁচিতে হয়, যেই মুহূর্তে মারিতে না পারিলে সেই মুহূর্তেই মরিতে

আরম্ভ করিলে,—ইহাই প্রধান ও সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য; হেমা ঘোষ অমিতকে হাসিয়া জানাইয়াছে। রঘুর মত মানুষেরা কিন্তু এই সত্যের অন্যার্থও আবিষ্কার করিয়া লয়,—নিজেদের এই নিয়মে মার সহিয়াই তাহারা মারকে সামান্য করিয়া ফেলে—এবং বাঁচিয়া থাকে। 'এমনি হয়'—ইহাই নিয়ম—তাহা তাহারা জানে।

রঘুর নাম অবশ্য এই 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'-শক্তির জন্যও নয়। দর্জির কাজ হইতে দড়ির কাজ, কোনো কাজেই তার নৈপুণ্য কম নয়। কিন্তু তাহাতেও রঘুর পরিচয় নয়। রঘুর পরিচয়—এই হাজার দুই অভিজ্ঞ ও রসজ্ঞ বন্ধুর মহলে রঘু ওড়িয়া 'ওস্তাদ'—সে চরসের গুরু। কতটা তামাক-পাতা, কতটা গুলি, কতটা কি মিশাইয়া কোন স্তরের মানুষকে কি দিতে হইবে,—রঘুর মত তাহা কয়েদিরা আর কেহ জানে না—জমাদার, সিপাইরাও নয়। কিন্তু এই নিষিদ্ধ জিনিসের আমদানি-রপ্তানি রঘুর কারবার নয়। সে জানে উহা আসিবেই। যাহাদের আত্মীয়বন্ধু বাহিরে আছে তাহারা নিজেরাই উহার লুক্কায়িত সোনা-দানা দিয়া ঐ সব জিনিস আমদানি করাইবে। আর তাহারাই তারপর ডাকিবে রঘু ওড়িয়াকে—'এ রঘু, আও, আও।'—হিন্দুস্থানী বরাবরই জেলখানার রাষ্ট্রভাষা।—চোখে পড়িবার মত মানুষ রঘু নয়, তবু তাহাকে সকলেই চিনে। তাহার শত্রু নাই, একান্ত মিত্রও নাই, সকলেই প্রায় সমান বন্ধু। কারণ এই তুচ্ছদেহ মানুষটাই দরকার পড়িলে পরশুরাম কি শুক্কুরের কমতি-পড়া ছোবড়া পিটিয়া তাহাদের বরাদ্দ পূরণ করিয়া ফেলিবে—পারিলে তাহাকে না হয় পরশুরাম সেইজন্য দিবে আধখানা বিড়ি। আর না পারিলে? কতবার এমন হইয়াছে রঘুর একাদিক্রমে দুই-এক দিন বিড়িও মিলে নাই। 'এমন হয়', এখানে এমন হয়—তাহাও সে জানে। তাই কষ্ট পাইয়াছে, কিন্তু রঘু ক্ষোভ কাহারও বিরুদ্ধে রাখে নাই। দুইদিন পরেই তো আবার সব মিলিয়া যাইবে।

এই জেলে অমিতের হাত হইতে অমিতের দেহ-ভার অত্যন্ত সহজ ভাবেই রঘু ওড়িয়া লইয়া ফেলিয়াছিল। এ জীবনে অমিতকে এই ভাবে ভার-মুক্ত করিবার সৌভাগ্য আর কেহ পায় নাই,—মা না, বোন নয়, ভৃত্যরা

নয়। হয়তো অমিত বড় শ্রান্ত অসুস্থ ছিল বলিয়াই রঘু তাহা তখন আয়ত্ত করিয়া লইল।

কাচের গেলাসে খাবার জল হাতের কাছে রহিয়া গিয়াছে। কোথা হইতে উহার এই অ্যালুমিনিয়মের ঢাকনি মিলিল? অমিত ঢাকনিটা নাড়িয়া দেখিল। তারপর রঘুকে জিজ্ঞাসা করিল।

রঘু সসম্ভ্রমে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

কোথায় পাওয়া যায় এ ঢাকনি?—আবার প্রশ্ন করিল অমিত।

এম্‌-ডি'তে হয়, বাবু। কারখানা-ঘরে হয়।—রঘু শেষ পর্যন্ত উত্তর দিয়াছে—কলিকাতার বাঙলার সঙ্গে কলিকাতার ওড়িয়া মিশাইয়া।

কারখানা? এখানে কারখানা! কোথায়?—বেশী ভালো করিয়া উত্তর দিতে পারে না রঘু, তবু নতুন খবর পাইয়া অমিত আশ্চর্য হয়। এখানেও কারখানা চলিতেছে। অ্যালুমিনিয়মের থালাবাসন তৈরী হয়। মগ ও ঢাকনিও তৈয়ারী হয়,—তাহা হাসপাতালে যায়।

তুই পেলি কোথায়? অমিত প্রশ্ন করিয়াছে। রঘু মুখ নামাইয়া সলজ্জ হাস্য গোপন করিতে চাহিল। উত্তর দিল না। নিজের কৃতিত্ব ও বুদ্ধির কথা সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না।—ভাষাও নাই। কেষ্ট 'পাহারা' হইলে এতক্ষণে অনায়াসে একটা কত বড় গল্প ফাঁদিয়া ফেলিত—কালই শোনাইল যেমন কেষ্ট অমিতকে।

'দিতে চাইছিলেন না, ডিপুটি জেলার বাবু ভয় পান। আমি বললাম 'কি বলেন স্যার, এ সব বই আপনারা কত পড়েছেন। জানেন না কি? আর আপনারা ছাড়া এঁদের মত লার্নেড ম্যানদের কে দেখবেন? এই ইডিয়েট সাহেবগুলো?' কেষ্ট ইংরেজি-জানা লোক, সে বিষয়ে কাহারও সে কোনো সময় সংশয় পোষণেরও স্থান রাখে না। কেষ্ট জানায় সেই 'স্যরের' সঙ্গে তাহার 'পাহারার' বুদ্ধির খেলা, কথার ম্যারপ্যাঁচ। তাহাতেই বই-এর পুরনো মোহরাঙ্কিত পৃষ্ঠায় এ-জেলের নতুন শীলমোহর পড়িয়া গেল। বাদী বাবুর বই 'পাশ' হইয়া গেল। আর কেষ্ট পাহারা সেই ফরাসী ডিক্‌শিনারি ও ইংরেজি বাইবেলের পুস্তক-ভার সম্মুখে রাখিয়া অমিতকে সপ্রতিভ ভাবে বুঝাইয়াছে,

'কাল নিয়ে এলাম স্যর, কৌশল করে। দুপুরবেলা, আপিসে বড় সাহেব-টাহেব নেই তো কেউ। একমাত্র ছোট ডিপুটি সাহেব ছিল। বুঝি তো স্যর, কিছুটা পড়াশোনা না করতে পারলে আপনার মত লার্নেড ম্যানদের দিন কাটবে কি করে ?'—তারপর কেষ্টর কৃতিত্বের কাহিনী আরম্ভ হইল। কত ভাবে বই কয়খানা আদায় করিয়া, কয়টা দুয়ারে কয়টা তল্লাসী পার হইয়া, কেষ্ট পাহারা অমিতের জন্য এই বই উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিয়াছে 'সাত খাতায়'। সর্বশেষে সবিনয়ে জানায় কেষ্ট। সে স্যার আমাকে আটকাতে পারবে না, আপনাকে গর্ব করে বলতে পারি।'

তার পর কেষ্ট বলিল: আপনি সিগারেট খান না বুঝি? অনেকদিন স্মোক্ করি নি—। অমিত বুঝিল—এইবার কেষ্ট একটা সত্য কথা বলিল।

কিন্তু রঘু মুখ ফুটিয়া তথাপি বলিতে পারে না কোথায় পাইল সে গেলাসের এই ঢাকনি।

অমিতের কৌতূহল বাড়িল: কি রে, কোথা থেকে পেলি —

হাসপাতালে।—অনেক পরে সলজ্জ হাস্যে একটি কথা উচ্চারণ করিল।

হাসপাতালে? এখানে এল কি করে?

বার কয় জিজ্ঞাসার পর জানা গেল হাসপাতালের লোক আসে ঔষধপত্র বহন করিয়া—তাহারাই ইহাও আনিয়াছে। অমিতের কাপড়-কাচা সাবানের এক টুকরা রঘু এইজন্যই বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। সাবানের টুকরার দাম ঢাকনির দাম।

পরিচ্ছন্ন গেঞ্জি কাল গায়ে পরিয়া অমিতের মনে একটা তৃপ্তি আসিয়াছিল। রঘু সাবান দিয়া কাচিয়া দিয়াছে। আজ মনে মনে কৌতুক ও কৌতূহল জাগিল—কারণ, রঘু জানায়, সেই সাবানের একটা টুকরাই কোথা দিয়া আবার পরিণত হইয়া আসিয়াছে গ্লাসের ঢাকনিরূপে। এমনি হয় এখানে। আশ্চর্যরূপে জিনিসের রূপান্তর ঘটে—তামাক-পাতা পরিণত হয় হাজার টাকার নোটে। আবার নোটও পরিণত হয় তামাক পাতায়, বিড়িতে, চরসে,—হয়তো হাসপাতালের লঘু কর্তব্যে, গোশালার দুগ্ধে, ডাক্তারের ঔষধে, বড় সাহেবের ব্যাটারে ও ব্রাণ্ডিতে। এই আণবিক পরিবর্তন-পদ্ধতি সনাতন ও সুদীর্ঘ।—

এই জন্যই ইহার বিরুদ্ধে যেসব নিয়ম কানুন আছে, তাহাও অপরিবর্তনীয়—বরং এই সব ট্যারিফ, উট্রায়ার সূত্রেই এই ট্রেড্ চ্যানেল উর্ধ্বে-নিম্নে সুদূর-বিস্তৃত। অন্য সময় হইলে রঘুর কাজটা অমিতের ভালো লাগিত না! কিন্তু তাহার নিকট জেলখানার ইতর ও নিষ্প্রাণ অবস্থা ও ব্যবস্থার একটা হাস্যকর দিকও ক্রমশ চোখে পড়িতে লাগিল। আমলাতন্ত্রের এই কৃত্রিম বিধি-বিধানের অষ্টাবক্র রূপটাও কি কম সত্য? যেন ফলস্টাফের জগতের একটা টুকরা আসিয়া পড়িয়াছে এখানে। অনেক পার্থক্য আছে; তবু কত মিলও!—শ্রান্তচক্ষে অমিত তাহা বসিয়া বসিয়া দেখিত। আর দেখিত তাহার শেভিং-বাক্স ও ক্ষুর ধুইবার জন্য জল লইয়া দাঁড়াইয়া রঘু। আহারশেষে পেয়ালা, প্লেট সোডায় সাবানে অমনি পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া যায় তৎক্ষণাৎ রঘু। এমন হাতের কাছে আহারান্তে পাইয়া অমিত লবঙ্গ-এলাচ আবার ধরিয়া ফেলিল। সোরাই জলে ভরা। শুধু চা-ই নিয়মিত আসে না, মসলা-মুক্ত আহার্যও তাহার জন্য দশজনের ভিড়ের মধ্যেও সযত্নে প্রস্তুত হইয়া যায়। না, ইহার পূর্বে এমন করিয়া অমিতকে সেবা করিবার অধিকার আর কে লইতে পারিয়াছে?—

শুধু ফলস্টাফের পৃথিবী নয়, এ যেন গোর্কির পাতালপুরীও।

অমিত রঘুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কিন্তু উত্তর সহজে পায় নাই। একটু একটু করিয়া সংগ্রহ করিয়াছে রঘুর সংবাদ। গঙ্গার ওপারে শিবপুরে তাহার দাদার দোকান আছে। ছোট দোকান; মুড়ি-মুড়কির দোকান। ডাল-চালও এখন রাখে। চিনি-গুড়, বাতাসা, সামান্য ‘বানিয়াতি’ জিনিসও মিলে। বৎসর পাঁচ সাত পূর্বে রঘু সেই দোকানেই দাদার সাহায্য করিতে আসিয়াছিল; এখন রঘু আর দোকানে যায় না। বাড়ি যায়, তবে অনেক সময়ে যায়ও না। রঘুর জন্য দাদা ও ছোট ভাইটাকে পুলিশ টানাটানি করিতে থাকে, দুই-এক টাকা ঘুষ না পাইলে তাহাদেরও থানায় লইয়া চলে। ভ্রাতৃবধূও আর বারে বারে রঘুর জন্য এই জ্বালাতন সহিতে চায় না। দেশে অবশ্য রঘুর বাপ-মা আছেন; পুরী জিলার গ্রামে। জায়গা-জমি আছে, তাঁহারা চাষবাস করেন।

স্ত্রী?—জিজ্ঞাসা করে অমিত।

রঘু লজ্জা পায়।

স্ত্রী নেই ?—বারে বারে জিজ্ঞাসা করে অমিত।

রঘুর লজ্জা কাটে না।

বিয়ে করিসনি ?

মাথা নাড়িয়া রঘু জানায়—বিবাহ সে করে নাই।

কিন্তু কথাটা সত্য নয়। আর একদিন রঘুর সামনেই অমিতকে হাসিয়া আপ্পাস্বামী জানাইয়া দেয় ওড়িয়াদের শিশু-বয়সেই বিবাহ হয়।

সত্যই তো, অমিতের মনে পড়ে,—এদেশে কাহার না হয় শিশু-বয়সে বিবাহ ? বিবাহ তো এ দেশের মানুষ নিজে করে না, বিবাহ 'হয়'। বিবাহ তাহাকে 'দেয়' তাহার পিতা-মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, আত্মীয়, পরিজন। তাহা পরিবারের অনুষ্ঠান, ব্যক্তির পত্নী-নির্বাচন নয়। রঘুরই বা তবে বিবাহ হইবে না কেন ? রঘুর পিতা-মাতারও রঘুর জন্য যথাসময়েই বউ আনিবার কথা—অর্থাৎ রঘুর যখন আট দশ বৎসর বয়স।

অমিত জিজ্ঞাসা করে, বিয়ে হয় নি বলেছিলি যে তবে ?

মাথা নোয়াইয়া নীরবে মেজের ঝাড়-দেওয়া কুটা ও ধূলা খুঁটিয়া তুলিতে থাকে রঘু।

মিথ্যা কথা বলেছিলি ? কি রে, মাথা তোল না।

মাথা তুলিতে বাধ্য হয় রঘু।

মিথ্যা কথা বলেছিলি—না ?

অম্লান বদনে তেমনি সলজ্জ ভাবে রঘু জানায়, হাঁ, বাবু।

মিথ্যা বলিবে না, এমন প্রতিশ্রুতি রঘু তো দেয় নাই। অমিতই কি দিয়াছে কাহাকেও কোনো কালে ? সংসারে মিথ্যা সকলকেই বলিতে হয়। যুধিষ্ঠিরকেও বলিতে হয়। 'তবে যুধিষ্ঠিরের মত অত মারাত্মক মিথ্যা সাধারণ মানুষে বলিতে জানে না, ইহাই পার্থক্য'—অমিতের এই পরিহাস শুনিয়াই পরে একদিন লক্ষ্মীধর বাবু ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু, মিথ্যা বলার জন্য রঘুর উপর অমিতের কোনো বিরাগ-বিরক্তি হইল না। কারণ, অমিত ভাবিয়া দেখিয়াছে, এ মিথ্যায় কি লাভ রঘুর ? কিছুই নয়। একেবারে 'নিষ্কাম'

এই মিথ্যা, আর ইহাই তো নির্দোষ মিথ্যা। নিষ্কাম কর্মই যদি জীবনের চরম সাধনা হয়, তাহা হইলে নিষ্কাম মিথ্যাতেই বা আপত্তি কি? কাহারও ক্ষতি নাই—লাভ নাই বক্তারও, কিন্তু সেই সূত্রে বরং জীবনে জোটে অনেক রহস্য, অনেকখানি কৌতুক, অনেকখানি ফলস্টাফীয় আনন্দ আর সত্য।

এই স্বচ্ছ মিথ্যাটা উপভোগ করিতে করিতে অমিত জানিয়াছে—রঘু জানে না তাহার স্ত্রী কোথায়, রঘুর পিতা-মাতার কাছে আসিয়াছে, না এখনো রহিয়াছে বধূর পিতৃ-গৃহে। এখনো কি সে বালিকা, না যুবতী—রঘুর সে সম্বন্ধেও কৌতূহল নাই।

বাড়ি যাস্ না? কতদিন যাস্ না?

রঘু জানাইয়াছে অনেকদিন, পাঁচ বছরের বেশী।

স্ত্রী সম্বন্ধে রঘুর ঔৎসুক্য নাই। তাহার বন্ধুরা অনেকে বাড়ি যায় না—স্ত্রী-পুত্রেরই নিকট 'চোর' বলিয়া পরিচয় দিতে কেমন লজ্জা-বোধ করে বলিয়া। স্ত্রী-পুত্রও গ্রামে দশজনের নিকট তাহাদের জন্য মুখ দেখাইতে পারে না। রঘুর জীবনে অবশ্য স্ত্রীর স্থান মোটেই হয় নাই। হইলেও সম্ভবত তাহা মুছিয়া যাইত। অন্য রমণীর ছায়া হয়ত আসিয়া জুটিত। তাহাও আসিত, যাইত,—কখনো ঘন হইয়া দাগ কাটিয়া বসিত, কখনো ফিকে হইয়া আবার উঠিয়া যাইত! রঘুর জীবনে কি তেমন কোনো বন্ধন নাই? অমিতের কৌতূহল হইত, কিন্তু অমিত তাহা জানিতে পারে নাই, বিশেষ জানিতে চাহে নাই—রঘু বড় লজ্জায় পড়িত জিজ্ঞাসা করিলে। অমিতকে যে সে অনেক বেশী মান্য করে, সমীহ করে। হয়তো জিতেন্দ্রিয় পুরুষ নয় রঘু, তবু অমিত বুঝিয়াছে—রঘু নির্বিকার পুরুষ, বৈদান্তিক, মায়া-বন্ধনই যেন তাহার নাই।

কিন্তু বন্ধন রঘুরও আছে। ছেনীর জন্য রঘুর প্রেম নিতান্ত সাধারণ নয়। বিড়ালের জন্য জেলখানায় সরকারী ভাত মঞ্জুর আছে—ইঁদুর ধরিবে। বিড়াল-গুলি স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে দেয়ালে, কার্নিশে, গরাদের ফাঁকে-ফাঁকে। এই বিড়াল লইয়াই কয়েদীর পরিবার। রঘুও ইহার মধ্যে একটা বেড়াল-ছানা জুটাইয়া লইয়াছে। আর রঘুর সৌন্দর্যবোধ আছে—সাদার উপরে সামান্য

কালো রঙ মিশানো হৃষ্টপুষ্ট ছেনী দেখিতে চমৎকার—অমিতও তাহা মানে। ছেনী রঘুর সঙ্গী।

জিজ্ঞাসা করিলে রঘু লজ্জা পায়, কিন্তু মনে করিতে পারে না—কখন সে চুরি আরম্ভ করিয়াছিল। শুধু মনে পড়ে—সে পকেটমার ছিল না। কয়েদি-সমাজে পকেটমাররা উপহাসের পাত্র। রঘু উহার অপেক্ষা একটু উপরের তলার লোক—'তালাতোড়'।—সিঁদেল চোর নয়, ডাকাত-গুণ্ডাও নয়—অতটা দুঃসাহসের দাবী রঘু করে না। কিন্তু প্রথম বার জেলে আসিয়াছিল ছিঁচকে চোর হিসাবে। হাওড়া হাটের একটা দোকান হইতে সেবারও থান-কয় কাপড় লইয়া রঘু সরিয়া পড়িতেছিল, ধরা পড়িয়া গেল। সেই প্রথম জেল। তারপর ও-রকম আরও ঘটিয়াছে; নানা ভাবে বার পাঁচ-সাত ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

কেন চুরি করিস?

রঘু উত্তর দেয় না। অমিত মনে করাইয়া দেয়,—তুই তো চমৎকার কাজকর্ম করতে পারিস। কাজ করিস না কেন?

রঘু উত্তর দেয় না। বেড়ালছানাটা তাহার পায়ে সাদরে গা ঘষিতে থাকে। বুঝা যায় কথাটায় সে মোটেই গুরুত্বও দেয় নাই।

কে বলিয়াছিল, নেশার টাকার জন্যই চুরি করিতে হয়। অমিতও তাই বলিল,—চরস তো সস্তা নেশা। আর কিছু নেশা করিস না কি?

রঘু মাথা নোয়াইয়া একটু হাসিয়া বেড়ালটাকে আদরের সঙ্গে সরাইয়া দেয়।

আর কি কি নেশা খাস রঘু?—অমিত সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করে।

রঘু ধীরে ধীরে বলিয়া যায়—মদ-অ খাই, গাঁজা খাই, গুলি খাই, চরস-অ খাই—যেমন-অ পাই খাই।—গর্বের লেশ নাই তাহার কথায়, বরং একটু লজ্জা আছে।

না, শেক্সপীয়ারও তাহার পরিচয় পায় নাই,—অমিত তাহা বোঝে,—গোর্কিও দেখে নাই তাহাকে। সে প্রেসিডেন্সি জেলের রঘু ওড়িয়া।

অমিত জিজ্ঞাসা করে, এত পাস কোথায় রে?

চুরি করি।—নির্বিকার-চিত্তে রঘু জানায়। চুরির নেশাই রঘুর পক্ষে বড়,

না নেশার জন্য চুরিই তাহার পক্ষে প্রয়োজন, অমিত জানিতে চায়। রঘু ঐ তত্ত্ব কখনো ভাবিয়া দেখে নাই,—কোনো তত্ত্বই সে জানে না,--বলিতেও পারে না।

আচ্ছা, সংবাদপত্র অপিসে কাজ করবি তুই, রঘু—দপ্তরির কাজ, বাঁধাইর কাজ? তুই তো বেশ ভালো শিখেছিস তা জেলে।—রঘু নীরব থাকে। সম্মতি আছে ভাবিয়া অমিত বুঝাইতে থাকে—বাহিরে গিয়া চাকরির জন্য কোথায় সে কাহার নিকট অমিতের নাম করিবে।

তাড়াতাড়ি বাধা দেয় রঘু। কেন রে?—ঠিকানা নিবি না?

না, না—। চোরকে বিশ্বাস অ নাই, বাবু। ঠিকানা দিবান না। বাড়ির-অ নয়, আপিসের-অ নয়।—না, না। কখন নেশার দরকার হব; আপনকার মাক কহিব, 'অমুক বাবু জেলরু চাহি পাঠাইলেন—পনরটা টঙ্কা দিয়।'

রঘু তাই অমিতের নিজের ঠিকানাও গ্রহণ করিবে না।

অথচ অমিতের বাক্সের চাবি হইতে কলম, ঘড়ি সবই তো থাকে রঘুর জিম্মায়। সাধ্য নাই কেহ সে বাক্স, সে টেবিলের কাছেও ঘেঁষিবে—রঘুর পাহারায় কিছুই খোয়া যাইবার উপায় নাই। ··

যুবক মিহির বোস সেবার ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। জন পঁচিশ সিপাহী লইয়া জেলার আসিতেছে। তল্লাসি শুরু হইবে।

এরূপ ঘটনা পূর্বেও ঘটিয়াছে। তল্লাসির নিয়ম জেলে বরাবরই আছে। মাঝে মাঝে সব তল্লাসি করিতে হয়। এতদিন বন্দীদের ব্যারাকে তল্লাসি হইত না, এবার শুরু হইল। ও-ব্যারাকে তল্লাসি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; এ-ব্যারাকে মিহির করিবেন কি এখন? দশ টাকার দশখানা নোট তাঁহার নিকট আছে। অমিত কতকটা পীড়িত, অনেকটা সম্মানিত;—হাতের মোটা খামটা লইয়া মিহির উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসু চক্ষে বলেন,—অমিদা—?

জেলে টাকাকড়ি রাখা নিষিদ্ধ, তাহা দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

অমিত চুপ করিয়া থাকে। প্রশ্ন করা নিষ্প্রয়োজন। অমিত ইহাও জানে টাকার প্রয়োজন আছে এখানে—টাকা এখানে রাখিতেই হয়। শেষে মিহিরকে অমিত হাত বাড়াইয়া দেয়—দিন।

তারপর ? আপনার কাছে পেলে ?—উৎকণ্ঠিত মিহির নোটের খামটা দিতে দিতে একবার জিজ্ঞাসা না করিয়া পারেন না।

পাবে না। পেলে ?—নিয়ে যাবে। কিন্তু পাবে না।—মিহিরও যেন ইহা শুনিতেই চাহিয়াছিলেন, শুনিলেই আশ্বস্ত বোধ করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, বাঁচেন।

মিহির চলিয়া গিয়াছেন। অমিত ডাকিল,—রঘু!

রঘু সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। অমিতের চাবি তাহার কাছে, তল্লাসির সময়ে বাক্স-পেঁটারা খুলিয়া দিবে, অসুস্থ অমিত অত মাল-পত্র খুলিয়া দেখাইতে পারিবে কেন ? তাই রঘুর তল্লাসি একবার হইয়া গিয়াছে, এখন ঘরের বাহির হইতে গেলে আবার তল্লাসি হইবে। অমিত খামটা হাতে দিয়া বলিল,—রঘু, রাখতে পারবি তো ? দশটাকার দশখানা নোট।

রঘু বিনা দ্বিধায় হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল। অমিতের হাতে তাহার বাক্সের চাবি দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল—যেন বেড়ালছানাটাকে এদিকে-সেদিকে খুঁজিতেছে।

তল্লাসি উপলক্ষ করিয়া কর্তৃপক্ষের সহিত বন্দীদের সেদিন ধ্বস্তাধ্বস্তি হইল। অল্পবিস্তর হাতাহাতিও হইল। এক পক্ষের নিয়ম-রক্ষার ও অপর পক্ষের বিরোধিতার জন্য জবরদস্তি যতটা হইবার হইল। ঠিক তল্লাসি সম্ভবত হইল না, ঠিক প্রতিরোধ হইল না। অমিতও মৌখিক প্রতিবাদ যথেষ্ট করিল, বাধা দিল না, দিতে পারিতও না, সে তখনো অসুস্থ। কিন্তু নিষিদ্ধ বস্তু কিছুই পাওয়া যায় নাই।

অমিত এ জেলে থাকিতে থাকিতেই সেবার আর একদিন তল্লাসি হইয়াছে। কেহ বাধা দেয় নাই, কিন্তু সেই দশখানা দশ টাকার নোটের সন্ধান কোনো কালে কেহ জানিতেও পারে নাই—রঘু চোর, হুঁশিয়ার লোক। টাকাটায় কাজ হইয়াছে—যেমন হইবার, যদিও এখানে টাকা বাঁচাইয়া রাখা সহজ নয়। এখানে-ওখানে কয়েদির লুকানো টাকা চুরিও যায়। সিপাহীরা পাইলে কাড়িয়া লয়। মিথ্যা করিয়াও কেহ কেহ কাঁদা-কাটি করিয়া জানায়—সর্বনাশ হইয়াছে, কে তাহার গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়া আত্মসাৎ করিয়াছে।

নিজেদের 'স্বদেশী' সঙ্গীদেরও টাকার ব্যাপারে সেরূপ আচরণ একেবারে অমিতের অজ্ঞাত নয়—নরেন্দ্র মিত্রের সেইরূপ কাণ্ড অমিত শুনিয়াছে। এই জেলেই তাহার কাছে কিরূপ লুক্কায়িত টাকা জমা ছিল। সকলেরই সন্দেহ নরেন সেই টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে, চোরেরা কেহ স্বদেশবাসীদের টাকা স্পর্শও করে নাই। কিন্তু রঘু থাকিতে অমিতের কিংবা মিহিরের ভাবিতে হয় নাই। টাকা ধরা পড়িবে না, মারা যাইবে না।

অথচ 'চোর-অকে বিশ্বাস নাই' বলে রঘু; অমিতের বাড়ির ঠিকানাও সে বলিতে দেয় না অমিতকে। ভাবিয়া অমিতের আনন্দ হয়—একবারের মত অন্তত সে তাহার মতবাদের আরও সমর্থন পাইল—মানুষকে বিশ্বাস করিলে যত ঠকিতে হয়, তাহার অপেক্ষা বেশী ঠকিতে হয় মানুষকে অবিশ্বাস করিলেই। মনে পড়িল টলস্টয়ের লেখা গল্প—আশ্চর্য সে গল্প। সে লোকটাও চোর, তবু সে ভালবাসে। সেই ভালোবাসার পাত্রী তাহারই হাতে তাহার টাকার থলি যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার ভার দিল। দায়িত্বের ভার ও ভালোবাসার ঐকান্তিকতা এক দিকে, আর এক দিকে চোরের লোভ, নগদ টাকার দুর্বার আকর্ষণ। দুর্বার সংগ্রাম মানুষটির অন্তরে। আর শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়া যখন সে গন্তব্য-স্থলে পৌঁছিল তখন দেখিল সংগ্রামের মধ্যে সেই থলিই খোয়া গিয়াছে। কিন্তু কে তাহার এই কথা বিশ্বাস করিবে?

বিশ্বাস করিলে কিন্তু ঠকিতে হয় না। যে রঘু 'তালাতোড়'—'স্বদেশীদের' নগদ টাকাও সে এমনি করিয়া আগলাইয়া ফিরিতেছে। কিন্তু রঘুর মুখ দেখিয়া সে মুখে অমিত আত্মসংগ্রামের কোনো চিহ্ন দেখিতে পায় না। তেমনি নিস্পৃহ নিশ্চেতন নির্বিকার, কাজ করিয়া যাইতেছে। টলস্টয় কি কখনো চোর দেখিয়াছিলেন—যে চোর নিজ হইতে বলে, 'চোর-অকে বিশ্বাস-অ নাই।' আর টাকা হাতে পাইলেও মনে যার দ্বন্দ্ব বাধে না! টলস্টয় অনেক দেখিয়াছেন, কিন্তু অনেক দেখেনও নাই নিশ্চয়। অথবা, দেখিয়াছেন কম, কিন্তু আঁকিয়াছেন তিনি দেবতার মত স্থির হস্তে। অমিত আঁকিতে জানে না, কিন্তু দেখিতে পাইল অনেক।

রাওয়ালপিণ্ডির পাঠান এনায়েত খাঁ। রঘুর বেড়াল-ছানাটার সৌন্দর্য তাহার

চোখে পড়িয়াছে ; হয়তো বাচ্চাটার প্রতি রঘুর ও অন্য কয়েদিদেরও মায়া চোখে পড়িয়াছিল। আরও বেশি চোখে পড়িয়াছিল বেড়াল-ছানাটারও রঘুর জন্য আকর্ষণ। সিপাহী এনায়েত খাঁ বার-কয় ছানাটাকে ধরিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়াও ধরিতে পারে নাই। তাই পাঠান-পৌরুষেও লাগিয়াছিল, সিপাহী মর্যাদাতেও লাগিয়াছিল। কিংবা হয়তো ইহাই এনায়েত খাঁর ভালোবাসার নিজস্ব ভাষা—একটু তাক্ করিয়া থাকিয়া ছানাটাকে কাছে দেখিতেই সে ছুঁড়িয়া মারিল ব্যাটনটা। অভ্রান্ত পাঠান-লক্ষ্য। মাথায় ডাণ্ডা লাগিতে ছানাটা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল, ছটফট করিতে লাগিল। এনায়েত খাঁ সোল্লাসে ছুটিয়া গেল—এবার ছানাটা পালাইতে পারিবে না। কিন্তু নড়িতেছে না যে আর ? পায়ের মোটা জুতা দিয়া উলটাইয়া দেখিল এনায়েত খাঁ। কয় ফোঁটা রক্ত নাক দিয়া মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে, মাটিতে পড়িয়াছে। 'বাস্—খতম্ ?' এনায়েৎ খাঁর দৃষ্টিতে একটু বিস্ময় জাগিল ; আর সঙ্গে সঙ্গে একটু কৌতুকও— 'খতম !' তার পর ব্যাটন কুড়াইয়া লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে আঙিনার অন্য দিকে চলিয়া গেল।

অমিতের খদ্দরের জামাটার নতুন বোতাম পরাইতেছিল রঘু। কি একটা কলরব উঠিয়াছে, কে ছুটিয়া আসিয়া কি বলিল,—এ রঘু শুনা ?

দুইজনে অমিতের নিকট হইতে একটু দূরে গিয়া কি বলিতে লাগিল। অমিত পড়িতেছে, বাধা পাইবে। অমিতের কানে গেল শুধু 'বিল্লী' শব্দটা ! দেখিল, রঘু কোথায় চলিয়া গেল। রঘুর কাণ্ডই এইরূপ—সামান্য একখণ্ড মাছ রাখিয়াছে তাহার জন্য অমিত ; এ চোরটা তাহাও খাইবে না। শুধু চরস আর নেশা। মাছ হোক, অন্য খাদ্য হোক, বেশি জোর করিলে তুলিয়া রাখিয়া দিবে ; খাওয়াইবে সেই বেড়াল-ছানাটাকে। সেই উদ্দেশ্যেই নিশ্চয় এখন গেল।

একটা চাপা-গলার অস্ফুট শব্দ শোনা যাইতেছে। অমিত পিছন ফিরিয়া দেখিল—রঘু কখন আসিয়া সেলাইয়ের উপর ঝুঁকিয়া বোতাম লাগাইতে বসিয়া গিয়াছে।

কখন এলি ?

এই কিছু আগে।

গেছলি কোথায় ?

রঘু মাথা নোয়াইয়া রহিল। অমিত আবার জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় গেছলি রঘু।

ডাকিল অরা—। কেমন ভাঙা যেন রঘুর গলাটা।

এবার অমিতের সন্দেহ হইল।—কি হয়েছে রঘু, বল তো!

রঘু এবার শান্ত কণ্ঠে বলিল, ছেনীকে মারি ফেলিলা—

কাকে ?—অমিত চেয়ার লইয়া সরিয়া বসিল।

নিস্পৃহ স্বাভাবিক কণ্ঠে এবার বলিল রঘু ঃ ছেনী। ও বিড়াল-বাচ্চাটা—

কাহিনীটা তখন অমিত শুনিল। বেশি বলিতে পারিল না রঘু। তখনো সে বোতাম লাগাইতেছে। আঙিনায় কয়েদিদের জটলা তখন 'স্বদেশীদের' জটলায় পরিণত হইয়াছে। সকলে বিরক্ত হইয়াছে—কী পশু এই পাঠান সিপাহীরা, হেলায়-খেলায় মারিতেই যেন উহাদের উৎসাহ! 'স্বদেশীরা' ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে।

কোনো ইংরেজ-হত্যায় ইহাদেরও মনে বিন্দুমাত্র খেদ জাগিত না। কিন্তু সেখানে হত্যা শুধু একটা প্রকাণ্ড জাতি-হত্যার প্রতিবাদ। তবু জীবহত্যা এই জাতির যেন প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অমিতও মানে—কোথায় একটা কাঁটা থাকিয়া যায় এইরূপ কাজে, নিষ্ঠুরতায়—ইহার মধ্যে একটা কাপুরুষতা আছে।

সকলের দৃষ্টিতে এনায়েত খাঁর ঔদ্ধত্য আরও অসহ ইহয়া উঠিয়াছে। প্রায় সকলেই একমত—অমিতও মানিতেছে,—'ছেনী' একটা 'কজ্', উহাকে লইয়া 'ফাইট্' করিয়া এনায়েত খাঁয়ের ঔদ্ধত্যকে খর্ব না করিলেই চলিবে না। অন্যায় সহিলে তাহা হয় ঘৃণ্যতম অন্যায়। ইহার বিরুদ্ধে বল পরীক্ষা করিতে হইবে।

কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বেই জটলা থামিয়া গেল।

বিকালের দিকে কালীকিঙ্কর বাবু আসিয়া 'অমিত বাবুর' নিকট বসিলেন—উগ্র তরুণেরা তাঁহাকে বলে, 'শ্বেত-কিঙ্কর'। সেদিনের বিপ্লবী 'দাদা' না হউন, এদিনের 'কংগ্রেসী মেজদাদা'। কিছুদিন আগে, তিনি চেষ্টা করিয়া এ 'খাতার' বন্ধুদের প্রতিনিধি হইয়াছেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁহারই সর্ব সময়ে বাক্যালাপ

করা প্রয়োজন—বন্দীদের অভাব-অভিযোগে বিরোধ মীমাংসায় তিনিই স্বীকৃত মুখপাত্র। কালীকিঙ্কর বাবু জানাইলেন—'বড় জমাদার' তাঁহাকে ধরিয়াছিল, এনায়েত খাঁ ছিল দূরে দাঁড়াইয়া। বড় জমাদার খুব আফসোস জানাইল। বেইমানির জন্য এনায়েত খাঁকে খুব তিরস্কার করিল কালীকিঙ্কর বাবুর সম্মুখে। 'যা-তা ওদের হিন্দুস্থানী ভাষা—জানেনই তো'। এবং পরে কালী বাবুর কাছে বাবুদের উদ্দেশ্য এনায়েতকে দিয়া 'মাফি মাঙ্গাইল'। অতএব—

কি করা যায় বলুন তো?—জিজ্ঞাসা করিলেন কালীকিঙ্কর বাবু।

কি আর করা যাবে?—অমিত বুঝিতে পারে না। বেড়াল-ছানাটা তো আর বাঁচিয়া উঠিবে না। সিপাহীদের সহিত সংঘর্ষ সে কামনা করে না। তাহা বাধিলে জেল কর্তৃপক্ষই উৎফুল্ল হইবেন—লাঠি-গুলির সুযোগ মিলিবে, সিপাহীরা স্বেচ্ছায় কর্তাদের হাতিয়ার হইয়া উঠিবে।

কালীকিঙ্কর বুঝিয়াই বলিলেন, আমিও তাই ভাবছি। চুকে যাক তবে। বড় জমাদার-ব্যাটাও একটু হাতে রইল। তাতে ট্যাক্‌টিকালি একটা 'অ্যাডভাণ্টেজ' আমরা পাব। যে পাজী লোক সে ব্যাটা—জেলটারই মালিক আসলে এই ফতে মহম্মদ। না, না, তাকে কোনো কথা আমি দিইনি। তাকে বলেছি, 'আচ্ছা ওয়ার্ডে গিয়ে দেখি।' আপনার সঙ্গেই তাই প্রথম কথা বলছি। আপনিই বুঝবেন কথাটা—নইলে আমি কিছু বললেই ফ্যাকড়া তুলে দেবে হয়তো লক্ষ্মী ঘোষের ওই ছেলেগুলো। জানেনই তো, সেই কংগ্রেসের মারামারিতে ওরা আমার বিপক্ষে ছিল। এখানেও রিপ্রেজেনটেটিভ যেন আমি না হতে পারি, সে জন্যও কী কাণ্ডটা করেছে দেখেছেন তো! ঝগড়া-ঝাটি করবে জেলের অফিসারদের সঙ্গে কথায় কথায়। আমি বলি, 'বাপু, একটু ট্যাকটিকালি চলতে হয়। ওরাও তো দেশের মানুষ—হোক জেল-অফিসার।' এই তো আপনার ইণ্টারভিয়্যুর ব্যবস্থা ঠিক করে এলাম এস্-বি-র নবকান্তকে বলে। অমিত চমকিত হইল, প্রতিবাদ করিল, তাকে বলতে গেলেন কেন? কালীকিঙ্করও বলিলেন, বলতে গিয়েছি নাকি? তার সঙ্গে দেখা হল আপিসে; অমনি দিলাম শুনিয়ে। হাঁ, কড়া কথাই বলেছি। হয়ে যাবে দেখবেন দু-এক দিনের মধ্যেই ইণ্টারভিয়্যু—

অমিত তবু একবার বলে, না, না, সে যখন এখানে আছি, হবেই। সে জন্ম আপনার ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই।—মনে মনে যথেষ্ট উদগ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল অমিত ইণ্টারভিয়্যু শব্দটা শুনিবা মাত্র। অনেক আশা আর অনেক নিরাশা একসঙ্গে দোলা দিতেছিল বুকের মধ্যে। কিন্তু তবু যথাসম্ভব শিষ্টাচার ও অনুদ্বেগের সঙ্গেই মুখে বলিল,—প্রয়োজন নেই।

কালীকিঙ্কর বুদ্ধিমান। বলিলেন, প্রয়োজন কেন, এ তো আপনার অধিকার। কেন দেবে না ইণ্টারভিয়্যু! হাঁ, তবে কি না—আদায় করতে জানতে হয়। বাড়ির লোকেরা আমার সঙ্গেও ইণ্টারভিয়্যু পায় পনেরো দিনে একবার! আমরা মধ্য-কলকাতার লোক। জানেন তো, পাড়াটায় আমাদের পরিবারের খ্যাতিও আছে; তাই থানার লোকেরাও খ্যাতির না করে পারে না। কিন্তু আদায় করতেও জানতে হয়। কারণ, এ তো বাইরে নয়—

কালীকিঙ্কর বাবু মিষ্টভাষীও। সত্যই মধ্য-কলকাতার মধ্য-শ্রেণীদের মধ্যে তাঁহাদের মর্যাদা আছে। ইহাও অমিত দেখিয়াছে—তিনি আদায় করিতে জানেন। হয়তো এই গুণ তাঁহার স্বভাবগত, হয়তো বা পরিবারগত। কারণ, সত্যই ভদ্র-পরিবারের শিষ্ট মানুষরূপে অনেক উগ্র বিরোধিতার মধ্যেও তিনি মিষ্টভাষিতা বজায় রাখিতে পারেন। কালীকিঙ্কর বুদ্ধিমান লোক, আর এই বুদ্ধি দুই-এক পুরুষের বিষয়-বুদ্ধিরই বর্তমান রূপ—দুই-এক পুরুষের সেই অনর্জিত বাড়ি-ভাড়ার ও পরিশ্রম-বিমুখ জীবন-যাত্রার ছাপ যেমন আছে তাঁহার পরিচ্ছন্ন পোশাকে, তাঁহার মাজা-ঘষা কালো রঙে, সুন্দর নাকে, চোখে, পাট-করা চুলে, অনুগ্র কথাবার্তায়। আদায় করিতে তাঁহারা জানিতেন; আদায় তিনিও করিবেন। তিনিও তাহা করিতে পারিবেন—কংগ্রেসের মধ্য হইতে আদায় করিতে পারিবেন—'স্বদেশীর' মধ্য হইতেও আদায় করিতে পারিবেন। এই তো এখানে দশ-জনকে বলিয়া কহিয়া নিজের জন্য প্রতিনিধির পদ আদায় করিলেন। আবার ইহার পরে বাড়িভাড়া, কোম্পানির কাগজ, 'স্বদেশী' ও কংগ্রেসী পাণ্ডাগিরি, সব মিলাইয়া মুক্ত রাজবন্দী কালীকিঙ্কর সরকার আদায় করিতে পারিবেন—কী? কী আদায় করিবেন? কর্পোরেশনের কাউনসিলরি, অ্যাসেম্‌বলির সদস্য-পদ। হয়তো বা সেই সোপানে সোপানে

উঠিয়া যাইবেন আরও ঊর্ধ্বে, আরও ঊর্ধ্বে। কিন্তু আদায় করিতে তিনি পারিবেন—আদায় করিতে তাঁহারা জানেন। 'আদায় করিতে জানা চাই'—ইহাই আসল কথা।

এ যে জেলখানা, কি বলেন ?—বলিলেন কালীকিঙ্কর বাবু।

তাতে সন্দেহ কি ?—অমিত বলিল।

একটু সন্তুষ্ট হইয়া কালীকিঙ্কর বাবু ঘুরিয়া ঠিক প্রসঙ্গে আসিলেন, তা হলে চুকে যাক এ বেড়ালের ব্যাপারটা—'ক্যাট মার্ডার কেস।'—হাসিলেন এইবার কালীকিঙ্কর বাবু।—আর বলতে কি মশায়, ন্যুইসেন্‌স্ এই বেড়ালগুলো। কুকুর হলে কথা ছিল—ভালো কুকুর চমৎকার। কিন্তু বেড়ালগুলো যত ব্যারাম-পীড়া নিয়ে আসে। তা ছাড়া, বড় জমাদার বললে, 'বেড়াল গবর্নমেণ্ট পালে গুদামের জন্য। কিন্তু কয়েদীদের বেড়াল পালা নিষেধ। পাললে তাদের সাজা হয়। বড় সাহেব রঘুটাকে তাহলে শাস্তি দেবে',—'ছোবড়ায়' পাঠিয়ে দেবে আর কি ? তা হবে কেন ? বলেন কি ? এ ব্যাপারটা কম নয়। কয়েদিরা ওই বেড়ালের গলায় বিড়ি, তামাকপাতা, চিঠি, ম্যায় নোট পর্যন্ত বেঁধে রাত্তিরে পাঠিয়ে দেয় এক ওয়ার্ড থেকে আর-এক ওয়ার্ডে। 'ক্যারিয়র পায়রা পিজিয়ন' আর কি। আরও অনেক কাণ্ড মশায়, এটা বি-ক্লাস জেল তো। কাজেই ওই বেড়াল নিয়ে হৈ-চৈ করে আমাদের লাভ নেই। বরং বড় জমাদারের অ্যাপোলজি আর এই রিকোয়েস্টটা রাখি, হাতে থাকবে সেই পাকা বদমায়েশটা। তা হলে কত কাজ হবে। গুড্ ট্যাক্‌টিক্‌স্, কি বলেন ? ঠিক না।

তাই তো মনে হয়।

অন্যদেরও তাহাই মনে হইল। কারণ, অনেকেই ততক্ষণ তাস ও পাশা খেলিতে খেলিতে কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিল। ভালো করিয়া ভাবিতেও পারে নাই।

বিকালের দিকে মিহির বাবু অমিতকে বলিলেন, রঘুটা কাঁদছে ছেনীটার জন্য। তাই তো!—অমিতের মনে পড়িল,—রঘু সেই দ্বিপ্রহরের পর হইতে পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইয়াছে। অমিতের চা ও খাবার দিয়াছে, কাজ সবই

করিয়াছে; কিন্তু অমিতের সামনে আর বেশি আসে নাই। ব্যাটার কষ্ট হইয়াছে। ছেনীটাকে ভালোবাসিত রঘু। আর সত্যই ছেনীটা দেখিতে বেশ ছিল। অমিত কোনো দিন বেড়াল ভালোবাসে না। তাহার কেমন একটা বিরাগও আছে এ সব নোংরা-ঘাঁটা জীবের উপর। কিন্তু রঘু ছেনীটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিত, খাওয়াইত-পরাইত সযত্নে। দেখিতে ভালোই লাগিত—বিশেষত যখন আদর করিয়া রঘুর পা ঘেঁষিয়া নিজের গাত্রমার্জনা করিত ছেনী।

সন্ধ্যার একটু আগে অমিত কি কাজে রঘুকে খুঁজিতে গিয়া পায় না। আবিষ্কার করিল ব্যারাকের কোণে চটের আড়ালে একা রঘু বসিয়া আছে। দেয়ালে ঠেস দিয়া হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া।

এখানে যে রে?—

যাই, বাবু?—এ কি, গলাটা এখনো ধরা-ধরা রঘুর!

সে কি রে, কাঁদছিলি না কি?

না, বাবু।—চোখটা মুছিয়া ফেলিয়া বরাবরের মত লজ্জায় হাসিল রঘু। তারপর তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল কাজে।

এক মিনিটের জন্য অমিতের সেদিন অদ্ভুত মনে হইয়াছিল পৃথিবীটা। যে রঘু বাড়ির খোঁজ রাখে না, স্ত্রীর বিষয়ে যার কৌতূহল নাই, স্ত্রী আজ যুবতী না বালিকা, ইহাও সম্ভবত পুলকিত চিত্তে ভাবে নাই যে জীবনে,—ভাবে না বাপ-মায়ের কথা, ভাইদের কথা—নিস্পৃহ, অনুত্তেজিত সেই রঘু গোপনে গোপনে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে জেলে-পালিত একটা বেড়াল-ছানার জন্য! মানুষের জন্য যে কাঁদে নাই, কাঁদিবে না—চোরের জীবনকে মানিয়া লইয়া যে মানিয়াই লইয়াছে মানুষের সমাজে সে অবান্তর, হয়তো বা বিড়ম্বনা,—সেও কি তবে সেই মানুষের প্রাণ, মানুষের পিপাসাকে এমনি করিয়াই বুকে বহিয়া বেড়ায়—এই অদ্ভুত মানব-মমতা? হয়তো জানেও না তাহার স্বরূপ?…না, জানে তাহা কী?

রাত্রিতেও নাকি রঘু কাঁদিয়াছিল অনেকক্ষণ—তাহার সঙ্গীরা বলিয়াছে। পরদিন আবার নিয়মিত গতিতে নিয়মিত হাস্যে সে অমিতের কাজ করিতে

লাগিয়া গিয়াছে। চা আনিয়াছে, সোরাই ভরিয়াছে, ঘর পরিচ্ছন্ন করিয়াছে —কোথা দিয়া দিন চলিয়া গিয়াছে। আবার অমিত দিন-দুই পরে যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছে: এবার বাইরে গিয়ে কি করবি রঘু?

রঘু আগেকার মত আস্তে আস্তে জানাইয়াছে: কি আর করব বাবু। ওই করব।

'ওই'টা কি? চুরি? অ্যাঁ।

হাঁ, বাবু।

কোথায়?

রঘু তাহার প্ল্যান জানায়। শিবপুরে যেখানে তাহার দাদা-বউদিদি থাকে, সে বাড়িতে তাহাদেরই দেশের তাহার মাসি-মায়ের ভাইও থাকে। সে রুপার কাজ করে। সম্পর্কে কিন্তু খুবই আত্মীয় তাহাদের। বলরামের ঘরে বেশী কিছু নাই। কিন্তু দোকানটায় বেশ কিছু পাওয়া যাইতে পারে। প্রায় তিন-চার শত টাকা।

খানিকক্ষণ শুনিয়া অমিত বলিল, কিন্তু সে না তোর আত্মীয়?

হাঁ।

তার বাড়িতে চুরি করবি?

হাস্যনতমুখে রঘু বলে, চোরের-অ সে সব-অ কিছি নাই, বাবু।

আর-একবার কেমন নতুন লাগিল পৃথিবীটা। চোরের আত্মীয়-অনাত্মীয় নাই। তাই অমিতের কোনো বন্ধুর ঠিকানা এ জেলের কাহাকেও দিতে রঘু নিষেধ করিয়াছে—চোরের কিছুই বিশ্বাস নাই। এমন এখানে ঘটিয়াছে, এই সেইদিনও ঘটিয়াছে। মুক্তি পাইয়া কোন কয়েদি বাবুদের বাড়ি হইতে ধাপ্পা দিয়া টাকা লইয়া আসিয়াছে—'বাবুর ভয়ানক দরকার, টাকার জন্য আমাকে পাঠালেন।' দরকার পড়িলে চোরেরা সবকিছু করিতে পারে; করে। সেখানে তাহাদের আত্মীয়-অনাত্মীয় নাই, বন্ধুও নাই; পরম বৈদান্তিক তাহারা। কিন্তু রঘু দশ টাকার দশখানা নোট মারিয়া দিয়া কেন তবে নরেন্দ্র মিত্রর মত একটা অভিনয়ও করে না? অমিত তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

আপনার-অ টঙ্কা, বাবু! ও হবে না।

ভয়ানক লজ্জা পায় রঘু এই সব কথা বলিলে। অমিত পরে শুনিয়াছে—রঘু সেবার মিথ্যা প্ল্যান দেয় নাই। প্ল্যানমতই চুরি করিয়াছে এবং ধরাও পড়িয়াছে। আবার জেলে আসিয়াছে;—কিন্তু অমিত তখন এখানে নাই।

এক মাস পরে অমিতের হঠাৎ অন্যত্র যাইবার নির্দেশ আসিয়াছিল। আবার স্থানচ্যুতি। কোথায়? সম্ভবত 'তরাই'র পাহাড়ে আর জঙ্গলে। রঘু জিনিস-পত্র গুছাইয়া দিতে লাগিল—মাজিয়া মুছিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া আনিল কাপ, ডিশ, জুতা, ছাতা।

এ কি? এ ডিশ তো আমার নয়, রঘু।

আপনার-অ পেলেট বাবু।

আরে না, না, দেখছিস না এ নতুন ডিশ!

না, এ আপনকার।

রঘুকে বুঝানো যায় না। কাহার সহিত বদল করিয়া কাহার নতুন ডিশ সে অমিতের বলিয়া লইয়া আসিয়াছে।—যা নিয়ে যা; আর খুঁজে নিয়ে আয় গে আমার ডিশ দুখানা।

রঘু ডিশ তুলিয়া লইল। একটু পরে অমিত দেখিল রঘু তখনো দাঁড়াইয়া আছে।—কি রে, গেলি না?

রঘু ধীরে ধীরে বলিল,—ও ব্যারাক থেকে এনেছিলাম, বাবু, এ নতুন ডিশ। আপনি যাচ্ছেন, নিয়ে নিন।

অবাক হইয়া অমিত তাকাইয়া রহিল এক মুহূর্ত। তারপর হাসিয়া ফেলিল, বলিল, ব্যাটা বজ্জাত! যা, যা, নিয়ে আয় গে আমার ডিশ। আবার চুরি করগে সেই পুরনো ডিশ—যা।

মনে মনে হাসিতে লাগিল অমিত। কিছুতেই চুরির অভ্যাস নষ্ট করিবে না। চোর-অকে বিশ্বাস নাই, সত্যই।

রঘুর তখনো দুই মাস জেল বাকি ছিল, অমিত চলিয়া গেল! রঘু অন্য দশ-জনের কাজ তখন করিয়াছে। মিহিরবাবু ছিলেন, অন্যেরাও ছিল। তার

পর হঠাৎ একদিন কেমন করিয়া—কোনো কিছু নাই, রঘুর তল্লাসী হইল। রঘু তখন জমাদারের হাতে ধরা পড়িয়া গেল, বাবুদের দুইখানা দশটাকার নোট সমেত। কালীকিঙ্কর বাবু তখনো প্রতিনিধি। কিন্তু রঘুকে তখন উদ্ধার না করাটাই তিনি গুড্ ট্যাকটিক্স্ বলিয়া স্থির করিলেন। কারণ, এমনিতে রঘুর নিকট হইতে বন্দীদের কাহার নাম বাহির হয়, কে জানে? বাহির হইলে সেই বন্দীর পক্ষে শাস্তিলাভও সুনিশ্চিত। তাই সেই যে নোট-সুদ্ধ ধরা পড়িয়া রঘু তখনি 'চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে' বন্ধ হইল, সেই সূত্রে তাহার অর্জিত 'রেমিট' খোয়াইল, জমাদার-সিপাহীর মারে-মারে অজ্ঞান হইয়া রহিল,—ডাণ্ডা-বেড়ি তাহার পায়ে পড়িল, স্টাণ্ডিং হ্যাণ্ডকাপ হাতে উঠিল—তাহার পর চলিয়া গেল ঘানি-ঘরে, ছোবড়ায়; কিন্তু তাহার মুখ হইতে কোনো দিন কাহারও নাম বাহির হইল না!…তার পরে রঘু জেলে আবার আসিয়াছে, কিন্তু তিন বৎসর পর্যন্ত তাহাকে আর জমাদার কিছুতেই স্বদেশী খাতার কাজ করিতে দেয় নাই। রঘু তখন ঘানি টানিয়াছে, দড়ি পাকাইয়াছে, কারখানায় খাটিয়াছে—কখনো বিড়ি পাইয়াছে, কখনো পায় নাই—সে জানে 'ইহাই নিয়ম'; চোরের জীবন এইরূপই।

মাস চার পরে যখন আবার অমিত এক সপ্তাহের জন্য এখানে আসিয়াছে, নির্বাসনের পার-ঘাট হিসাবে এখানে অপেক্ষা করিয়াছে, রঘু তখন স্বদেশী 'খাতায়' নাই। দ্বিপ্রহরে এ 'খাতার' হাওদার কাজে রাজমিস্ত্রিদের বিলাতী মাটি ও চুনা পৌঁছাইয়া দিতে কিছু কয়েদি আসিয়াছিল, অমিত তাহা জানিত না। আবদুল্লা 'মেট' হঠাৎ ডাকিল,—বাবু।

অমিত চাহিয়া দেখিল—আবদুল্লা, সঙ্গে—রঘু না? মাথায় ও মুখে-চোখে চুনা ও বিলাতী মাটির গুঁড়া; সেই জন্যই চেনা শক্ত। না হইলে সেই শ্রীহীন মুখের উপর হাস্যকর নাক! রঘুকে চিনিতে কোনো কষ্ট নাই।

দুমিনিটের জন্য ফাঁকি দিয়া রঘু অমিতের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। পাহারার সিপাহী গল্প করিতেছে। বাঙালী সিপাহী তত হারামী নয়,—অমিতকে আবদুল্লা জানাইল।

অমিত খুশী হইল। রঘুকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল—কি করিয়া

নোটশুদ্ধ সে সেবার ধরা পড়িয়াছিল। রঘু বলিতে পারে না। কেষ্ট পাহারার তাহার উপর রাগ ছিল। সবটাতেই সকলের তামাক-পাতায় নিজের বখরা না পাইলে কেষ্ট অমন করিয়া কয়েদিদের ধরাইয়া দিত। উলটা—'ফালতুদের' ও কয়েদিদের বলিত, বাবুদেরই এই কাজ।—না, সে কিছুতেই হয় না; বাবুরা একাজ করিবে না; তাহা আবদুল্লাও জানে।

বিড়ি খা—রঘুকে গুটি কয় বিড়ি দিল অমিত। সলজ্জ কৃতজ্ঞ হস্ত এবার রঘু গুটাইয়া রাখিতে পারিল না, বাড়াইয়া দিল। অনেক তৃষ্ণায় এইটুকু লজ্জাবর্জন এখন সম্ভব হইয়াছে।

অমিত বলিল, নে, এখানেই ধরা একটা। সিপাহী ভয়েও আসবে না আমার এখানে।

কিন্তু না, অতটা হয় না। কিছুতেই তাহা হইবে না। আবদুল্লা মেট বলিল: ও কোণে চল তবে, চটের আড়ালে।

দুইজনে ব্যারাকের কোণে আশ্রয় লইল। চটের আড়ালে যে তীব্র গন্ধটা খানিক পরে উঠিল তাহা শুধু বিড়ির নয়, চরসেরও। আবদুল্লা মেটও রঘুকে ওই রসে ওস্তাদ না মানিয়া পারে না। অমিতের আবার হাসি পাইল।

তাহার পর দীর্ঘ দিন চলিয়া গিয়াছে। কোথা দিয়া বৎসর গেল। বৎসরের পর বৎসর কাটিল। সাতদিন পূর্বে যখন জামা খুলিয়া আবার অমিত এখানে সবে বসিয়াছে—দীর্ঘ পথের ঘাম ও ধূলায় তখনো দেহ ঢাকা.—চমকিয়া দেখিল হোল্ড-অলের স্ট্র্যাপ খুলিতে লাগিয়া গিয়াছে আবার রঘু!—সেই রঘু, সেই 'সাত খাতা'—এত বৎসরেরও কিছুই পরিবর্তন হয় নাই ইহাদের। দড়ির মত পাকানো শরীর আরও পাকিয়াছে—ঘানি-ঘরে আর ছোবড়ায়। সেই বাঁক-ধরা কোমর আর একটু বাঁকিয়া আসিতেছে। আর সেই লাফাইয়া-উঠা নাসিকাগ্র তেমনি হাস্যকর উৎসাহে লাফাইয়া উঠিয়াছে—সেই রঘু! আর আসিতেছে তেমনি চা, তেমনি টোস্ট, তেমনি নিয়মিত পানীয়, আহার্য। আছে রঘুর তেমনি কুণ্ঠিত, সলজ্জ স্বল্পভাষিতা, আর অনুচ্চ-প্রচারিত ভালোবাসা অমিতের জন্য।

অমিতকে ভালোবাসে নাকি রঘুও? অমিত সকৌতুকে ভাবে। ব্রজেন্দ্র

রায়, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় নয় শুধু, রঘুচোরও ভালোবাসে অমিতকে। তাই বলিয়া অমিতকে জানে না কি রঘু? জানে সে অমিতকে?—সহস্র সহস্র আলোকবর্ষের ব্যবধান যাহাদের জগতের—অমিতের আর রঘুর।

কিন্তু,—অমিত আবার ভাবে,—সত্য সত্য এতই কি বড এই ব্যবধান?

হঠাৎ চায়ের আঘ্রাণ ও টোস্টের স্বাদে যেন অমিতের মনের তীব্রতা একটা কোমল জিজ্ঞাসায় পরিণত হইল—এতই কি বড় এ ব্যবধান? রঘুকে তো অমিত অত দূরের মানুষ বলিয়া অনুভব করে নাই। ইহার অপেক্ষা অনেক, অনেক দূরের মনে হইয়াছে তাহার দিবা-রাত্রির প্রতিবেশী অনেক 'স্বদেশী' বন্ধুকে। কিন্তু রঘুকে তেমন দূর মনে হয় না—মনে হইবার পথ রাখে নাই রঘুই। সে অমিতের দেহকে চিনিয়াছে, অসহায় মুহূর্তে আপনার হাতে তুলিয়া লইয়াছে উহাকে। সে অমিতের মনকে লইয়া নাড়া-চাড়া করে নাই; —খেলিতে পারে নাই, আঘাতও দিতে পারে নাই, দোলা দিতেও শিখে নাই। হয়তো সে মনকে স্পর্শ করিবারও আকাঙ্ক্ষা রাখে নাই। নিস্পৃহ, নিশ্চেষ্ট, সলজ্জ আত্মগোপনশীল এই রঘু ওড়িয়া! তবু—আজ অমিত বুঝিতেছে—অমিতের মনের মধ্যে সে একটি স্থান করিয়া লইয়াছে—যে স্থান মানুষের। মানুষের মধ্যেকার দেবতার নয়, মানুষের মধ্যেকার দানবেরও নয়, শুধুই মানুষের। চোরের, নেশাখোরের, দাগী কয়েদীর; কিন্তু তবু মানুষের। এই মানুষকেই অমিত দেখিয়াছে—দেবতাকে নয়, দানবকে নয়,—মানুষকে। এই তো তাহার নবাবিষ্কার—এই বন্দিশালার বিশ্ববিদ্যালয়ে।·· এই মানুষকে দেখিয়া দেখিয়া কি শেষ করিতে পারা যায় অমিত? রঘুও তো একটা অশেষ রহস্য, একটা আশ্চর্য কৌতুক—এই চিড়-খাওয়া পৃথিবীর বিকলাঙ্গ এক রহস্যময় কৌতুক।··

কৌতুকে পাইয়া বসিতেছে অমিতকে। সে ডাকিল,—রঘু!

রঘু সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অমিত স্মিতহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, বল তো জেল থেকে ছাড়া পেলে তুই কি করতিস?

প্রশ্ন পুরাতন, রঘু তাহা জানে। তাই একটু সলজ্জ মুখে পুরাতন উত্তরই দিল,—অবশ্য বার বার অমিত পীড়াপীড়ি করিবার পর,—নেশা করিব, চুরি করিব।

অমিত আর-একটু জমিয়া বসিল। বলিল, বেশ। কিন্তু জানিস এবার গবর্নমেণ্ট আমাদের ছেড়ে দিচ্ছে। তা হলে জেলে থেকে বেরিয়ে কি করব আমি, বল? বলছিস না যে কিছু।—আমিও 'নেশা করিব, চুরি করিব?'

রঘু লজ্জায় মরিয়া গেল। অমিত বলিল, কেন, আপত্তি কি?

অনেক প্রশ্নের পরে রঘু জানাইল: আপুনি 'স্বদেশী বাবু'।

তাতে কি?

রঘু বলিতে জানে না। গুছাইয়া বলিতে পারে না। প্রশ্ন করিয়া করিয়া অমিত জানিল: গান্ধীজীরা মন্ত্রী হইছেন, আপুনিরা বড় লোক। ভারী চাকুরি হইবেক। মোটা মাহিয়ানা পাইবেন, ভালো থাকিবেন।

এত বৎসর 'স্বদেশী' বাবুদের নিকট-সাহচর্যে রঘু ইহাই বুঝিয়াছে—জানিয়াছে এইরূপ সুখ-সুবিধাই তাহাদের লক্ষ্য। অমিতের মুখের হাসি মিলাইয়া যাইতেছে। কিন্তু মিলাইয়া গেলে চলিবে না—রঘু তাহাতে সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে। তাহার অপরাধ কি? সে শুনিয়াছে গান্ধীজীর লোকেরা মন্ত্রী হইতেছেন; বাবুরা বাহির হইয়া গেলে মেম্বর হন, কর্পোরেশনে চাকরি পান, আরও অনেক পুরস্কারই তাহাদের লাভ হয়।···বড় মানুষ, বড় চাকরি, বড় মাহিয়ানা—অমিতের প্রসন্ন হাস্যের মধ্যে যেন বক্রহাস্যের রেখা দেখা দিল।

রঘুকে সে বলিল: তার মানে 'স্বদেশীয়' নেশা, 'স্বদেশীয়' চুরি,—এই করাই ঠিক, তা-ই না?

রঘু কথাটা বুঝিতে পারে না—কী কথার কী অর্থ করিতেছে অমিত। বলে,—না, না বাবু।

আবার অমিত তাহাকে লইয়া পড়ে: 'না' নয় তো তবে কী।

অনেকক্ষণ পরে রঘু বলে, আপুনি লেখাপড়া করিবান, ভালো করিবান।

'লেখাপড়া করিবে' 'ভালো করিবে'—দুইই সে করিতে চায়। কিন্তু দুইটা কেন, একটাও কি সে করিতে পারে? অমিতের ভাবনা সরাইয়া অমিতের কৌতূহল আবার জাগিয়া উঠে।—'ভালো করিব'। কার ভালো করব রে? চোরের? না, নিজের? না, কার?

রঘু আবার বিপন্ন বোধ করে। শেষে অনেক ভাবিয়া বলে,—মনুষ্যর।

'মনুষ্যর'!—একবার চমকিয়া উঠে অমিত আপনার মনে।···মনুষ্যর ভালো করিবে তুমি, অমিত? মানুষের তুমি ভালো করিবে; মানুষকে ভালোবাসো তুমি, অমিত? কিন্তু কোন মানুষকে? বড় মানুষকে, না, গরিব মানুষকে? শিক্ষিত তোমার স্বজনকে, না শিক্ষাবঞ্চিত তোমার অগণিত সহোদরদের?···

অমিত হাত দিয়া চোখের সম্মুখ হইতে কী যেন সরাইয়া দিল। রঘুকে বলিল, কিন্তু তাতে তোর কী হবে? চোরের সুবিধা হবে? তুই আর চুরি করবি না?

রঘু হাসিয়া ফেলিল—কথাটাকে সে আমোলই দিবে না। অমিতবাবুর স্বভাবই এই রকম হাসি-তামাসা করা। অমিত ছাড়ে না, শেষে রঘু আবার বলিল, চোর-অ আছি, চুরি করিব।

'চোর-অ-আছি—চুরি করিব,' অনেকক্ষণ শুনিয়াছিল সেবার অমিতের কথা তেজা সিং। পশ্চিম ইউ-পী'র দুর্ধর্ষ মানুষ সে। ডাকাতদের সর্দার অথচ অমিতদের নিকট ভদ্র, অমায়িক প্রকৃতি। জেলের কয়েদিরাও কয়েদি তেজা সিংকে সেলাম দেয়—অনমনীয় মানুষ সে। পাঁচ বৎসর আগে অমিতের মুখে অনেকক্ষণ সে শুনিয়াছিল অমিতদের পরিকল্পিত কাহিনী, ভাবীকালের স্বাধীন দেশের জীবন-যাত্রার কথা।

'চুরি ডাকাতি আর কেন থাকবে, তেজা সিং ?' ইহা শুনিয়া একটু বিস্ময়ের সহিত হাসিয়া একবার প্রশ্নমাত্র করিয়াছিল তেজা সিং,—'কেয়া বাবু, ডাকাতি ছোড়নে কা চিজ হ্যায় ?'

আরও এক বৎসর পরে : ভালো রাঁধিত বাঙালী কয়েদি নিধিরাম। বসিয়া বসিয়া গল্প করিত। বাদার গল্প, লাটের গল্প, সুন্দরবনের কথা। অনেকক্ষণ সে অমিতদের পরিকল্পিত সমাজের কথা শুনিল—যেখানে মানুষ কাজ করিবে, খাইবে, পরিবে—অভাবের জালায় মানুষ অমানুষ হইয়া পড়িবে না। তারপর সবিনয়ে নিধিরাম তাহার কথা জানাইল,—চুরি উঠে যাবে, বাবু? সে কি হয়; সে হয় না। তবে আপনারা রাজা হলে আমাদের চোরদের বড় কষ্ট হবে।...

রঘুও বলিল, 'চোর-অ আছি, চুরি করিব।' সেই পুরাতন কথা—Why Hal, 'tis my vocation, Hal, 'tis no sin for a thief to labour in his vocation.

অমিতেরও পুরাতন উত্তর মনে পড়িল। সহাস্যে অমিত সেবার রঘু ও গফুরকে বলিয়াছিল : চুরি করবি ?—ভেবেছিস তোদের জেলে দোব আমরা ? তা নয়। জেলগুলোতে বাড়ি তৈরী করাব। বাড়ি থেকে বৌ, ছেলে, মা, বাপ এনে রাখব তোদের কাছে এখানে। তোরা বেরুতে পারবি না, তাঁরা ইচ্ছামত বেরুবেন, কাজকর্ম করবেন আর তোদের পাহারা দেবেন।

শুনিয়া বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল গফুর ও রঘু। সে যে ভয়ানক বিপদ হইবে গফুরের। এবার অবশ্য তাহার জেলের নাম গফুর। কিন্তু মুঙ্গের হইতে গয়াপ্রসাদ দোসাদের স্ত্রী লখিয়া যদি আসিয়া হাজির হয় ! সহজ মেয়ে নয় সেই লখিয়া দোসাদনী। কিংবা হাওড়া হইতে গঙ্গারামের স্ত্রী মনসুখিয়া যদি আসিয়া বসে এই জেলের মধ্যে—গফুর তো তাহারই আদমি ! সশব্দে ডাণ্ডা-বেড়ি বাজাইয়া এখানে চলা-ফেরা করে গফুর—দৃক্‌পাত নাই জেলের শাসনে; সব সহিতে পারে যেমন রঘু উড়িয়া। কিন্তু অমিতের এমন অদ্ভুত প্রস্তাবে সেই গফুরের মন মুষড়িয়া যায়। সে কি লজ্জা, সে কি অপমান ! চোরের স্ত্রী, চোরের ছেলে, চোরের মেয়ে,—বড় শরম উহাদের; চোরের মা-বাপেরও।

তাহাদের নিকট হইতে দূরে না থাকিলে গফুরের রক্ষা আছে? রঘুরই কি পথ আছে? সর্বাপেক্ষা কঠিন দণ্ড তো হইবে ইহাই। পুত্র-পরিবারের সেই বন্ধন যে বড় বিষম বন্ধন। তাহাতে যে অসম্ভব হইয়া উঠিতে চাহিত রঘুর পক্ষে চুরি ও নেশা, গফুরের পক্ষে তালাতোড়ি ও রাহাজানি।

গফুর হাসিতে চেষ্টা করিয়াছিল, বলিয়াছিল, আপনার সব অদ্ভুত কথা বাবু, বাড়ির মানুষকে জেলে আনবেন।—কিন্তু গফুরের চোখে রীতিমত ভয়।

অমিত রঘুকে আজও বলিল: মনে আছে তো কি শাস্তি দোব আমরা চোরদের?

রঘু মুখ নিচু করিয়া হাসে। এখন আর সে বিশ্বাস করে না—ইহা সম্ভব।

অমিত বলিল: ওই চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে—এক-এক ঘরে, এক-এক জন, আর তার পরিবার।··

কিন্তু এই চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে ছিলেন অরবিন্দ—এখানেই তিনি দেখেন নারায়ণ।···এই চুয়াল্লিশ ডিগ্রিতে অমিতরাও ছিল, কিছুই দেখে নাই। আবার রঘুরা সেখানে দেখিয়াছে রাত্রিতে 'স্বদেশী ভূত'—যাঁহাদের ফাঁসি হইয়াছে, সে ডিগ্রীর কোণের কুঠ্রিতে যাহারা থাকিত।···মাথা ঢাকা, গলায় শাদা মালা, শাদা ধবধবে পোশাক-পরা সেই স্বদেশী বাবুরা পদচারণা করেন এই প্রাচীরের উপর, এই অতি সংকীর্ণ প্রাঙ্গণে। সাহেব ওয়ার্ডাররাও তাঁহাদের দেখিয়াছে। ভয়ে সেই কোণটায় প্রহরীরাও রাত্রিতে যাইতে চাহে না।—কে পথরোধ করিবে অমন মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষের?···পথরোধ করিবে কে এই জীবন্ত 'স্বদেশীদের'? পরিবার পরিজন? না, না। অমিত জানে—তাহাদের পথরোধ করিবে, বড় মানুষ, বড় চাকরি, বড় মাহিয়ানা। মানুষের ভালো করিবে কিরূপে তুমি, অমিত?

সংবাদপত্র আসিয়া গেল, রঘু পলাইতে পারিয়া বাঁচিল। অমিত তাড়াতাড়ি কাগজ খুলিয়া বসিল···মাদরিদ এখনো স্পেনের প্রজাতন্ত্রীরা রক্ষা করিতেছে। 'ইণ্টারন্যাশনাল বিগ্রেড'···'মানুষের ভালো' করিতেছে কি তাহারা? ধর্মপ্রাণ ক্যাথোলিক চার্চ, স্পেনের অভিজাত সামন্ত-গোষ্ঠী, কর্মকুণ্ঠ দর্পিত সেনাপতি-চক্র

কি তাহা মানিবে ? মানিবে কি হিটলার-মুসোলিনি ? কিংবা ব্রিটেনের অভিজাত ক্লাইভডেন-সেট্ ? ফ্রান্সের 'দুই শত পরিবার' ?···মানুষের ভালো কিরূপে তবে করিবে তুমি, অমিত ? রক্তের সঙ্গে রক্ত ঢালিয়া এ যুগের যৌবন 'ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেড-এ' কি তাহারই ইঙ্গিত স্পেনে লিখিতেছে ?···'দি ইণ্টারন্যাশনাল ইউনাইটস্ দি হিউম্যান রেস্' বলিয়াছিল সুনীল দত্ত···সত্য কি তাহা ? না, সুনীলের উন্মাদনা ? পতঙ্গের অগ্নিতে আত্মাহুতির মোহ ? অথবা অমিতের বিচারবুদ্ধির প্রতি সুনীলের ধিক্কার ? থাক সুনীল, থাক স্পেন। অমিত ভারতবর্ষের সংবাদই পড়িবে প্রথম। সে ভারতবর্ষের মানুষ, হাঁ, সে ভারতবর্ষের মানুষ। কখনো সে অস্বীকার করিতে পারিবে না—তাহার কৈশোরের মন্ত্র: "আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই।···মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' · কিন্তু স্বীকার করিবে না কি অমিত তাহার জীবনের শিক্ষা - ধনী ভারতবাসী, শোষক ভারতবাসী,···'বড় চাকরি, বড় মাহিয়ানার' ভারতবাসী তাহার ভাই নয়, কেহ নয়।···'ইণ্ডিয়ান ফার্স্ট ?' না, 'দি ওয়ার্কারস্ হ্যাভ নো কানট্রি ?' না, 'সবার উপরে মানুষ সত্য ?'···থাক সেই অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব। কর্মক্ষেত্রেই উহার মীমাংসা হইবে।—অমিত হাত দিয়া বিছানো সংবাদপত্র আবার মুছিয়া লইল,—যেন মুছিয়া ফেলিল মনের আভ্যন্তরীণ অসমাপ্ত দ্বন্দ্ব, আপনার স্মৃতিও। মনে মনে বলিল, দেখি দেশের খবর। কি বলেন ফজলুল হক, কিংবা নাজিমুদ্দীন ? বন্দীশালার ফটক কবে খুলিবেন তাঁরা ?···কবে কখন খুলিবে তোমার জন্য এই জেলের ফটক, অমিত ? কবে কখন ? · সেই 'প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশা' ! ··

অমিত আবার সচকিত হয়; নিজেকে শাসন করা প্রয়োজন।—ইতিহাসের ছাত্র তুমি, অমিত। তুমি জানো ইতিহাসের রক্তাক্ত পদচিহ্ন আজ মাদরিদের পথে আর আকাশে মানুষের ভাগ্যলিপি আঁকিতেছে। তুমি জানো, ভালো করিয়াই জানো,—মানুষের ভবিষ্যৎ আজ আর একবার জীবন ও মৃত্যুর অনিবার্য সংঘর্ষের মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। কিন্তু সাধ্য কি, অমিত, তুমি সেই সুগভীর মহিমাকেই শুধু স্থির দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিবে ? তুমি না দেখিয়া পার

কি তোমার নিজের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র সম্ভাবনার কথা, ক্ষুদ্র আশা আর ক্ষুদ্র স্বপ্নের কথা ?…এই ফটক-খোলা পথে তোমার শিকল-ছেঁড়া ক্ষুদ্র পা দুইখানি কবে আবার স্বাধীন সহর্ষ পদ-বিক্ষেপে বাহির হইতেছে—তোমার গৃহের পথে, তোমার বন্ধুর সান্নিধ্যে, বান্ধবীর আনন্দ-কণ্টকিত সম্ভাষণের আশায়…

এ কি, অমিত, এ কি! মহামানবের ইতিহাসের এই ঝটিকা-স্বনন ছাপাইয়াও ব্যক্তি-হৃদয়ের ক্ষুদ্র বাঁশিটি কেবলই যে বাজিয়া উঠিতে চায় !…

উল্লাস-কলরব ভিতরের আঙিনায় ফাটিয়া পড়িতেছে। সংবাদপত্রের পাতা হইতে অমিত মুখ তুলিল,—যে অক্ষর পড়িয়াও সে পড়িতেছিল না, সে অক্ষরগুলি হইতে একবারের মত চক্ষু তুলিল…সম্মুখে বাহিরের প্রাঙ্গণের সেই রৌদ্র-ঝলমল পুকুরের জল, আর কানে সেই ভিতরের আঙিনায় উল্লসিত কলকণ্ঠ !

অমিতবাবু !…

একটা ঢেউ যেন ভাঙিয়া পড়িল অমিতের মাথার উপর—যেমন করিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছিল পুরীতে সমুদ্রস্নানকালে সমুদ্রের প্রথম তরঙ্গটি।…সে তরঙ্গাভিষেক—স্বপ্নে কল্পনায়—অনেক পূর্ব হইতে প্রত্যাশিত ছিল। তবু সমস্ত প্রত্যাশাকে মিথ্যা করিয়া,—এবং সত্য করিয়া,—সমুদ্রের সেই প্রথম আলিঙ্গন অমিতকে ছাইয়া দিয়াছে…তরঙ্গাকুলিতা ইন্দ্রাণী তখন নূতন করিয়া আবার শিথিল বেশভূষা সংবৃত করিয়া লইতেছে…অদ্ভুত, অদ্ভুত এই ভাঙিয়া-পড়া তরঙ্গের তলে অমিতের একটি মুহূর্তের অভিজ্ঞতা ! পূর্বেকার সমস্ত প্রত্যাশা এক মুহূর্তে সত্য হইয়া উঠিয়াছে, আর পূর্বেকার কল্পনা সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যাও হইয়া গিয়াছে। অদ্ভুত এই দেহময় সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অনুরণন, সমগ্র চেতনার অনুরঞ্জন।…আর অদ্ভুত উদ্বেলিত সমুদ্রের শিয়রে আনন্দোচ্ছ্বসিতা ইন্দ্রাণীর উচ্ছল কণ্ঠ : 'অমিত !…'

তেমনি এই নূতন তরঙ্গাভিষেক : অমিতের মুক্তির আদেশ আসিয়াছে। তাহারই সম্বর্ধনায় বন্ধুকণ্ঠের এই আনন্দোচ্ছ্বাস।

শব্দের তরঙ্গস্নানে অমিতের সমস্ত দেহ অনুরণিত, কণ্টকিত। তাহার চেতনা বজ্রালোকিত—আর সুনীল দত্ত ! কোথায় তুমি…

এই বিদ্যুৎতীক্ষ্ণ প্রশ্ন মনে ঝলকিয়া উঠিতেছে। অকম্পিতকণ্ঠে স্মিতহাস্যে অমিত তথাপি বলিতে চাহিল,—আর কার?

অনেকগুলি কণ্ঠ জানাইল, নীহার মিত্রের।

এবার ঘুমুতে বলুন নীহারবাবুকে।

ইংরেজ ওয়ার্ডার সকৌতুক হাস্যে খাতা অমিতের সম্মুখে ধরিল। স্থির দৃষ্টিতে অমিত নির্দেশ পড়িয়া গেল,—বেলা দশটায় মালপত্র লইয়া জেলের ফটকে তাহাকে উপস্থিত হইতে হইবে। বাঁধা-ধরা আদেশ। কিন্তু উহার অর্থ কি? বেলা দশটা? বরিশাল এক্স্প্রেসে কোথাও যাইতে হইবে কি অন্তরীণ হইয়া? না কলিকাতায় যাইতে হইবে স্বগৃহে? ইংরেজ ওয়ার্ডারও আজ গোপন সংবাদ আপনা হইতেই জানাইয়া দিতে দ্বিধা করিল না;—দুইজনই তাহারা স্বগৃহে যাইতেছে, অমিত কলিকাতায়, নীহার মিত্র খুলনায়।

বাড়ি, বাড়ি, বাড়ি,···সমুদ্রের ঢেউ নাচিয়া উঠিতেছে অমিতকে ঘিরিয়া।

ইংরেজ ওয়ার্ডার বলিল, সই করে দাও।—তারপর হাসিয়া বলিল, আমাকে কি দিচ্ছ প্রেজেণ্ট।

অমিত স্বাক্ষর করিয়া দিল। হাতের দামী কলের পেনসিলটা দিয়া বলিল, যদি নাও! সাহেব গ্রহণ করিয়া জানাইয়া গেল, গুড মর্নিং। গেটে আবার দেখা হবে।

এই সাহেব ওয়ার্ডারদের সঙ্গে এত বৎসর কথায় কথায় কলহ গিয়াছে—পারিলে অমিতদের উহারা জব্দ করিয়াছে, কারণ অমিতেরা সাহেবদিগকে নিষ্ঠুরভাবে মারিতেছে। আর পারিলে অমিতরা করিয়াছে ইহাদের অপমান; কারণ, ইহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্ধত সিপাহী। আজ অমিতের মনে হইল,—ইহার সহিত কোনো কলহ নাই। এমন করিয়া যে বন্ধুভাবে হাসিয়া তাহাকে সম্ভাষণ করিতে পারে তাহাকেও তাহারা কি করিয়া শত্রু মনে করিত?

জন কয় অমিতকে ঘিরিয়া বসিল। 'এখানে এবার সাত দিন রইলেন, না? আট দিন?' 'সবাইকে এবার ছাড়বে, কি বলেন?' 'কাউকে আর ছাড়তে দেরি করবে না।' 'বাড়িতেই যাবেন, মনে হয়?' প্রত্যেকটি প্রশ্ন, কল্পনা, জল্পনা, সানন্দ-সম্ভাষণের সঙ্গে প্রত্যেকেরই মনের একটি প্রত্যাশা

পরিষ্কার—আমারও এই শুভদিন আসিতেছে কি? কেন আসিতেছে না? কি বলে সংবাদপত্রে? কি বলেন ফজলুল হক? কিছু নাই!—মুক্তির কথা কিছু নাই সংবাদপত্রে?

সম্মুখের কাগজখানাকে টানিয়া লইয়া অমিত নিজে পড়িতে বসিয়া গেল।

স্টেট্‌সম্যান আর পড়তে হবে না, বাঁচবেন।—কে একজন জানাইল।

সত্য বটে, এবার স্বাধীনভাবে অমিত সংবাদপত্র পড়িতে পারিবে। এতদিন দেশীয় পত্রপত্রিকা তাহাদের নিকট নিষিদ্ধ ছিল। বাধ্য হইয়াই তাহারা বিদেশীয় সাময়িক পত্র বেশি পড়িয়াছে। সেই সূত্রে এইখানে এই কয় বৎসরে বিদেশীয় সাময়িক পত্রগুলি দেশ-বিদেশের জীবন ও রাজনীতির সহিত নাড়ীতে নাড়ীতে যোগসাধন করিয়া দিয়াছে অমিতের, এবং অমিতের মত সংবাদপত্র-বঞ্চিত ও সংবাদ-জিজ্ঞাসু তাহার বন্ধুদের। তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে—আজ কোনো দেশ, কোনো জাতি বিচ্ছিন্ন নাই।

একটু স্পেনের সংবাদটা পড়ে নিতাম।—জানাইল অমিত

স্পেন আর দেখতে হবে না, অমিতদা—ফ্রাঙ্কো এসে গিয়েছে।—একটু পরিহাস, একটু উল্লাস মিশাইয়া বলিল অনাথ।

অমিত হাসিল। বালক অনাথ! তাহার উপায় নাই। আপনাকে বাঁচাইবার নামেই সে আপনাকে ছাঁটিয়া রাখিবে;—বই পড়িবে না, ঘরে রাখিবে হিটলারের ছবি। অনাথের জন্য মায়া হয়, দুঃখ হয়···ইহাদেরই জন্য অমিতের স্নেহ ভালোবাসা বুক ছাপাইয়া পড়ে। মানিত কি তাহা, সুনীল?··· অমিতের আকাশ আবার চিড় খাইল।

সংবাদপত্র পড়া হইল না। মেসের ম্যানেজার আসিয়া বলিলেন, মাছটা এসে যায় কি না দেখি, নইলে ডিমের ওম্‌লেট করে দিই।

খেয়ে যেতে হবে?

অমিতকে না খাইয়া তিনি যাইতে দিবেন না। সকাল বেলা দশটার আগে হয়তো জেলের বাজার আসিয়া পৌছিবে না। তবু তিনি কি একটা ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না, এতই অকর্মণ্য তিনি? অবশ্য অমিতবাবু বাড়িতে যাইবেন। হয়তো বাড়িতে আহারও তৈরি থাকিবে, ভালোই খাইবেন

—বাড়ির রান্না। কিন্তু জেলের বন্ধুরা তাহাকে এই 'আইবুড়ো ভাত' না খাওয়াইয়া বিদায় দেয় কি করিয়া ?

একঘেয়েমির পচ-ধরা পলেস্তারা ছাড়াইয়া এই মুহূর্তে যেন সকলের অন্তর্নিহিত সৌহার্দ্য ও সদিচ্ছা আবার প্রকাশিত হইতেছে। অতি-আকাঙ্ক্ষিত এই মুক্তির মধ্যেও বিদায়-বিচ্ছেদের একটি বেদনামাধুর্য জমিতে চাহিতেছে।

জ্যোতির্ময় বলিল।—উঠে পড়ুন অমিতদা, গুছিয়ে দিই জিনিসপত্র। আগে স্নান করবেন ? বেশ! সেরে আসুন!

অমিত উঠিয়া দাঁড়াইল। স্নান করিবার জন্য সাবান-তোয়ালে লইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল। একে একে এবার অনেকে চলিয়া যাইতেছে। অমিত অবকাশ পাইতেছে—অবকাশ পাইবে এবার, ভাবিবার, বুঝিবার।…

রঘু কখন আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

শুনেছিস নাকি, রঘু ? চললাম।

সহাস্যে রঘু জানাইল—শুনিয়াছে। তারপর : ধোবাকে বলে আসিছি—কাপড় নিয়ে আসিবো।

বেশ, তবে আর কি ? স্নান করে আসি। জিনিসপত্র তারপর গুছিয়ে দিবি।

সহাস্য মুখে লক্ষ্মীবাবু বলিলেন, কি দাদা, ফাঁকি দিলে ?

সাধারণত এ জাতীয় পরিহাসেই লক্ষ্মীবাবুর পরিচয়। তাঁহার ঘুম অনেকক্ষণ ভাঙিয়া গিয়াছে। ঘুম ভাঙিলেও নাকের ডাক থামে না, লক্ষ্মীবাবুর এইরূপ একটা খ্যাতি আছে। এ বিষয় লইয়া রীতিমত ডাক্তার ডাকিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা হয়। কিন্তু সেই নাকের ডাক এখন থামিয়া গিয়াছে। যথানিয়মে দুই টিপ নস্য লইয়া বৃহৎ দেহকে টানিয়া তুলিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালনে যান লক্ষ্মীধর ঘোষ। চা তিনি খান না, এ কালের এ সব পানীয় অপেক্ষা তিনি পেস্তা-বাদামের পক্ষপাতী। দৈনন্দিন ক্রিয়াগুলি স্বভাবতই একটু সময়সাপেক্ষ। সময়ের তাড়া গৃহেই তাঁহার ছিল না, এখানে আবার কি ? পৈতৃক গৃহে মোটামুটি স্বচ্ছল অবস্থায় দিন যায়। বৃদ্ধা

অবস্থাপন্ন বিধবা পিসীমাতার নিকট লক্ষ্মী এখনো বালক। পিসীমার ধারণা হয়তো একেবারে মিথ্যা নয়। যুবক ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগীনীয়দের নিকট 'ছোটকাকা' 'ছোটমামা' একটি জীবন্ত মহারথী,—মহাভারতের পাতা হইতে নামিয়া কোনরূপে এই হরিণাভির ভদ্রাসনে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। হয়তো, ভীষ্ম-দ্রোণ না হোক, ভীম-ঘটোৎকচ বলিয়া গ্রামের অন্যেরাও মানিবে। আর পাড়া-প্রতিবেশীর নিকট 'লক্ষ্মীদা' সত্যই একটা জাগ্রত প্রতিষ্ঠান। ব্যায়ামের আখড়া জমিয়া উঠে তাঁহার বিশাল কৃষ্ণ দেহের আবির্ভাবে। হাঁক-ডাকে ছেলেরা চারি দিকে ঘিরিয়া বসে গল্প শুনিতে, দুষ্টুমি করিতে। গ্রামের যত বখাটে ছেলের নেশা ও বদখেয়ালও লক্ষ্মীদার নামে পলাইয়া যায়। যাইবে না? দুই হাতে দুই মণ লোহার মুগুর লইয়া লক্ষ্মীধর ঘোষ দৈনিক এক ঘণ্টা উহা ভাঁজেন। বৈঠক এখন আর দিতে পারেন না, মেদ-মজ্জা-পেশীর বাহুল্যে উপবেশন ও সঞ্চরণ লক্ষ্মীবাবুর নিকট আর সহজসাধ্য নাই। কুস্তি করিতে চাহেন, মাঝে মাঝে দুই-একটি পশ্চিমা সাকৃরেদ পাইলে সে বাসনা চরিতার্থ হয়। না হইলে ওপাড়ার সরকারদের দরওয়ান চৌবে ও পাঁড়েজীর জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। কিন্তু সিদ্ধিখোর বলিয়া লক্ষ্মীবাবু উহাদেরও বেশি সমাদর করেন না। আর বাঘের থাবার মত তাঁহার হাতের থাবা ঘাড়ে পড়িলে পাঁড়ে-চৌবের পক্ষেও তাহা সুখকর হয় না। তাঁহার দুঃখ, গ্রামের যুবকেরা কেহ তাঁহার আখড়ায় তাঁহার মতো হইল না। একটু মাথা তুলিতে না তুলিতেই ছেলেগুলি কলিকাতায় ছোটে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করিবার জন্য। আর তার পর দুই দিন যাইতেই দেখা যায়—সন্ধ্যায় গ্রামে ফিরিয়া আসে শুধু তাসের আড্ডা আছে বলিয়া। কোথা দিয়া ইতিমধ্যে বিবাহ করে, ছেলেমেয়ের বাপ হয়, মাথায় টাক পড়ে, আর গ্রামের থিয়েটার পার্টিতে গোঁফ কামাইয়া মেয়ের পার্ট করিতে শুরু করিয়া দেয়। দেখিয়া-শুনিয়া লক্ষ্মীধর ঘোষ হতাশ হইয়া যান। আনন্দপ্রিয় উৎসাহপ্রিয় লক্ষ্মীধরকে সেই যুবকেরাও এড়াইয়া চলে, ভয় পায়, অথচ ভরসাও রাখে তাঁহার উপর। পুলিশেই বলে, লক্ষ্মীবাবুকে প্রথম বার ধরিতে গেলে নাকি তিনটা ভোজপুরী পেটে ঘুষি খাইয়া অচেতন হইয়াছিল; ডুলাণ্ডা হাউসের

হাতকড়ি নাকি মট করিয়া তাঁহার হাতে ভাঙিয়া গিয়াছিল; আর এই সে-বৎসর নাকি তাঁহার হাতের বোমার অদ্ভুত শক্তিতেই ফোর্ট উইলিয়ামের একটা তোপখানা উড়িয়া গেল। এসব "ঐতিহাসিক সত্য" হাস্যমুখর লক্ষ্মীবাবুকে দেখিলেই অন্যেরাও বলিবে। এই সব শুনিয়া—লক্ষ্মীদার সযত্ন-ছাঁটা ঘন গুম্ফের ফাঁকে একটা আপত্তির হাসি ফুটিয়া উঠিত। 'ত্যাখো তো ভাই, ধরে আনবে না পুলিশ ব্যাটারা এসব শুনেও? এ সব গাঁজাখুরী কথাই গাঁজাখোর ব্যাটারা বিশ্বাস করে বসেছে।'

অমিত বলিত: কিন্তু এ তো আর মিথ্যা নয়;—ভীম যখন শালগাছটা উপড়িয়ে ছুঁড়ে মারলেন, তখন আপনিই বা···

তোমরা হনুমানরা ভাই, যা খুশি করো, আমাকে কেন? এই ইজ্‌ম্-ফিজমের দিনে আমাকে আর কেন?

কথাটার মধ্যে লক্ষ্মীবাবুর একটু বিষাদও থাকে, অভিযোগও থাকে। এককালে ব্যায়ামের দুর্বায়ুযোগেই তিনি জিম্‌নাস্টিক ও স্বদেশীর গুরুমন্ত্র লাভ করেন। দেশোদ্ধারের সেই মন্ত্র তিনি অখণ্ড ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে ইংরেজী লেখা-পড়া বর্জন করিতে তাঁহার বেগ পাইতে হয় নাই। দুই পুরুষ 'বড়বাবুর' বংশে লক্ষ্মীধরের জন্ম। পিতা তাই আপত্তি করিয়াছিলেন—সায়েবের কথা বুঝিতে হইবে তো? লক্ষ্মীকেই কিন্তু পিসীমা 'ষাট ষাট' বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন,—লক্ষ্মী বাঁচিয়া থাকাই তাঁহার যথেষ্ট পুণ্য। তার পর, পুণ্যভূমি হইতে যবন-বিতাড়নের স্বপ্নে যথানিয়মে বঙ্কিমের নভেল পর্যন্ত বয়কট করিয়া লক্ষ্মীধর আশ্রয় কবেন কালীপ্রসন্ন সিংহের বঙ্গানুবাদ মহাভারত (ওজন দরে 'বসুমতী'র কৃপায় যাহার বিতরণ আরম্ভ হয়); আর বানান করিয়া প্রথাগত ভাবে তিনি পাঠ করিতেন 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা।' ইহাই গুরুর নির্দেশ—একবার কারাবাসের পরে যিনি হিমালয়ে স্বাধীনতার জন্য তপস্যা করিতেছেন। আজও লক্ষ্মীধর ঘোষের উহাই পাঠ্য, উহার বেশি অন্য কিছু নয়। কেবল বঙ্গানুবাদিত এবটের রচিত নেপোলিয়নের জীবনচরিত আসিয়া ইহার সহিত পরে যোগ হইয়াছে। দ্বিপ্রহরে এখনো না ঘুমাইয়া চেয়ারে বসিয়া মহাভারতের বিপুল একটি খণ্ড লইয়া তিনি বসেন, কিংবা

গ্রহণ করেন নেপোলিয়নের জীবনচরিত। উহারই উপর চোখ বুজিয়া আসে, প্রাঙ্গণে অপরাহ্নের ছায়া নামে—প্রথম যৌবনের স্বপ্নগুলি প্রভাতের কুয়াশার মত এই আবেষ্টনীতে এখন যেন কেমন আর ঠাঁই পায় না। সেদিনকার গুরুভক্তি আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, লক্ষ্মীধর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া দিতে পারেন গুরুর বাক্যে। 'মহাভারতের অপেক্ষা বড় সত্য হইবে নাকি ইংরেজের আমলের কোন ইতিহাস বা আবিষ্কার!' সেই গুরুমন্ত্রে বিশ্বাসী লক্ষ্মীধর এখনো তর্ক করিবেন। কিন্তু এ যুগের 'স্বদেশীরা' এখন মহাভারত ছাড়িয়া পুণ্যভূমির সমস্ত ধর্ম, নীতি, আচার-আচরণকে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয় বিজাতীয় কোন 'ইজমও' গ্রহণ করিতেছে। এই সাধনা-বিচ্যুতি সহ্য করিতে পারেন না লক্ষ্মীধর ঘোষ। গুরুকে অনেক দিন চোখে দেখেন নাই—আহা, আর কি সেই মূর্তি চক্ষে দেখিবেন লক্ষ্মীধর? কোথায়, হিমালয়ের কোন গুহায় তিনি স্বাধীনতার জন্য তপস্যা করিতেছেন! এই কথা স্মরণ করিতেও চোখ ছল-ছল করিয়া উঠে লক্ষ্মীধরের।—পিসীমায়ের লক্ষ্মীধর বালকই হয়তো।

কিন্তু গুরুভাইদের ও শিষ্যদের মত-পরিবর্তনের সংবাদগুলিও এতই গুরুতর যে, তাহা উড়াইয়া দিবার মত সাহস আর লক্ষ্মীধর ঘোষের নাই—তিনি মনের মধ্যে একটা অসহায়তা বোধ করেন। তাই, তাঁহার পরিহাসেও আজকাল একটু বিষাদ, একটু অভিযোগ থাকে: 'আমাকে আর কেন, ভাই, এই ইজমের দিনে? আমার মহাভারতখানাই থাক। এবারকার মত বিদায় দিক গবর্নমেণ্ট।'

'ইজমের' সাইক্লোন আসিয়াছে—লক্ষ্মীধর এই কথাটা ভালো করিয়া বুঝিয়াছেন। খাদ্যাখাদ্য-বিচার নাই, আচার-নিয়মের কোনো বাঁধন নাই, সিগারেট-বিড়িতে কোনো মান্য-গণ্য নাই, জেলখানার চারিদিকে লাল-পিঙ্গল কেতাব, কাগজের ঝড়। দুই পাতা লাল কেতাব পড়িয়াই সকলে মাতাল। যাহারা লক্ষ্মীধরের স্বপক্ষে, তাহারাও প্রাচীন আচার-বিচারে উৎসাহী নয়। কেতাব তাহারা কেহ বড় ছোঁয় না, কেহ বা ছোঁয় তাহা টুকরা-টুকরা করিবার জন্য। কিন্তু লক্ষ্মীধর দেখেন তাহাদেরও মুখে বিজাতীয় বুলি, বিদেশীয় নজির।—কেন, মহাভারতের 'অনুশাসন পর্ব'

পড়িলে কি ইহারা জানিত না এই পলিটিক্সের মূলতত্ত্ব? কেহ 'মহাভারত' ছোঁয় না, ছুঁইলেও কেহ শ্রদ্ধা করিয়া যেন আর ছুঁইতে জানে না।... এই তো, অমিতবাবু। তিনি কোনো দলের নন; যথেষ্ট লেখাপড়া শিখিয়াছেন, রহস্যপ্রিয়ও। সংস্কৃত বাঙলা মিলাইয়া তিনি মহাভারত পড়িয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে বসিয়া মহাভারত পড়িবার মত সময় লক্ষ্মীধরের হয় নাই। হইবে কি করিয়া? দুপুর বেলাটা অমিতবাবু পলিটিক্স লিখিতে না বসিলে কোন ভারী ইংরেজি বই পড়িবেন। আলোচনা করিবেন সমাজবিজ্ঞান। সকাল বেলাটায়? লক্ষ্মীধর তখনো হাতমুখ ধুইয়া তৈয়ারী হইতে পারেন না। সেই সব দৈহিক নিত্য-নৈমিত্তিক তো অন্যদের মত অপরিচ্ছন্ন ভাবে মিটাইয়া দিলেই হয় না। উহা সময়সাপেক্ষ। লক্ষ্মীধর বাবুর সকালে আবার নিত্যকার ব্যায়াম সারিতে হয়। উহার পর একটু হাওয়া খাওয়া, এক গ্লাস পেস্তা-বাদামের সরবত পান, বিশ্রাম, আর বেশ করিয়া তৈলমর্দন করিয়া স্নান—কোনোটাই তো যেমন তেমন করিয়া সারিবার উপায় নাই। ইহাতেই তো বেলা বারোটা বাজিয়া একটা হইয়া যায়। তাহার পর একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে আহার। এই অপরিচ্ছন্ন ঘরেদুয়ারে লক্ষ্মীধরের অন্যদের মত দশজনের থালা-বাসনের নিকটে বসিয়াও আহার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এই কারণেই স্বতন্ত্র রন্ধনের ব্যবস্থাও নিজের জন্য তিনি করিয়াছেন। তারপর খাইতে খাইতে তাঁহার দুইটা বাজে। তাহা হইলে লক্ষ্মীধরবাবু দিনের বেলা পড়িবার সময় পাইবেন কখন? সন্ধ্যায়ও তাঁহার এমনি দুর্দশা। স্নান করিতে হয়, স্থির চিত্তে বিশ্রাম করিতে হয়, না হইলে রাত্রিতে ঘুম হইবে না;—ব্লাড্প্রেসারটা বেশি—ঘুমই হয় না। সত্য কথা, লক্ষ্মীধরবাবুর ঘুম হয় না। অবশ্য তথাপি নাক ডাকে। লক্ষ্মীধরবাবুর নাক যদি ডাকে নিজের নিয়মেই ডাকে—ঘুমের ঘোরে ডাকে না,—এই কথা ব্লাড-প্রেসারের রোগী লক্ষ্মীধর হলপ করিয়াই বলিতে পারেন। অন্য সকলে নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলে না, নাক তাঁহার ডাকে, এ কথা তিনি মানেন। কিন্তু সকলে যাহা বোঝে না—না বুঝিয়া ডাক্তারের কাছে তাঁহার কেস্ খারাপ করিয়া দেয়—তাহা এই যে, ঘুম ছাড়াও নাক ডাকিতে পারে, অন্তত

লক্ষ্মীধরের ডাকে। রাত্রে তাই লক্ষ্মীধরবাবুর পড়া নিষেধ, ডাক্তারেরই তাহা মত। অমিতও হয়তো এই সময়ে বিলাতী কাগজ ও দেশী নভেল পড়িয়া ঘুমাইয়া পড়ে। লক্ষ্মীধর ভাবিয়া পান না কিসে অমিতের নিদ্রাকর্ষণ হয়,—নভেলে কি? হয়তো তাই। অবশ্য লক্ষ্মীধর দেখিবার সুযোগ পান না—দশটার আগেই তাঁহাকে আলো নিভাইয়া শুইতে হয়! আর অমিতকে তিনি যত দিন দেখিয়াছেন, দেখিয়াছেন তখনো তাহার আলো জ্বলিতেছে—জেলেও, অন্যত্রও। লক্ষ্মীধরের পক্ষে অমিতের সঙ্গে বসিয়া তাই মহাভারত পাঠের সময়ই হয় নাই। হয়তো পড়া সম্ভবও হইতো না। এই তো সেই মহাভারত লইয়া তর্ক উঠিতেই অমিত বলিয়া বসিল: 'চরিত্রহীন' পড়েছেন, লক্ষ্মীবাবু?

লক্ষ্মীধর নাম শুনিয়া বিরক্ত হইলেও জানিতেন না, সে কি বই। শুনিলেন শরৎচন্দ্রের লেখা নভেল। নভেল লক্ষ্মীধর জীবনে পড়েন না। তাই অমিতের পরিহাস বুঝিলেন না। কিন্তু এমন কি অন্যায় বলিয়াছে সেই সুরবালা মেয়েটি যে বলিল—অর্জুন যদি ধরিত্রী বিদীর্ণ করিয়াই গঙ্গা না আনিলেন তাহা হইলে শরশয্যায় ভীষ্ম জল পাইলেন কোথায়? না, কৌতুকটা লক্ষ্মীধরবাবু ভালো করিয়া বুঝিতে চাহেন না। না হয় একটু রূপক-ছলে সেকালের মহামুনি ঘুরাইয়া বলিয়াছেন। কিন্তু একালে যদি টিউবওয়েল বসাইয়া পাতাল-গঙ্গার জল টানিয়া তুলিতে পার, তাহা হইলে অর্জুনের শরটা তোমাদের এই টিউবওয়েলের তুলনায় এমনি কি উপেক্ষণীয় হাস্যকর অস্ত্র হইল? উহা অস্ত্র, আর ইহা যন্ত্র বলিয়া? অস্ত্র অপেক্ষা ইহাদের মনে যন্ত্রটা এমনি করিয়া আজ বড় হইয়া পড়িতেছে। ইহার পরে বড় হইবে যন্ত্রদাস শূদ্ররা, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু লক্ষ্মীধরবাবু জানেন—পৃথিবীতে ক্ষত্রিয় এখনো মরে নাই; সেই কথাই হিটলার, মুসোলিনিও আবার প্রমাণ করিতেছে। অবশ্য সত্যকার তেজ ব্রহ্মতেজ। আর সত্যকার ব্রহ্মতেজ ও ক্ষত্রতেজের আকর এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। পরিহাসচ্ছলে হইলেও লক্ষ্মীধর তাহা শুনাইলেন। আর বুঝিলেন—অমিতের কথা নিতান্ত পরিহাস নয়। ইহার পরেই অমিতের মুখে লক্ষ্মীধর একদিন শুনিলেন,—যুধিষ্ঠির পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদী। পরিহাসচ্ছলে অমিত বুঝাইতে চাহিল,—সাধারণ মানুষ মিথ্যা বলে অনেক সময়ে বিনা স্বার্থে; তাহা

নিষ্কাম মিথ্যা। তাই স্বার্থের দায়ে তাহারা কোন সময়ে মিথ্যা বলিলেও লোকে সেই মিথ্যা বিশ্বাস করিতে চাহে না। কিন্তু ধর্মরাজের কথা স্বতন্ত্র। বাজে কথা যুধিষ্ঠিরের মুখে নাই। সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া সত্যবাদী বলিয়া নিজের এমন একটি খ্যাতি ধীরে ধীরে তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন যে, প্রয়োজন যখন আসিল তখন মিথ্যাটি ছাড়িলেন—'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ'। সত্যটুকুর ভাঁওতা তখনো সঙ্গে ছিল 'ইতি গজঃ'—হুলের মত পিছনে সুগুপ্ত। অমোঘ তাঁহার মিথ্যা। একটি মিথ্যায় তিনি গুরুবধ সমাধা করিতে পারিলেন, রাজ্যলাভ করিলেন, আবার সত্যবাদিতার নিষ্ঠাটুকুও অটুট রাখিলেন। পৃথিবীতে মিথ্যাবাদিতার আর্টের শ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত আর্টিস্ট হইলেন যুধিষ্ঠির।

লক্ষ্মীধর আর পারিলেন না। চটিয়া অমিতবাবুকে কড়া কথা শুনাইলেন। গোল বাঘের মত মুখের মাংসপেশী যেন থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, দেহ ঝড়ের পূর্বেকার সমুদ্রের মত স্তব্ধ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল।

—আপনাদের এই ইজম-ফিজম ওসব মহাপুরুষদের নিয়ে না করলে কি ক্ষতি হয়? আরো কত তো আছে। পাদ্রীরা শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে পরিহাস করে, মা-কালীকে যা-তা বলে—এ তো নতুন কিছু নয়।

এতটা উষ্মার জন্য অমিত প্রস্তুত ছিল না। যথাসম্ভব হাসিয়া কথাটা মানিয়া লইতে চাহিয়াছে: একালের মহাপুরুষদের নিয়ে পরিহাস করলে যে খুনোখুনি হবে, লক্ষ্মীধরবাবু। হিটলার-মুসোলিনীকে কিছু বললে এঁরা আর লেনিন-স্ট্যালিনকে বললে অন্যেরা আমার মুণ্ডপাত করবেন। পুরনো মহাপুরুষদের নিয়ে বলা একটু নিরাপদ—তাঁদের চেলা-চামুণ্ডা একালে আর বেশি নেই।

লক্ষ্মীধর নিজের ক্রোধ সম্বরণ করিবার অবসর পাইলেন। হাজার হোক, অমিত লোকটা বিদ্বান্‌, তা ছাড়া কোনো দলের মধ্যে সে ঢুকিয়া পড়ে নাই—'ইজম্‌' পড়িলেও 'ইজম্‌' করে না। লক্ষ্মীধর হাসিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, গুড্‌, অমিতবাবু, গুড্‌! তারপর সস্নেহে অমিতের স্কন্ধে বৃহৎ থাবার প্রীতিময় মুষ্ট্যাঘাত প্রদান করিয়া কহিলেন, পুরনো মহাপুরুষদের পিণ্ডি চটকিয়েই এবার আমার পণ্ডিতি ফলাব।

মেঘ কাটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে অমিতবাবুর সঙ্গে লক্ষ্মীধর ঘোষের আর এই পুরানো ইতিহাস লইয়া আলোচনার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। চিরদিনের মত কৌতুক চলিয়াছে—সেই নব-জলধরকান্ত দেহ লইয়া, সেই অনিদ্রাহীন নাসিকার উচ্চ গর্জনের ইতিহাস লইয়া, সেই তোপখানা ওড়ানো বোমার মাহাত্ম্য লইয়া। দুইজনার মধ্যে দূরত্ব অবশ্য রহিয়াছে, তবু সেই সঙ্গে রহিয়াছে কৌতুক-হাস্যের সৌহার্দ্যও।

স্বচ্ছন্দে তাই লক্ষ্মীধর আজ বলিলেন: কি, দাদা ফাঁকি দিলে?

তা নয় দিলাম, কিন্তু কাকে দিলাম, বলুন তো?

...কাহাকে ফাঁকি দিয়াছে অমিত? তাহার পাউণ্ড অব্ ফ্লেশ আদায় করিয়া লয় নাই সাম্রাজ্যের সঙ্গীনধারীরা? তাহার সাঁঝ-সকালের বেদনার স্বাদ পায় নাই তাহার ছয় বৎসরের সতীর্থরা?...ফাঁকি দিয়াছে অমিত হয়তো নিজেকে। এই ভিড়ের মধ্যে সকলেই তাহার বন্ধু, সকলেই তাহার প্রিয়—কিন্তু সে খুঁজিয়া পায় নাই নিভৃতি, পায় নাই প্রশান্তি—আত্মার স্বাচ্ছন্দ্য। কাহাকে ফাঁকি দিয়াছে অমিত? নিজেকে?...না, সুনীল দত্তকে?

লক্ষ্মীধর একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন: কেন ভায়া, আমাদের —এই বুড়োদের। ওল্ড ফুল্‌স্‌দের 'হেট' করে চলে গেলে, না?

অমিত চমকিয়া উঠিল...এই বুড়োদের,—'বুড়োদের কাজ হাতে তুলে নাও, অমিত,'—সেই পুরাতন অনুনয়ই অমিতের উদ্দেশ্যে এই অভাবনীয় ক্ষেত্র হইতে অপ্রত্যাশিত কণ্ঠে আবার উত্থিত হইতেছে।

অমিত সহাস্যে বলিল: কি যে বলেন লক্ষ্মীবাবু?—ইন্দ্রের রথ আসছে আপনাদের মত মহারথীদের জন্য। আমরা পদাতিকেরা যাব আগে সার করে দাঁড়াতে—আপনারা আসবেন।

লক্ষ্মীধর হাসিলেন, বলিলেন, যাক সেজে নাও। আই-বি-র রথ এসে গিয়েছে হয়তো। দশটায় যেতে হবে? বাড়িতে খবর দিয়েছে বোধ হয়?

স্নানের স্থলে মাথায় জল ঢালিতে লাগিল অমিত।

কাহাকে ফাঁকি দিয়াছ, অমিত? কাহাকে ফাঁকি দিয়াছ?...বারে বারে চমকিয়া উঠিয়াছে এই কথা কত দিন তাহার মনে,—'ফাঁকি দিয়াছ,

অমিত, ফাঁকি দিতেছ, নিজেকে ফাঁকি দিতেছ'। তাহার নিঃসঙ্গ সত্তার চারিদিকে মরু-প্রান্তরের গভীর শূন্যতা ছড়াইয়া পড়িতেছে, তাহার স্ফটিক-স্বচ্ছ রস-চেতনা রহিয়াছে যুগান্তরের উপবাসী। তখনি আবার অমিত সেই বোধকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে,—এ পৃথিবী রূপ-রস-গন্ধ-গান কোন কিছুতেই তুমি অগ্রাহ্য করিতে চাহ না, অমিত ; কিছুতেই তোমার পরিসমাপ্তিও নাই, অমিত।—জীবন-রসের রসিক তুমি, মানুষের-মুক্তি-স্বপ্নে উন্মাদ তুমি। আজ এই মুক্তি-মুহূর্তে মানিবে না কি বন্দী-জীবনের এই বৎসরগুলি তোমার হাতে তুলিয়া দিয়াছে কত বিচিত্র জীবনের স্পর্শ,—কত রূপ, কত শব্দ, কত সম্ভাবনা আর আবর্জনা, আশার বঞ্চনা আর পিপাসার পীড়ন, আদর্শের ভগ্নাবশেষ আর আত্মার নবজন্ম !

…কত মূর্তি, কত মানুষ ভিড় করিয়া আসে। জন্ম-মৃত্যুর এই দোদুল দোলায় দুলিয়া ভাসিয়া অমিত এইখানেই মানুষকে প্রথম চিনিয়াছে, বুঝিয়াছে সেই পরম বিস্ময়কে।

মমতায় কৌতুকে আবার অমিতের মনে ছাইয়া গেল—মহাভারত-আশ্রয়ী লক্ষ্মীধর আজ বাহু বাড়াইয়াও তাদের যুগকে ছুঁইতে পারিতেছে না। বিরোধিতা অপেক্ষাও লক্ষ্মীধরের মনে বেদনা প্রবল হইয়া উঠিতেছে।… একটি সকরুণ প্রীতি লক্ষ্মীধরের ওই সুদূর সৌহার্দ্যের মধ্যেও জমিয়া আছে অমিতের জন্য, জমিয়া আছে 'স্বদেশীর' একটি অতীত-প্রায় যুগের অভিযোগ—'ফাঁকি দিয়াছ'। একদিনের আদর্শ ছাড়াইয়া অন্যদিনের সত্যের দিকে আগাইয়া যাইতেছে জীবন। লক্ষ্মীধর সুনীল ফাঁকি পড়িয়া যায়।

নিজেকে ফাঁকি দিয়াছে কি অমিত? অমিত মানুষের বিশ্বরূপ দেখিয়াছে, …আর, আরও ভালোবাসিয়াছে মানুষকে। ভালোবাসিয়াছে সেই মানুষদের …যাহারা দিনে দিনে ক্ষয় হইয়াছে, কিন্তু ক্ষুদ্র হয় নাই।…

এই যুগের এই মানুষের পরিচয় দিবে—এই দায়িত্ব হাতে লও তুমি, অমিত। এই মানুষকে তুমি দেখিয়াছ, ভালোবাসিয়াছ…কিন্তু ভালোবাসিয়াছে বলিয়াই তো অমিত ইহাদের কথা বলিতে পারিবে না। বলিয়া শেষ করিতে পারিবে না বলিয়াই বলিতে পারিবে না। সেই শক্তি তাহার কোথায় যে সে

মানুষের এই সত্যকে রূপদান করিবে? সেই স্পর্ধা কই, বলিবে অমিতের হাতেই তাহাদের আত্মা আয়ুলাভ করিবে। সেই শিল্পীর ঔদাসীন্য কই যে এই পরম আত্মীয়দের মূর্ত করিবে? তাহাতে ব্যর্থ হইলে মানুষের অপচ্ছায়া আঁকিয়া লজ্জায় অবমাননায় মাটিতে মিশিয়া যাইবে যে অমিত।...

আত্মজিজ্ঞাসা শেষ হয় না। থাকুক তাহা—অমিতের পরিচয়। সে আপনাকে স্মরণ করাইয়া দেয়—থাক এই প্রশ্ন এখন। ইতিহাসের মহাসত্যকে তুমি জানিয়াছ, অমিত; তাহাই তোমার পরিচয়। মানুষের বিশ্বরূপ দেখিয়াছ, অমিত; তাহাতেই তোমার মুক্তি—তোমার নিঃসঙ্গ সত্তার সম্পূর্ণতা। এই মুক্তি, এই সম্পূর্ণতা সঙ্গে লইয়া তুমি জীবনের মধ্যখানে গিয়া আজ আবার দাঁড়াইবে—ইতিহাসের আকাশ জুড়িয়া যখন বজ্র-বিদ্যুৎ-অগ্নিভরা প্রলয়ের মেঘ সাজিতেছে, মানুষের নাড়ীতে নাড়ীতে যখন নবজন্মের প্রসব-বেদনা।

অন্য দিন আজ, অন্য দিন।

৪

অন্য দিন আজ—অন্য দিন।...

অমিত শুধু ইতিহাসের মধ্যেই মিলাইয়া যাইবে না; আজ সংসারের মধ্যেও সে আবার ফিরিয়া যাইবে—মায়া-মমতায়-ভরা মানুষের মধ্যেও গিয়া সে দাঁড়াইবে। সে শুধু আর ইতিহাসের ছাত্র নয়, মায়া-মমতায়-ভরা মানুষও। তাহার এই পরিচয়ই কি কম সত্য? নিজের এই পরিচয় কি সে এখানে বসিয়া এবার আবিষ্কার করে নাই? পৃথিবীর এই মায়া-মমতা-ভরা প্রত্যেকটি স্পর্শকে অমিত তাহার ললাটে ছোঁয়াইয়া, তাহার কপালে বুলাইয়া, তাহার বুকে তুলাইয়া লইতে চায়; জীবন-রসের পিপাসা তাহার প্রাণে অশেষ, অনির্বাণ, অতলস্পর্শী।..

অনেক বাধা ডিঙাইয়া মায়ের চিঠি আসিত। আঁকা-বাঁকা, ভুল বানানে ভরা সেই পত্র। উহার স্পর্শে অমিতের মনে হইত কে যেন তাহার শিরশ্চুম্বন

করিল। তাহার দিন-রাত্রির সমস্ত কর্মপ্রবাহের মধ্যে সেদিন একটা শিহরণ জাগিয়া যাইত।···বড় দুর্বল, বড় উন্মাদ তুমি, অমিত। বড় দুর্বল, বড় দুর্বল—আর বড় ভাগ্যবান! পিতার চিঠি আসিত; স্থির চিত্তের আর কম্পিত হস্তের স্বল্প সম্ভাষণ। অমিত জানে এই বেদনা-গম্ভীর সম্ভাষণ অনেক অনেক ক্লাসিকস্-গঠিত আত্ম-সমাহিতির সাক্ষ্য। শ্রদ্ধায় নিজের তুচ্ছতায় অমিত অবনত হইয়া পড়িত সেই লিপির সম্মুখে। তেমনি স্থৈর্য ও চিত্ত-ভরা আর-এক মাধুর্য লইয়া বৎসরে দুইবার আসিত অমিতের নিকটে পিতৃবন্ধু ব্রজেন্দ্র রায়ের পত্র;—নববর্ষের শুভেচ্ছা বহন করিয়া আনিত, বিজয়ার আলিঙ্গন জানাইয়া যাইত। সেই স্বল্প, স্বচ্ছ অক্ষরের মধ্য দিয়াও একটা যুগই যে শুধু একালের এই অগ্নি-মেখলা যুগের সীমানায় আসিয়া দাঁড়াইত তাহা নয়, একটি ব্যক্তি-জীবনের মধুময় স্পন্দনও অমিতের ব্যক্তি-মানসের মধ্যে জাগিয়া উঠিত। প্রথম দিকে সুরের চিঠিও আসিয়াছিল। সেন্সরের অনেক কালির পুচ্ছাঘাত বহিয়া, কাঁচির অনেক ব্যবচ্ছেদ সহিয়া মাত্র খান দুই-তিন চিঠি আসিয়াছিল। পরে তাহাও আর আসিতে পারে নাই। অমিত সুর-র খবরও আর পায় নাই। হয়ত বা অবরুদ্ধ অমিতকে নাগালও পায় নাই আরও কারো কারো কণ্ঠস্বর, আরও কোনো কোনো আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবীর করলিপি। শুধু অমু-মন্থর কল-কাকলি পার হইয়া আসিয়াছে সেন্সরের কালির প্রাকার, কাঁচির প্রাচীর। সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ যেন সুস্থ হইয়া বসিয়াছে অমিতের ব্যক্তি-মানস—মমতা আনন্দের সম্পর্ক-জালের মধ্যে আপনাকে সে দেখিতে পাইয়াছে, আপনার কথাই সে শুনিতে পাইয়াছে। পত্র পড়িতে পড়িতে তাহার মন স্বচ্ছ হইয়াছে, তাহার প্রাণ স্বস্তিবোধ করিয়াছে। কাহাকেও তো অমিত হারায় নাই, কাহাকেও অস্বীকার করে নাই। এই তো—শুধু দুইটি স্বাক্ষর স্বগৃহের; অমনি স্বচ্ছন্দে সে আপনার গৃহমধ্যে আপনার স্থানটি গ্রহণ করিতেছে, গ্রহণ করিতেছে ভাইএর বোনের মমতা আর ভালোবাসা। কিছুই সে অস্বীকার করে নাই, ফাঁকি দেয় নাই কোথাও নিজেকে। অমিত তো তাহার ভ্রাতা ভগ্নীর দাদা, এ পরিচয়টা কত সত্য। তারপর নিজের সীমাবাঁধা পত্রের ধরাবাঁধা বক্তব্যের মধ্যেও যেন

অমিতের মন উত্তর লিখিতে লিখিতে হাস্যে, কৌতুকে উচ্ছল হইয়াছে, স্বপ্ন ফুটিয়াছে চোখে।··মরুভূমির অন্তঃসলিলা ফল্গুধারা সহোদরার সম্ভাষণ পাঠাইতেছে পদ্মা-ভাগীরথীর দুকূল-প্লাবী স্রোতকে—তাহার দুই তীরে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে বাঙলা দেশের আকাশ, লুটিয়া পড়িতেছে কাশে-ছাওয়া বালুচর আর ঘাসে-ছাওয়া মাঠ, বুড়ো বট আর বিশাল অশ্বত্থ ; ছোট ছোট গ্রামের আড়ালে আর আকাশের ছায়ায় বাঙালীর শ্যাম গৃহাঙ্গনে সেখানে আপনার স্নেহময় কোল পাতিয়া রাখিয়াছে বাঙলা দেশ ;—আর দিনান্তে ধূম্রমুখী সেই গ্রামলক্ষ্মী আর অশ্রুমুখী গৃহলক্ষ্মী সেখানে সেই শূন্যকোল লইয়া করিতেছে তাহার গৃহহীন, নির্বাসিত সন্তানদের প্রতীক্ষা।

চার বৎসরের সীমানায় এমনি এক পত্রে অমিত জানিল—মা নাই। কিন্তু দুই বৎসরের কাছে আসিয়াই একদিন শুনিয়াছিল ব্রজেন্দ্রবাবুর শোকসংহত কণ্ঠ। একটি কথা শুধু সেই পত্রে ছিল : "হয়ত জানিয়াছ আমাদের সংসারে কত বড় বজ্রপাত হইয়াছে।" তখনো অমিত কিছুই শোনে নাই ; কিন্তু অচিরেই জানিয়াছিল--সবিতা বিধবা হইয়াছে। নবপরিণীতা সবিতাকে ছাড়িয়া তাহার স্বামী ডাক্তার সুখেন্দুভূষণ বিদেশে বিদ্যার্জনে গিয়াছিল, তাহা অমিত জানিয়া আসিয়াছিল। আর কি তবে সুখেন্দুভূষণ ফিরে নাই ?···সেই নম্রমুখী, শান্তচিত্ত সবিতা শীত-সন্ধ্যার বৈকালী আলোতে তেমনি তাহার অনাবৃত সুডোল বাহুটি লইয়া তেমনি কি অস্তপারের আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল এতদিন—মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ? আর তেমনি সে অপেক্ষা করিবে আজীবন, অনন্তকাল, মরণের এপারে আর মরণের ওপারে ?···ইহার কল্পনাও অমিতের বুকে বাজিয়াছে। গৃহসুখের, ভালোবাসার, জীবনানন্দের সমস্ত রস হইতে এমন করিয়া নিজেকে বঞ্চনা করিবার অধিকার আছে কাহারও—সবিতার ?···কারণ, অধিকার তো নয়, ইহা যে জীবনের দেবতার প্রতিই অবিশ্বাস। অমিত জানে না, অন্তত সে মানে না এই অধিকার। কিন্তু অমিতই বা তাহা বলিবার কে ?—শান্ত ভাষায় অমিত বিজয়ার শেষে ব্রজেন্দ্রবাবুকে বেদনাপূর্ণ প্রণাম জানাইয়াছে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের সম্ভাষণ আর তখন ফিরিয়া আসে নাই। আসিয়াছে অমিতের

উদ্দেশে একটি সবিষাদ প্রার্থনা। তারপর অমিতের মাতৃবিয়োগের সূত্রে ব্রজেন্দ্র রায়ের সেই বিষাদ-ঘন কণ্ঠ অশ্রু-মথিত হইয়া উঠিল। হৃদয়ের সম্বৃত বেদনা গাম্ভীর্যও একবারে এক পশলা বর্ষণে তখন আপনাকে উৎসারিত করিয়া দিল; তাহা কি শুধু ব্রজেন্দ্রনাথের অমিতেরই কথা-সূত্রে? না, চিঠির এই নতুন হস্তাক্ষরের নতুন সূত্রেই তাঁহার হৃদয়-বেদনা এই অবকাশ পাইয়াছে?

ব্রজেন্দ্রনাথ বারাণসীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন,—বিশ্বনাথের সন্ধানে নয়, ভারতবর্ষের সভ্যতার আকর্ষণে। সবিতা হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন-সীমা উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছিল। তাঁহার রোগটা সম্ভবত বেরিবেরি মাত্র, কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টিশক্তি লইয়াই টান পড়িয়াছে। গ্লোকুমা তাই তিনি আর নিজ হস্তেও অমিতকে পত্র লিখিতে পারিলেন না—এই সময়ে, আজ অমিতের এই পরম শোকের দিনে—"যে শোকে সান্ত্বনা নাই, অমিত। সান্ত্বনায় তোমার প্রয়োজনও নাই জানি। শোক সহিয়াই তুমি উত্তীর্ণ হইবে শোকাতীত স্থৈর্যে, তাহাও বুঝি। বিশ্ব-দেবতার যে রূপ তুমি ধ্যান করিয়াছ তাহাতে এই বিয়োগ-বেদনায় ব্যাকুল হইবে না, তাঁহার আশীর্বাদ তুমি লাভ করিবে। কিন্তু আমরা বিধাতাকে বড় করিয়া দেখি নাই। তাঁহাকে একান্ত করিয়া চাহিয়াছি। আপনার জনের মধ্যে একান্ত আপনার করিয়া পাইতে গিয়াছি—প্রিয়জনের মধ্যে, প্রিয়জন লইয়া। তাই, সান্ত্বনা পাই না আমরা, পাইবেন না তোমার পিতা। তাই বলিব না, অমিত,—আমরা শান্তি লাভ করিয়াছি। কিন্তু জানি, অমিত, তুমি অধীর হইবে না। তোমাদের বিরাট চেতনায় ব্যাকুলতার স্থান নাই।"

মায়ের মৃত্যুতে অমিত ব্যাকুল হয় নাই। কোথা দিয়া কি যেন পরিসমাপ্ত হইল, এই বোধই জাগিতেছিল। আর মিথ্যাময় শাসন-ব্যবস্থার মিথ্যাচারে একটা হৃদয়ভরা ঘৃণার হাসি ফুটিয়াছিল মুখে। মুক্তির একটা নিঃশ্বাসও পড়িয়াছিল বন্ধন-ছিন্ন বুক হইতে: ঘুচিয়া গেল, ঘুচিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের দুর্বলতম প্রদেশটিকে যেন ভাগ্যদেবতা উপড়াইয়া ফেলিয়া দিল এইবার। অমিত কতবার তাহার এই অসহায় অন্তরের সঙ্গে যুঝিতে যুঝিতে হারিতে হারিতে বলিয়াছে—'মা বড় জঞ্জাল।

মরেও না।' শেষ হইয়াছে এখন তাহার মায়ের জীবন-সংগ্রাম। সে সংগ্রাম তো মাকে শুধু হৃদয়ের একটি প্রদেশ জুড়িয়াই করিতে হয় নাই, করিতে হইয়াছে হৃদয়ের সমস্ত কেন্দ্রে, প্রান্তে, তন্তুতে তন্তুতে। দেহের প্রতিটি রক্তকণা দিয়া যেমন তাঁহার অমিতকে তাঁহার গড়িতে হইয়াছে, আয়ুক্ষয় করিয়া যেমন তাহাকে মা আয়ু দিয়াছেন, তেমনি অন্তরের প্রতিটি সূক্ষ্ম স্থূল আবেগ আকাঙ্ক্ষা দিয়াও জড়াইয়া ধরিয়াছেন তিনি তাঁহার এই আত্মজকে —অমিত তাঁহার পরিচয়, অমিত তাঁহার অমরত্ব ;—আর সেই অমিত তাঁহার অস্বীকৃতি, সেই অমিত স্বতন্ত্রও। অমিত তাঁহার সৃষ্টি—রক্তমাংসের প্রাণপ্রবাহের ; তাই অমিত তাঁহার পরিচয়। কিন্তু সে অমিত আবার নূতনকে সৃষ্টি করিবে, প্রাণলীলার নতুন সম্পদ যোগাইবে—দেহ দিয়া, মন দিয়া, প্রাণ দিয়া ; তাহাতেই অমিতের পরিচয়। আর তাহারই ফলে অমিত হইবে বিশিষ্ট স্বতন্ত্র, তাহার মায়ের নিকট পর, মায়ের অপরিচিত।

অমিতকে অমিত হইতে নাই—সেই আত্মক্ষয়ী মাতৃপ্রাণের ইহাই নিগূঢ়তম কামনা ; অমিতকে অমিত হইতেই হইবে, ইহাই আবার এই নবায়মান প্রাণশক্তির প্রবলতম প্রেরণা। আর এই দ্বন্দ্বের মাঝখানে পড়িয়া সেই মাতৃপ্রাণ অনির্বাণ জ্বালায় জ্বলিয়াছে ; সেই দ্বন্দ্বের সীমান্ত ছাড়াইয়াও অমিতের প্রাণ শঙ্কায়-বেদনায় অপরাধ-বোধে নিজেরই কাছে নিজে পালাইয়া পালাইয়া ফিরিয়াছে। এবার সেই দ্বন্দ্ব শেষ হইল, শেষ হইল—নিবিয়া গেল সেই জ্বালা ; মায়ের বুকের জ্বালা ; আর মুক্তি পাইল অমিত, মুক্তি পাইল আপনার নিকট হইতে।

অমিত সেদিন মুক্তির নিশ্বাস ফেলিল। সে হাসিয়াছিল বিদ্রূপভরে, পরিহাস করিয়াছে শাসক-সুলভ মিথ্যার হাস্যকর বেসাতিকে। তাহার ঘৃণার হাসিকে বিজয়ীর মত পরিণত করিয়া তুলিয়াছে অবজ্ঞার হাসিতে। তারপর তাহা ক্রমে পরিণত হইয়াছে সর্বজয়ী দেবতার সবিষাদ নির্মল কৌতুকের হাসিতে—laughter of the gods. পীড়ার মধ্য দিয়া, মৃত্যুর মুখে দাঁড়াইয়া যে সত্য অমিত বুঝিয়াছিল, তাহাই রসঘন উপলব্ধিতে স্থির হইল—"ভাল আমি বাসিয়াছি এই শ্যাম ধরা।—কিন্তু তারপর ?" তারপর বিচ্ছিন্ন-

বন্ধন অমিতের হৃদয়ের সেই শূন্যস্থল হইতে কেমন যেন একটা দীর্ঘনিশ্বাসও আবার ধ্বনিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। মায়ের যে আশা, যে স্বপ্ন, অন্নপূর্ণার মত সংসার পাতিবার তাঁহার যে সহজাত কামনা মিথ্যা করিয়া অমিত অমিত হইতে চাহিল, অমিত হইতে পারিল, কে যেন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে শুরু করিল,—ইহার কী প্রয়োজন ছিল, অমিত? এমন করিয়া মাকে নিরাশ করিয়া কোন্ সার্থকতা তোমার লাভ হইল? তোমার লাভ হইল কোন সম্পূর্ণতা—জীবন-রসের এই সহজ উপলব্ধির পাত্রটিকে দূরে সরাইয়া দিয়া? ··অনেক অস্বীকৃতির অনেক বিকৃতি,—অনেক বিভূতির অনেক ভস্মাগ্নি,—দেখিয়া দেখিয়া তখন অমিত হাস্যমুখর। কিন্তু অমিতের বক্ষতলে সেই ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসাটাও অনিবার্য সংশয়ে রূপায়িত হইয়াছে,—'অমিত, কাহাকেও ফাঁকি দিয়াছ কি তুমি? ফাঁকি দিয়াছ তোমার মাকে? ফাঁকি দিয়াছ আপনাকে?'—হাসি মিলাইয়া যাইতে চাহে—যতবার অমিত হাসিতে থাকে। আবার নিজেকে লইয়াই সে হাসে নিজের কল্পনায়।···

পিতার হস্তাক্ষর আর মাতৃহারা ভাইবোনের সেই প্রথম শোকাবেগ সেন্সারের শরশয্যা হইতেও অমিতের উদ্দেশে বহিয়া আনিতেছিল—জীবনের মায়া। এক বৎসর হইল পিতার সেই কম্পিত হস্তাক্ষরের ঋজু স্বাক্ষর আর অমিত পায় না। ভাই বোনের কঠিন পীড়ায় তিনি অশক্ত। পরিস্ফুট চিত্তের ছাপ বহন করিয়া তাহাদের যৌবনচঞ্চল হস্তাক্ষর তখন অমিতের মনের নিকট বর্ষণ-বর্ধিত নদীর সতেজ গতি-চিহ্ন লইয়া আসিতেছে। ব্রজেন্দ্রবাবুর পত্রের মধ্য হইতে সেই স্বচ্ছ স্থিরতা আর অমিত পায় নাই। পাইল একটি সংহত-যৌবন, সংহত-বেগ প্রকৃতির নতুন আভাস: 'দিন যায়, নতুন বৎসর আসে;—আমরা প্রত্যাশা করিয়া থাকি, তোমার জন্য প্রতীক্ষা করি সকলে।' 'প্রত্যাশা' আর 'প্রতীক্ষা'।···ইহা নতুন স্বর, ইহা ব্রজেন্দ্রবাবুর সেই স্নিগ্ধাবেগ কণ্ঠ নয়। ইহা শুধু নতুন হস্তাক্ষর নয়, নতুন চিত্তের স্বাক্ষরও। অমিতের মনের মধ্যে সেই ভাষা গুঞ্জরণ করিয়া ফিরিতে থাকে, সেই অক্ষর এক নতুন সত্তার আভাস ফুটাইয়া তোলে।···আর অমিতের অন্তরের প্রশ্ন অপ্রতিহত হইয়া উঠিল,—কাহাকেও ফাঁকি দিয়াছ কি, অমিত?—কাহাকে? কাহাকে?

সেদিন মরুভূমিতে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। চোখ মেলিতেই নবাঙ্কুর তৃণদলের এক উজ্জ্বল শ্যামলিমা চোখে মোহ বিস্তার করে—অমিতের লেখা পত্রেও কি তাহার স্পর্শ লাগিয়া গিয়াছিল?…'প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা'। আবার বিজয়ার আশীর্বাদ-আলিঙ্গন আসিল। রুদ্ধবেগে স্রোতস্বতী যেন আছড়াইয়া পড়িতে পড়িতে থামিয়া গিয়াছে—সে যে নিশ্চল গম্ভীর হিমাচলের বাণীবাহিকা: 'তোমার 'প্রত্যাশা' করিব না, আমরা? তোমার জন্য 'প্রতীক্ষা' করিব না আমরা কেহ? সে কি, অমিত! তুমি যে আমাদের গৃহের অনেকখানি ছাইয়া আছ। তোমাদের জন্য যে অপেক্ষা করিতেছে সারা দেশ, সারা সংসার'……সেন্সারের কালির পোঁছে মুছিয়া গিয়াছে দেশের আর পৃথিবীর সেই প্রতীক্ষার কথা—যেন সংবাদটা পুঁছিয়া ফেলিলেই অমিতেরা দেশের বুক হইতে মুছিয়া যাইবে।

যে গৃহের অনেকখানি ছাইয়া আছে অমিত,—একা অমিত,—সেই গৃহের প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষাই অমিতকেও ছাইয়া রহিল। একটি সুডোল অনাবৃত বাহুর আভাস, পশ্চিম-আকাশের মুখ-চাওয়া একটি তরুণী মুখের স্থির নির্বাক প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা…না, অমিত কিছুতেই এই কল্পনা হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিল না। অমিত অনেক পরিহাস করিয়াছে নিজেকে—আপনাকে ছাড়া কাহাকে লইয়া হাসিবে সে এখানে—এই নিঃসঙ্গ বনবাসে?—'ফ্রয়েড্ পড়িয়াছ, অমিত,—এটর্নি সাতকড়িও যাহার নাম করিয়া শপথ করিত? একালে যাহা না পড়িলে তোমার জীবনের বারো আনাই মিথ্যা। পড়ো বা না পড়ো, এই দিবাস্বপ্নের মোহবিলাসে কাহাকে তুমি ফাঁকি দিবে? দেখিয়াছ নগেন ভটচাজ্‌কে? নৃপেন দত্তকে? বৈদ্যনাথ বাঁড়ুজ্জেকে? ভাপে-সিদ্ধ মাংসের মত তাঁহারা শুধু আপনার মধ্যে আপনারা গলিয়া গিয়াছেন। আর, শুনিয়াছ কি প্রেম-প্রীতিভরা শশাঙ্কনাথের একান্ত নিবেদন, ট্রাজিক দীর্ঘশ্বাস? ‥

অমিতের আত্ম-পরিহাস ক্রমে আত্মজিজ্ঞাসায় পরিণত হইয়াছে: কাহাকে, অমিত, ফাঁকি দিয়াছ তুমি? নিজেকে, শুধু নিজেকেই দিয়াছ। আর তাইতেই জানো—নিজেকে মানুষ ফাঁকি দিতে পারে না। সংসারকে পারে,

বিধাতাকে পারে, পারে না নিজেকে ফাঁকি দিতে। কি করিয়া, অমিত, নিজেকেই বা ফাঁকি দিবে? স্বপ্ন রচিয়া? 'প্রতীক্ষা' আর 'প্রত্যাশা', শুধু এই দুইটি শব্দ অবলম্বন করিয়া কোন মূঢ়তার জাল বুনিতেছ তুমি?...

সেই জিজ্ঞাসার সঙ্গে এইবার মুখামুখি হইতে হইবে তোমাকে, অমিত।—স্নান শেষ করিতে করিতে অমিত নিজেকে বার বার বলিল: স্বপ্ন শেষের দিন আসিল এইবার,—আসিল স্বপ্নভঙ্গের আর জীবন-পরীক্ষার দিনও। কাঁটাতারই শুধু তোমাকে এতদিন ঘিরিয়া রাখে নাই, স্বপ্নেও তুমি নিজেকে ঘিরিয়া লইতেছিলে। আজ আর স্বপ্ন নয়,—জীবনের স্বপ্ন-রচনা নয় শুধু,—জীবনের প্রত্যক্ষ, 'কংক্রিট' রূপ এইবার তোমাকে প্রতিটি পদক্ষেপে পরীক্ষা করিয়া লইবে। অজ্ঞাত, অনিশ্চিত, অশেষ সম্ভাবনাময় সত্য এইবার তোমাকে কাড়িয়া লইবে, জীবনের সঙ্গে মুখামুখি দাঁড় করাইয়া দিবে। মৃত্যুর সঙ্গে মুখামুখি করিয়াছ, অমিত, এতদিন; জীবনের সঙ্গে মুখামুখি করিতে পারিবে কি আজ?.. বাঁচিতে চাহিয়াছিলে, মরিতে চাহ নাই;—জীবনের মূল্য বুঝিয়াছিলে, চক্ষে তাই জল ঝরিয়াছিল ব্যাকুল কামনায়, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'। এইবার জীবনের সেই মূল্যদানের দিন—'মানবের মাঝে' বাঁচিবার আহ্বান...অন্যদিন আজ, অন্যদিন!...

নির্জন কারাবাসের বিভীষিকার মধ্যে অমিত সেবার চমকিয়া উঠিয়াছিল—মৃত্যু বুঝি ইহার অপেক্ষা অনেক শান্ত, অনেক সুশৃংখল, অনেক সহনীয়। হে রুদ্র, তোমার সেই দক্ষিণ মুখই প্রকাশিত করো,...অমিতকে হত্যা করিয়ো না, অমিতের মন-বুদ্ধি চেতনাকে লইয়া এমন হিংস্র খেলায় মাতিয়ো না। তাহার চেতনা, তাহার আত্মার অখণ্ডতা, আত্মবিশ্বাস, সব কিছুকে এমন ভাবে ভাঙিয়া চুরিয়া তাহাকে মিথ্যা করিয়া দিয়ো না। উহার তুলনায় মৃত্যুও বুঝি তেমন অগৌরব নয়।

জীবনই গোপনে গোপনে আশ্বাস বহিয়া আনিল.. সামান্য এক সার পিপীলিকা। নির্জন কক্ষে জীবনলীলার সেই কাহিনী জানিয়া বুঝিয়া—দেখিয়া দেখিয়া—অমিত আপনার মধ্যেও আপনার অজ্ঞাতে একটা আশ্বাস সংগ্রহ করিতে চাহিল।

প্রহরে প্রহরে প্রহরী পরিবর্তিত হয়। সতর্ক দৃষ্টিতে তাহারা সন্ধান করে অমিতের কক্ষ, সন্তর্পণে দেখিয়া যায় 'আসামী' কোথায়। অমিতকে তাহারা বিরক্ত করিতে চাহে না, নিজেরাই শুধু নিশ্চিন্ত হইতে চায়। অমিত শোনে, কোথায় দূরে ঘণ্টা বাজে—সুদীর্ঘ মিনিটের এক-একটা ঘণ্টা। দিন ফিরিয়া আসে। কাগজ নাই, কলম নাই, বইপত্র নাই;—পাওয়াও যাইবে না। দ্বার হইতে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিয়া যায়—অভিযোগ আছে কিনা। ডাক্তার কথা বলিতেও ভীত, তাহার চাহনি চকিত; কোনো কথায় 'হাঁ' নাই, 'না' নাই; ডাক্তার শুধু শুনিয়া যায়, টুকিয়া লয়, হয়ত যথানিয়মে জানাইয়াও দেয় সাহেব সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌টকে।—দিনের অস্পষ্ট আলোকে ইহারই মধ্যে একদিন অমিত আবিষ্কার করিল দেয়ালের কোণে মাকড়সা। সারাদিন আশ্চর্য হইয়া তাহা দেখিল। দেখে তাহার জালবোনা, সন্তর্পণ শিকার, কঠিন জীবন-সংগ্রাম,—কীট কবলিত করা, জীর্ণ করা, গ্রাস করা:—প্রাণকণার একটা অদ্ভুত প্রকাশ। খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাহা অমিত দেখে। একটা আত্মীয়বন্ধন গড়িয়া উঠিতে থাকে জীবলোকের সঙ্গে।

কিন্তু অন্ধকারও হাত বাড়াইয়া দেয়।

তারপর, ডাক্তারের হুকুমে 'আসামীর' ঘর পরিষ্কৃত হইল। দূর হইল পিপীলিকার সার ও মাকড়সার জাল—অমিতের আত্মীয় পৃথিবী। রহিল রাত্রির অন্ধকারের হিমশীতল মন্থর স্পর্শ। সে অন্ধকার কথা বলে না। কিছু বুঝিতে পারে না অমিত। নিজের চিন্তাকে অনুসরণ করিয়া চিন্তা চলে পিছনের দিকে, আবার চিন্তার অনুসরণের চিন্তা আসিয়া তাহা গুলাইয়া দেয়। স্মৃতিকে পুনর্জাগরিত করিয়া চলে পিছনে, ছেদ টানিয়া জাগিয়া ওঠে শুধু উদ্ভট স্বপ্ন। কেমন কানাকানি পড়িয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে, কাহারা কিলবিল করিতেছে।…বিনোদ বল? না, আই-বি অপিসের সেই বিড়ালটা তাকাইয়া আছে? তাহার জ্বলন্ত চক্ষু দুইটাই দেখা যায় শুধু। সেই 'মাধব'-মর্কটটা বুঝি মুখভঙ্গী করিতেছে; নামিয়া পড়িয়াছে তাহার ওষ্ঠ একদিকে। সরিয়া যায় বুঝি সেই ভূপেন-শৃগালটা, দাঁড়াইল গিয়া এক পার্শ্বে ওই অন্ধকারের মধ্যে।…মানুষকে চিনিবার বুঝিবার সকল সুস্পষ্ট চিহ্ন আরও

গুলাইয়া যাইতেছে। ক্রমে পুরুষে স্ত্রীতে, মাতায় আর দয়িতায়, মুখে আর চোখে, সম্ভাষণে আর সম্বোধনে, সব মিশাইয়া যায়। সব একাকার, সব অবাধ্য, সব বিশৃঙ্খল? অজ্ঞান মনের একি ছলনা! উন্মাদ হইয়া যাইতেছে বুঝি অমিত?...অখাদ্য ও ব্যাসিলারি ডিসেণ্ট্রি তাহাকে মুক্তি দিল শেষে অবাধ্য মনের হাত হইতে। তারপর জীর্ণ দেহ আবার বিশ্রাম পাইল এই জেলে সহযাত্রীর সাহচর্যে, রঘুর সেবায়, বই-খাতার স্পর্শে! দেহ বিশ্রামই পাইল, পাইল না স্বাস্থ্য।

চার মাস পরে পাহাড়ের কোলে বর্ষাস্ফীত ঝর্নার শব্দে, অনন্ত নক্ষত্র-খচিত আকাশ দেখিতে দেখিতে, গম্ভীর পর্বতরাজের নির্ণিমেষ দৃষ্টির তলে শুইয়া শুইয়া অমিত তখন বিষন্ন বিস্ময়ে ভাবিয়াছে—মৃত্যু কি এমনি করিয়াই আসে—পা টিপিয়া টিপিয়া, রক্তের মধ্যে একটু একটু করিয়া ক্লান্তি ঢালিয়া দিয়া, নির্ণিমেষ স্থির-দৃষ্টি শিকারীর মত? অমিত তাহাকে, কী বলিবে কী বলিয়া সম্বোধন করিবে?—'অত চুপি চুপি কেন কথা কও, ওগো মরণ, হে মোর মরণ?' বারে বারে অমিত বলিতে চাহিল 'ওগো মরণ, হে মোর মরণ'... নিশীথ রাত্রির দিকে তাকাইয়া, আকাশের নক্ষত্রাবলীর চুম্বন শিরে লইয়া, অনাদি অটল হিমাচলের পর্বতচূড়ার গাম্ভীর্যের সম্মুখে অবনত চিত্ত হইয়া, অমিত বলিতে চাহিল, 'তুমি এসো হে মরণ, হে মোর মরণ।' বারে বারে ভাবিল—বিবাহে চলিয়াছে 'বিলোচন,' আর 'সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল।' কিন্তু না, না, পাহাড়ীয়া পাখি ডাকিয়া ওঠে। অনাদি অচঞ্চল পর্বতের কোলে প্রভাতের চাঞ্চল্য জাগে, দিবারম্ভে প্রাণযাত্রার ওঠে বন্দীশালার অন্ধ অঙ্গনে,—টুংটাং শব্দ শোনা যায় তাহার চা-খানায়। শীতল হাওয়ার মধ্য দিয়া সেই পরিচিত পানীয়ের আঘ্রাণ ভাসিয়া আসে, শব্দ-গন্ধের স্বাদও বুঝি অমিতের পিপাসার্ত ঠোঁটে লাগিয়া যায়।...নির্বোধ ভুটিয়া ভৃত্য—অর্ধেক সে গবাদি পশুর মত মূঢ়,—ভুটিয়া হিন্দুস্থানীতে জানায় অমিতকে তাহার সুপ্রভাত, আনন্দ, বিস্ময়: 'বাবু, জিন্দা হায়?' কাল রাত্রিতেও তবে অমিত মরে নাই? তারপর, নাদু হাসিয়া উঠে 'হা-হা-হা—'। বুদ্ধিহীন মানুষের প্রাণখোলা হাস্য। পাহাড়ীয়া মানুষ তো নয়,—জীবনান্তযাত্রিক জীবনপ্রান্তাশ্রয়ী

অমিতের সম্মুখে নাছু যেন একটা জৈব রহস্য। কী সুডোল মাংসপেশী তাহার বাহুর চরণের; প্রশস্ত বক্ষের কী রূপ, স্কন্ধের কী বিশালতা! বুদ্ধিমুক্ত, চিন্তামুক্ত, জীব জীবনের—শ্যামল সতেজ পর্বত বনানীতে গর্জমান ঝর্ণার জলে, আত্মবিস্মৃত এই অর্ধমানুষের বুকে; দুনিয়ার নর-নারীর আশ্চর্য অদ্ভুত প্রাণলীলায়! অথচ, অমিত,—এত যে জীবন-সচেতন, এত যে জীবন মুগ্ধ, আকাশে আকাশে যাহার কল্পনা এখনো কাঁপিতেছে আলোক-তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে,—এই প্রাণলীলার মধ্য হইতে সেই অমিত তুমি খসিয়া পড়িতেছে—খসিয়া পড়িতেছে, খসিয়া পড়িতেছে!···

অমিতের বক্ষতলে প্রাণের শেষ প্রার্থনা রূপ ধরিয়া উঠিল:

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'

চোখের জল গালে গড়াইয়া পড়ে। এই পৃথিবী বড় সুন্দর; অপরূপ মানুষের মুখ—নির্বোধ ভুটিয়ার মুখও—অমিত যেদিন তাহা আপনার সমস্ত সত্তা দিয়া জানিল। আর তাহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। জীবনের মমতায় বুক ভরিয়া উঠিয়াছে।···

জীবনের মমতাতেই সে অমিত মরণকে ঠেকাইতে পারিয়াছে এইবার সেই জীবনের পরীক্ষা! বন্দিশালায় জীবন এতদিন বহিয়া গিয়াছে। সে গ্রহণ করিয়াছে, অর্জন করিবার অধিকার তাহার ছিল না! এইবার তাহাকে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে মুখামুখী করিতে হইবে—জীবনের সঙ্গে এইবার মুখামুখি করিতে হইবে···মূল্য দিয়া অর্জন করিতে হইবে—জীবন সত্য।

রঘুকে লইয়া জ্যোতির্ময় ও শেখর জিনিসপত্র অনেকটা গুছাইয়া ফেলিয়াছে, অমিতের জন্য তাহারা অপেক্ষা করে নাই। সাবানের খণ্ডটা রঘুকে দিয়া অমিত বলিল:—নে রেখে দে, গায়ে দিস্। বিছানাটা না হয় পরেই গুটাবে, জ্যোতি। যা পড়ে থাকে তা হোস্ট-অলে দেওয়া যাবে। দেখছিস রঘু, সম্পত্তি কম আদায় করিনি—ছয় বৎসরের রোজগার।—ট্রাঙ্ক ভরা শীত-বস্ত্রের কথা ছেড়ে দে, বাইরেও ছাখ রেন্ কোট, পেন, ঘড়ি, ছাতা, জামা, কত টুকিটাকি জিনিস এখানে ওখানে। আরও কত জিনিস বাঙলার বাইরেই ফেলে দিয়ে এসেছি নির্বাসনের বন্দীশালায়।

অমিত রঘুকে জিজ্ঞাসা করিল, কি নিবি বল ?

রঘু কিছুই চাহিতে জানে না। চাইয়াই বা লাভ কি ? জামা হোক্, জুতা হোক্, যাহাই সে পাইবে তাহা আসলে সিপাহি-ওয়ার্ডারদের কবলে যাইবে। অমিত বিড়ি ও তামাক পাতা সংগ্রহ করিবার জন্য জ্যোতির্ময়কে পাঠাইল। মুঠি ভরিয়া তাহা লইয়া রঘুকে দিতে যাইবে, এমন সময় ডাক শুনিল 'গিন্‌তি'।

'বড়সাহেবের ফাইল'। আজ এই 'খাতায়' বড়সাহেবের পরিদর্শনের দিন। অঙ্গনের ওধারে তাই রঘুদের এখন ফাইল করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে। এ খাতার কয়েদিদের আবদ্ধ থাকিতে হইবে। 'তফাৎ যাও, তফাৎ রহো'—কে জানে কে বড়সাহেবকে আক্রমণ করে ? বড়সাহেব চলিয়া গেলে আবার তাহাদের মুক্তি। অমিতের বন্ধুরাও চলিয়া গেল। আপন আপন আসনে থাকাই এই সময় বন্দীদের নিয়ম। এখন আর সে নিয়ম কারণে-অকারণে ভাঙ্গিবার জন্য শেখরের মত সদা-সংগ্রামকারী যুবকরাও উৎসাহ পায় না। তাহার প্রয়োজনও দেখে না। পদে পদে সংগ্রাম করিবার সাধ এত বৎসরে কোথা দিয়া তাহাদেরও লুপ্ত হইয়াছে। এই চেতনাও আসিয়াছে—সংগ্রাম মাত্রই 'স্বদেশী' কর্তব্য নয়। জ্যোতির্ময় নিজের আসনে ফিরিয়া গেল। ওদিকে লক্ষ্মীধরবাবু ব্যায়ামের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, আপাতত তাহা স্থগিত রহিল।

'সরকার ! এ্যাটেন্‌শন্'—একটা বিরাট কণ্ঠের বিকট ধ্বনি।

আঙিনা দিয়া মিছিল আগাইয়া আসিল। গম্ভীর সতর্ক পদক্ষেপে মার্চ করিয়া সম্মুখে চলিতেছে প্রথম ছয়জন সিপাহী ও স্পেশ্যাল জেলর, স্পেশ্যাল ডেপুটি জেলর। ইহার পরে স্বয়ং বড়সাহেব—বিশাল সুগঠিত-দেহ, পাঞ্জাবী, লেফ্‌টেনান্ট-কর্নেল পিণ্ডিদাস। মেডিকেল কলেজের বাঙালী ডাক্তার ইহারই বিদ্যাবত্তার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন অমিতের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে করিতে—এই লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাসকে 'পাঞ্জাবী ট্যাক্সিওয়ালা' বলিয়া। বলিষ্ঠ হস্তে বলিষ্ঠ যষ্টি, পাঞ্জাবী-সুলভ বিলাতিয়ানায় দেহ সজ্জিত, বলিষ্ঠ চোয়াল। বলিষ্ঠ মুখে কিন্তু অনুন্নত নাসিকা, ক্ষমতাগর্বিত দৃষ্টি। লেফ্‌টানেণ্ট কর্নেল পিণ্ডি-দাস প্রয়োজনবোধে সম্মুখে হাসিবেন, বন্দীদের আবেদন শুনিবেন, সুবিবেচনায়

সঙ্গে প্রতিশ্রুতি দিবেন! অপিসে গিয়াই তেমনি অতি অনায়াসে সেই প্রতিশ্রুতি অবজ্ঞা করিবেন,—হাসির প্রতারণায় বন্দীদের মনে জিয়াইয়া রাখিয়া যাইবেন একটা অবিশ্বাস নিজ নিম্নতন কর্মচারিদের প্রতি। কিন্তু লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাস মানী লোকের মান রাখেন—ব্যক্তিগত অনুনয়কে বেশ অনুগ্রহ ও শিষ্টাচারের সঙ্গে প্রশ্রয় দেন। অনেক সিনিয়র 'দাদার' মাথাও তাই 'সুপারের' সম্মুখে নুইয়া আসে; মুখে অনুগৃহীতের হাসি ফোটে। লেঃ কর্নেল যাচিয়া কাহারও অসম্মান করেন না—অপমানিত হইবার ভয়ে। প্রয়োজন না হইলে অন্যদের প্রতি ক্রুদ্ধ হন না—ক্রোধে দুর্বলতা প্রকাশ পায় বলিয়াই। ক্ষমতার তিনি অপব্যবহার করেন না; কিন্তু ব্যবহারের প্রত্যেকটি নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রেই ক্ষমতা ব্যাপক ও নিরঙ্কুশভাবে ব্যবহার করেন—স্ক্রুর প্যাঁচের মত আঁটিয়া আঁটিয়া। এই সার্থক কৌশলে কারা-পরিচালনা করিয়া তিনি ভাগ্যের চূড়ায় উঠিতেছেন—শুধু ক্লাবে সস্ত্রীক পাঞ্জাবী সামাজিকতার গুণে নয়। বলুক তাঁহাকে বিদ্যাবুদ্ধির জন্য বাঙ্গালী 'বেগার'গুলি 'ট্যাক্সিওয়ালা'।

ছয়জন সিপাহী আর জন তিনেক অফিসার-পুরঃসর লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাস ওয়ার্ড পরিদর্শনে আসেন—হয়ত অনাদিকালের কারা-ঐতিহ্য পালন করিতে। তাঁহার পিছনে সাদা-কাপড়ের বিস্তৃত রাজছত্র, কয়েদি-পুঙ্গব পেশোয়ারী হাসান খাঁ সেই ছত্রধারী! সাত ফুট উঁচু দেহের পঞ্চাশ ফুট উঁচু বুক, মুখে দৈত্যের প্রভুত্ব আর দস্যুর পাশবতা; পৃথিবীই পেশোয়ারী হাসান খাঁর পায়ের ভরে কাঁপে—জেল কাঁপিবে না কেন? তাহারই অন্যপার্শ্বে জেলের আসল মুনিব,—হেড জমাদার খাঁ সাহেব ফতে মহম্মদ। দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি আর সমাগত বার্ধক্যের পীড়নে তাহার সুগোল পরিপুষ্ট দেহ আর সচল থাকিতে চাহে না। অতি আয়াসে তাহাকে বড়সাহেবের পিছনে পা ফেলিয়া ছুটিতে হয়, পা মিলাইয়া-মিলাইয়া চলিতে হয়। আর তাহারও পিছনে আবার ছয়জন সিপাহীর সদর্প মার্চ। তবে ইহাদের মুখে একটু বক্রহাস্যের রেখা, বড় জমাদার খাঁ সাহেব ফতে মহম্মদের গতি-বিভ্রাটের দৃশ্যে ইহারা উৎফুল্ল। 'অজন্তা'র কোনো শোভাযাত্রা হইলে ফতে মহম্মদ অনায়াসে রাজবয়স্যের সম্মান পাইত। ইউরোপীয় কোন চিত্রকরের হাতে পড়িলে

ইংরেজ রাজের 'খাঁ সাহেব' ফতে মহম্মদ হইতেন স্যর জন ফলস্টাফ্,—বাক্যে নয়, জেদ বহরে। কিন্তু অমিতের চোখে এই শোভাযাত্রাটা একটা অদ্ভুত অসঙ্গতিরই জমকালো স্বাক্ষর। মোগল দরবারের কোন একটা টুকরা যেন 'বানিয়া রাজদের' জেলখানায় ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। বিলিতী টোপর মাথায় পরিয়া, বিলিতী স্যুটে দেহ মুড়িয়া বারো হাতী রাজছত্রের ছায়ায় প্রেসিডেন্সি জেলের 'বড়সাহেবের' এই দৈনন্দিন শোভাযাত্রা—এ যেন একটা কার্জনী দরবারের মতই ক্ষুদ্রতর কৌতুক-চিত্র। বণিক-রাজা বাদ্‌শাহী সমারোহে হাতি ঘোড়া, আমীর, ওমরাহ্ লইয়া বাহির হন—'নেটিবদের' ভক্তিতে ভয়ে অভিভূত করিতে হইবে। প্রাক্‌-কার্জনী আমল হইতেই এই মিছিলও চলিয়া আসিতেছে—এই লোহার গরাদ, লোহার ফটক, লোহার প্রহরণের মতই উহা অপরিবর্তনীয়। আর চলিয়া যখন আসিতেছে তখন কে তাহার রদ্‌বদল করে? লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাস কিংবা মেজর ডিক্‌সন্, যে খুশী উহারই মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়া যায়—'বড়সাহেবের ফাইল,' মিছিল তেমনি চলে বাদশাহী কায়দায়।

দ্রুত পদক্ষেপে পুরোরক্ষী ছয়জন সিপাহী ঘরে ঢুকিয়া অমিতকে পার্শ্বে রাখিয়া চলিল,—অর্থাৎ বড়সাহেব এবার এঘরে এদিকে আসিতেছেন।

লেঃ কর্নেল কিন্তু অমিতের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চলিয়া গেলেন না, অমিতকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন: গুড্ মর্নিং। তা হলে যাচ্ছেন?—প্রসন্ন সম্ভাষণ।

'মর্নিং। তা'ই মনে হয়।—অমিতও স্মিতমুখে বলিল। পৃষ্ঠরক্ষী সিপাহীরা এক পদ পিছনে সরিয়া সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে।

'মনে হয়,' মানে? ফিরে আসবেন নাকি আবার?—সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন লেঃ কর্নেল।

আর না।

প্লিজ্ ডোণ্ট্।—পরিহাসের কণ্ঠ নয়, সাধারণ মানুষের সহাস্য অনুরোধের স্বর,—আসবেন কেন? এখন আমাদের দেশের শাসন আমাদের হাতে আসছে—

'আমাদের দেশ' আর 'আমাদের হাতে'।—এই দেশকে এতকাল কোন দিন লেঃ কর্নেলরা স্পষ্ট করিয়া 'আমাদের দেশ' বলেন নাই। তাহা হইলে আজ 'আমাদের হাতে'র অর্থ কী তাহাও বুঝা দুঃসাধ্য নয়। অমিতের মনে বিদ্রূপ জমিয়া উঠিতেছিল। সে হাসিয়া বলিল: দেট্স্ ইয়েট্ টু বি সিন্… তা প্রমাণ সাপেক্ষ।

'প্রমাণ সাপেক্ষ' কেন?—কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেছে—

কিন্তু রাজত্ব লাভ করেনি।—অমিত বলিল।

রাজত্ব আবার তবে কার হওয়া চাই?—সাশ্চর্যে জিজ্ঞাসা করিলেন পিণ্ডিদাস।

দেশের মানুষের।

তার মানে? আপনারা সোবিয়েত রুশিয়া চান নাকি?—পরিহাসের মধ্যেও ঔৎসুক্য ফুটিয়া উঠিতেছে লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাসের।

না। সোবিয়েত ইণ্ডিয়া চাই।—অমিত উত্তর দেয়।

ধর্ম, ভগবান, আত্মা সব বরবাদ করে?—

ওসব ধার্মিকেরাই বরবাদ করেছেন, করতেও পারবেন। আমরা শুধু ব্যক্তিগত সম্পত্তিটুকুর বনিয়াদ বরবাদ করেই আপাতত থামতে পারি।

ওয়েল, ওয়েল, প্লিজ। এই গরীবের পেনসেন কেটে দেবেন না। উইশ ইউ গুড লাক,—বলিয়া আজ হঠাৎ হাত বাড়াইয়া দিলেন হাস্যপ্রফুল্ল লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাস। বন্দীদের সহিত 'বড় সাহেবের' করমর্দন একটা অভাবনীয় ব্যাপার।

করমর্দন করিতে করিতে অমিতও আজ প্রসন্নচিত্তে বলিল: ধন্যবাদ। কিন্তু অত টাকা দিয়ে আপনিই বা কি করবেন? একটা রিফর্মেটারি করবেন নাকি?

ওঃ হেল! ওসব মাথামুণ্ডুতে কি হয়? ক্রিমিন্যালস্ উইল বি ক্রিমিন্যালস্—আপনাদের সোবিয়েতেও। গুড বাই—

…'চোর চুরি করিবে'—শুনিল কি অমিত? প্রস্থানোদ্যত হইয়াছেন লেঃ কঃ পিণ্ডিদাস। তাই আবার একটা চাঞ্চল্য উঠিল সিপাহীদের স্থাণু মিছিলে।

গুড বাই।—জানাইল অমিত।

হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইলেন লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাস। জ্যোতির্ময়ের শয্যার দিকে জুতার শব্দ তুলিয়া মিছিল অগ্রসর হইল।

স্পেশাল জেলর শরৎ গুপ্ত একটু পিছনে পড়িয়া গেলেন, কানে কানে বলিয়া গেলেন অমিতকে ইশারায়ঃ বাড়িতেই—। খবরও পাঠিয়ে দিয়েছি।—খাঁ সাহেব ফতে মহম্মদের তীক্ষ্ম দৃষ্টি তাহা এড়াইল না—স্পাইং তাহার কাজ। কিন্তু তাহারও চক্ষুর মধ্য দিয়া একটু কোমল দৃষ্টি আজ খেলিয়া গেল বাবু আজ খালাস যাইবেন। আর অপেক্ষা না করিয়া স্পেশাল জেলর শরৎ গুপ্ত মিছিলে আপনার স্থান লইতে ছুটিলেন।

চতুর, বুদ্ধিমান, কিন্তু মন্দলোক কি, অমিত, এই শরৎ গুপ্ত? মন্দ লোক কি লেঃ কঃ পিণ্ডিদাস? কেমন বন্ধুভাবে করমর্দন করিয়া গেলেন। অমিতের সঙ্গে গল্প তিনি আগেও করিয়াছেন। কিন্তু বিস্মৃত হইতে পারেন নাই অমিত তাঁহার বন্দী; হোক তাহারা রাজবন্দী, তবু তাঁহারই বন্দী। আজও তিনি বিস্মৃত হন নাই—তিনিই এই পাতলপুরীর রাজাধিরাজ। সিপাহীর মিছিলে, রাজছত্রের উচ্চতায় ও প্রশস্ততায়, দুর্বৃত্ত শাসনের দুর্বৃত্ততর ভূত-প্রমথের অধীশ্বর হইয়া তাহা ভুলিবার অবসর কই লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাসের? তবু আজ তাঁহার বলিষ্ঠ হাতের সঙ্গে হাত সংযোগ করিতে অমিতের বাধিল না। করমর্দন করিতে করিতে অমিতের শীর্ণ করপত্র যেন একটা সত্যও মানিয়া লইল—বলিষ্ঠ এই হাত, বলিষ্ঠ মানুষের।—উহার মধ্য দিয়া মানব-প্রাণের করোষ্ণ স্পর্শও কি তুমি লাভ করিলে না, অমিত,—তোমার শীর্ণ হাতের শিরায় শিরায়?…

ঘর ছাড়িয়া মোগল মিছিল আঙিনায় আবার চলিয়া গিয়াছে। আবার উঠিয়াছে সেই বিকট কণ্ঠের বিকট চীৎকার—'সরকার—এটেনশান্।' …তফাৎ যাও, তফাৎ রহ। লে কর্নেল পিণ্ডিদাস জেল দর্শনে বাহির হইয়াছেন।

জ্যোতি ফিরিয়া আসিল, বলিলঃ আজ বুঝি খুব খাতির? একদিন শাস্তি দিয়ে এ জেল থেকে পিণ্ডিদাস আপনাকে পাঠিয়েছিল মরতে—

সে দিন ওরও যখন মনে নেই, আমারই বা মনে রেখে কি হবে?—অমিত হাসিয়া বলিল।

বিনা চিকিৎসায় আপনাকে যে প্রায় মরতে হচ্ছিল।

মরি নি তো জ্যোতি। আরও অনেক জ্বালাব ওদের অনেককে। সো, ফরগিভ এ্যাণ্ড ফরগেট।

নেভার। আই উইল নট্ ফরগেট্। আমি ভুলব না।

আমি ভুলব। না ভুললেই ভুল হবে।—অমিত বলিল।

আজ যাইবার মুহূর্তে কি মতভেদ হইবে দুইজনায়? এতদিন জ্যোতির্ময় অমিতের যে স্থিরতা ও সংকল্প দেখিয়াছে তাহা কি এখনি ভাঙ্গিয়া যাইতে শুরু করিল—বাহিরে পদার্পণের পূর্বেই? অমিত তাহার মনের কথা বুঝিয়াই তাড়াতাড়ি বলিল: এ্যাণ্ড 'আই উইল নট্ রেস্ট'।

এমনই সামান্য ভুলবোঝাতেই সুনীল অমন অবিচার করিয়াছে।

জ্যোতিরই আবেদন ইহা। রোলাঁর 'মাতাপুত্র' পড়িয়া রোলাঁর সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থ অমিতকে উৎসর্গ করিতে করিতে জ্যোতিই একদিন বলিয়াছিল—এই তোমার কথা হোক, অমিতদা, ঠিক এমনিতর অনির্বাণ আহ্বান। অন্য কিছু নয়, শ্রান্তি নয়, ক্লান্তি নয়, তা তোমাকে স্পর্শ করিবে না জানি। কিন্তু দেহের ওপর উৎপীড়নও করো না, বুদ্ধির অস্বীকৃতিও করো না। আমরা তোমার কাছে চাই আত্মার এমনি অঙ্গীকার, পৃথিবীর কানে এই অনির্বাণ আহ্বান,—আর চাই সৃষ্টি। শুনতে চাই এই দেশের 'বিমুগ্ধ আত্মার' কথা!···

'বিমুগ্ধ আত্মার কথা'? অমিত সে কথা হয়ত জানে, বোঝে। কিন্তু তাই বলিয়া সেই জীবন-সত্যকে সে সৃষ্টি করিতে পারিবে কি? অমিত জানে—পারিবে না। জ্যোতি তর্ক করিত—সেই সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতই বলিত,—তুমি পারবে না তো পারবে কে?—যারা দেখে নি সেই মানুষ, বোঝেনি সেই আত্মার আকুতি? কিন্তু দুইজনাই তাহারা একমত হইত, 'আই উইল নট রেস্ট',—ইহাই অমিতের উপর দাবী তাহাদের দেশের। আর এই মুহূর্তে অমিতের তাহাই ইহা আত্ম-ঘোষণা।

জ্যোতি উৎফুল্ল চিত্তে বলিল : তা হলে ?

কোনো খেদ নাই, জ্যোতি। আঘাত পাব না, তা তো সম্ভব নয়। পৃথিবীর বৃহত্তম অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার দুঃসাহস যখন রাখি, তখন বাইরে গিয়ে এই ক্ষুদ্র আর তুচ্ছ ঘটনাগুলি মনে পুষে নিয়ে বেড়াব নাকি ?

সবই কি তুচ্ছ ? সবই কি ক্ষুদ্র ?

একবারের মত স্তব্ধ হইল অমিত। রক্তাক্ত অন্তর এক-একটি ছিদ্রমূল দিয়া এখনি উচ্ছ্বিত হইয়া পড়িবে।···হিজলির, বহরমপুরের, আর শেষে নির্বাসনের বন্দিশালায় মানবাত্মার বেদনা বিদীর্ণ আত্মদান,—বাহিরে গৃহে গৃহে অশ্রুমুখী মাতৃমুখ·· তোমার মায়ের মুখ, অমিত, গ্রামে-গ্রামে শরবিদ্ধ শত শত মায়ের বুক···সবই কি তুচ্ছ ?

অমিত বলিল : না। সবই তুচ্ছ হ'ত—যদি আমরাও তুচ্ছ করবার মত হতাম। আমাদের সত্য অমর বলেই এদের মিথ্যাও এত বর্বর।—একটু থামিয়া অমিত আবার বলিল : আর যতটা বর্বর তার চেয়েও বেশি হাস্যকর, তাই না ?—কৌতুক ফুটিয়া উঠিল এবার অমিতের চোখে : ব্যাপারটা ভেবে ছাখো একবার, জ্যোতি। 'বড়সাহেবের' ভারী 'গোসা'—সেদিন আপিসে এসে বললে তাঁর অর্ডারলি সিপাহী। কারণটা কি জানো ? একটু বেশী রাত্রিতে কাল ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরে মেম সাহেবের সঙ্গে সাহেবের হয় কলহ। এ কি কাণ্ড সাহেবের ! প্রতিদিন তাসের টেবিলে এতটা হারা—এ হলে সংসার চলে ? সাহেবও হেরে গিয়ে গিয়ে মনে মনে নিজের ওপরে ক্রুদ্ধ। কিন্তু স্ত্রী ঝঙ্কার দিতেই ক্ষেপে উঠলেন, 'সংসারটা কি রকম ? অতটা করে ড্রিংক্‌স্‌ গেলা মেয়ে-মানুষের, আর এবয়সেও ক্লাবে অমনি ফষ্টিনষ্টি ছোকরা ক্যাপটেন ও ছুঁড়িগুলোর সঙ্গে।'—ক্রমে একটু প্লেট ভাঙ্গাভাঙ্গি—বেশী কিছু নয়। সকালে উঠে সাহেব দেখলেন—মেম সাহেব নেই চায়ের টেবিলে ;—তিনি উঠবেন না এখনো ; তাঁর শরীর ভাল নেই। বেয়ারা চা ঢাল্‌ছে। অমন কেচে-যাওয়া রাতের পরে এমন চা ভালো লাগে কারো ? তবু কালকের পরে আজ আর সাহেব রাগ করতে সাহস করলেন না। কাজে আসবার জন্যে তৈরী হতে গিয়ে দেখলেন—গিন্নী কালি ভরে ফাউন্‌টেন পেনটা সাজিয়ে

রাখেন নি। টাইটা বেছে ঠিক করে রাখেন নি। বিরক্তিকর সংসার! পৃথিবী একটা বিশ্রী ব্যাপার! আপিসে এসেই আজ চোখে পড়ল চেয়ারের হাতলে, ঘরের কোণে—ধুলো। সব ঢিলে দিয়েছে। কড়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তিনি, তবু তাঁরই পিছনে পিছনে এত ঢিলেমি! গর্জন করে উঠলেন বড়-সাহেব, সবাইকে তিনি 'স্যাক' করবেন আজ। এর পরে ফাইল নিয়ে গেলেন স্পেশ্যল জেলর।—একখানাকে তাই আরও তিনখানা করে তাঁর কইতেই হয় এ অবস্থায়। আর অথ ফলম্: রঘু ওড়িয়া হলে;—'স্ট্যাণ্ডিং হ্যাণ্ডকাপ, ডাণ্ডা, বেড়ি।' অমিত কি জ্যোতির্ময় হলে—'ডাক বন্ধ, বইপত্র বন্ধ, চিকিৎসা বন্ধ।' তাতে হয়তো হ্যাণ্ডকাপে রঘু ওড়িয়ার হাত বেঁকে যাবে। আর আমার কি, তোমার রাজসাহী বা মেদিনীপুর জেলে অনিদ্রার সঙ্গে যোগ হবে হৃদযন্ত্রের লাফালাফি। কদাচিৎ এ কমিডি এসে ট্রাজিডিতেও ঠেকে। কিন্তু ব্যাপারটা মূলত কি? অল ওভার এ টি কাপ; স্টর্ম ইন দি টি কাপ। কাল রাত্রিতে যা হয়েছে হয়েছে, আজ সকালে যদি মিসেস্ সযত্নে চা ঢেলে দিতেন, তাহলে ঠিক উলটো স্নিগ্ধতায় ভরে উঠত এ জেলের সীমানা। দেখতে সব মাপ হয়ে যেত—রঘুর বিড়ি খাওয়া, আর তোমার আমার 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করে জেল ডিসিপ্লিন ভাঙা!

জ্যোতি হাসিল। না হাসিয়া পারিল না। বলিল: অতএব, ড্রিংক ইণ্ডিয়ান্ টি। আর শেষে ছোট্ট করে লিখে দিয়ো—'টি এক্সপান্শান্ বোর্ডের সৌজন্যে।'

যাই হোক। মনে রাখতেই হয় 'হোয়াট ডায়ার কন্সিকোয়েনসেস্ ফ্রম্ এমোরাস কজেস্ স্প্রিং'।

মনে রাখব—ভুলব না।

বেশ, এখন রঘুকে নিয়ে গুছিয়ে ফেলো সব। আমি বরং ততক্ষণ একবার সকলের সঙ্গে দেখা-শুনা সেরে আসি। আর ঠিকানাটা রঘুকে মুখস্থ করিয়ে দিয়ো—আমার ঠিকানা।

৫

বিদায়ের পর্ব।

সাধারণ ভাবে শিষ্টাচারসম্মত অভিবাদন ও শুভেচ্ছা বিনিময়—'নমস্কার! যাচ্ছি, জানি না কোথায়?' 'শুনছি বাড়ি',…এমনিতর। কোথাও একটু বেশি—'মনে রাখবেন, দেখা হবে, আশা করি আবার।' কোথাও বা 'ওর অসুখের খবরটা একটু পৌঁছে দেবেন কাগজে।' 'খবর পেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে হয়তো আমার ভাই, কিংবা বোন কিংবা আমার মাসীমা ;—মা আর পারবেন না হয়তো।' আর কোথাও আরও একটু বেশি—এ বিদায়ের মুহূর্তে আগামী দিনের কাজের কথা: 'এখন আর নতুন কি আছে বলবার? যা বুঝেছি – অন্য দিন, এবার অন্য আয়োজন, অন্য পরীক্ষা।' ইহারই মধ্যে কোথাও একটু সংক্ষিপ্ত সংযত স্নেহবিনিময়ও হয়। মথিত অতীতের কোনো একটি ছোট বা বড়, মহৎ বা গভীর অধ্যায়কে চক্ষে চক্ষে স্মরণ করিয়া নীরবে স্মৃতি বিনিময় চলে। কিন্তু আবার স্বচ্ছ কৌতুকে ঢাকিয়া দেওয়া হয় এই বিদায়ক্ষণকে।

এক-এক করিয়া অমিত তিনটি ব্যারাকের জন পঞ্চাশেক সতীর্থের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়াছে। অনেকেরই অনেক কথা রহিয়াছে। তাহার পূর্বেও অনেকে মুক্তিলাভ করিয়াছে; সেই 'অনেক কথা' তাহারাও শুনিয়া গিয়াছে। তবু অমিতকে 'কিছুটা' শুনিতে হয়—'বেশি' বলিবারই বা 'বেশি' প্রয়োজন কোথায়? সবাই এবার বাহিরে যাইবে তো—ক্রমে ক্রমে।

শশাঙ্কনাথ অমিতকে আলিঙ্গন করিয়া সংবর্ধনা করিলেন, নিজের শয্যার পার্শ্বে লইয়া বসিলেন। তাঁহারও মুক্তির দিন নিশ্চয় সন্নিকট। তথাপি তাঁহার প্রসন্ন সুন্দর মুখের হাসিতে বিষাদের একটি সস্নেহ রেখা ফুটিল। এমনি অমিত তাহা ফুটিতে দেখিয়াছে, অমিতের চোখের সম্মুখে দিনের পর দিন গত চার বৎসর ধরিয়া এমনি তাহা ফুটিয়াছে। অমিত এই হাসির ইতিহাস

জানে ; এই হাসির মধ্য দিয়া একটি মানুষের ইতিহাসকেও সে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। না, না, এই হাসির মধ্য দিয়া তাহার অপেক্ষাও বেশি সে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। একটি মানুষকে, একটি যুগকে আর একটি যুগান্তরকেও। এই প্রসন্ন-চিত্ত মানুষের শুভ্র কৌতুকের হাসি—সমস্তক্ষণ মুখে লাগিয়া-থাকা এই হাসি—ইহা তাহার অন্তরাত্মার আলোক। অমিত দেখিয়াছে কেমন করিয়া একটু একটু করিয়া এই হাসি আপনাকে না হারাইয়াও আপনার মধ্যে খুঁজিয়া পাইল বিষাদের বেদনার ছায়াশ্যাম একটি সকরুণ রেখা। সেই আত্মার সহজ আনন্দের মধ্যে ক্রমে জিজ্ঞাসা জাগিল, সে আনন্দ গভীর হইল, গভীরতর হইল জিজ্ঞাসা। তারপর—আরও শেষে—মন্থন-শেষ সমুদ্রের মতো তাহা স্থির নিশ্চল হইল সুগভীর বেদনায়, লুণ্ঠিত সুধার চেতনায়, কুণ্ঠিত জীবনের অসম্পূর্ণতায়, হারানো যৌবনের অবহেলিত দানের অনুশোচনায়। শশাঙ্কনাথের মুখের হাসি মুছিয়া গেল না, তবু তাহার মধ্যে একটি দীর্ঘশ্বাসভরা বেদনার রেখা স্ফুরিত হইয়া উঠিল।—অমিত দিনের পর দিন তাহা দেখিয়াছে।

একটি মানুষ নয়,—ইহা একটা যুগের ইতিহাস। জীবনকে তাঁহারা বড় কঠোর সাধনারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আদর্শে—রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধ স্বীকার করিলেই স্বাধীনতার সাধনায় পরাজয় হইবে। পরাজিত জাতির সর্বপ্রয়াসেই পরাজয়ের বিভীষিকা ; গৃহে, সমাজে, সংসারে তাহার চারিদিকেই যেন পরাজয়ের সূক্ষ্ম আর স্থূল নানা জটিল জাল। কি করিয়া সে এই জীবনকে সহজরূপে, স্বচ্ছন্দে, অনায়াসে গ্রহণ করিবে?—আশ্রম করিয়া, সেবা করিয়া, লাইব্রেরি গড়িয়া, শিক্ষাদান করিয়া ছোট বড় নানা বালকের সাহচর্যে এই উপবাসী চিত্তকে সজীব ও সরস রাখিতে রাখিতে—১৯১৬এর মতো ১৯২৫এর মতো এবারেও যখন শশাঙ্কনাথ বন্দিশালায় আসিয়া পৌঁছিলেন তখন সচকিত হইয়া দেখিলেন এই বায়ুমণ্ডলে এবার নতুন হাওয়া বহিতেছে। পৃথিবীর নানাদেশের ইতিহাসকে চমক লাগাইয়া এই দেশের সেই মায়া-মমতাময়ী মেয়েরাও ছেলেদের বীরত্বপনার সঙ্গিনী হইয়া দাঁড়াইতেছে। নতুন রঙের ছোপ লাগিয়াছে 'স্বদেশী' তরুণদের সে কাশের শুভ্র উত্তরীয়ে, নেশা লাগিয়াছে স্বদেশীতে। জীবনকে যাঁহারা অস্বীকার করিয়াছিলেন সেই

প্রৌঢ় তপস্বীর দল আরও উদ্ধতভাবেই ইহাকে বাধা দিবার অসাধ্য সাধনায় লাগিলেন। কিন্তু বাঁধ ভাঙিয়া পড়িতেছিল, ভাঙিয়া গেল। সেন্‌সরের উন্মোচিত স্লুইস্ গেট দিয়া তখন অবাধে জেলে ঢুকিয়া পড়িল একদিকে মার্কস-এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক গ্রন্থ, পুস্তিকা, সাহিত্য ; অন্যদিকে ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের যত বৈজ্ঞানিক আর অপ-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, কামকলার চিত্তাকর্ষক উপকরণ। বছর দুই পরে অবশ্য মার্কসীয় চিন্তার উপরে আবার এই স্লুইস্ গেট নামিল ; কিন্তু যৌনবিজ্ঞানের গ্রন্থ-প্রবাহে বাধা রহিল না। তাহার তাপে তপ্ত অবরুদ্ধ নির্বাসন-গৃহের বায়ু মথিত হইতে লাগিল।

'আগুন লইয়া খেলা'—কি উহার অর্থ ?—সেন্‌সরের পাশ-করা বাঙলা উপন্যাস্ হাতে লইয়া বন্দিশালার অধ্যক্ষ ইংরেজ মেজর বাঙালী কেরানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কেরানীবাবু ইংরেজি করিয়া বলিলেন : প্লেইং উইথ ফায়ার, স্যর।

প্লেইং উইথ ফায়ার ? এ-বই পাশ করলে কে ?—অগ্নিমূর্তি সাহেব।

ভয়ে কেরানী বিবর্ণ। গোয়েন্দা-সেন্‌সরের শনিদৃষ্টিতে 'চলন্তিকা' 'কালচার অ্যাণ্ড এনার্কি' হইতে এম-সেনের পোলিটিক্যাল ইকোনমির নোট পর্যন্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। তাহারও উপর আবার আপত্তি সাহেবের ! কিন্তু বাঙালী কেরানীও সাহেব চরাইয়া খায়, সে তাড়াতাড়ি বলিল : নভেল, স্যর, নভেল। 'ফায়ার মিন্‌স্ হিয়ার 'উমেন'। প্লেয়িং উইথ উমেন—

আঃ।—ইজ্ ইট ? দাও, দাও, এ মুহূর্তে দাও এ বই পড়তে ওদের। মেক্ ইট্ কমপালসারি ফর অল্ ডেটিন্যুজ্ ! সবকে পড়তে হবে।

অতএব উম্যান লইয়া না হউক ফ্রয়েড লইয়া খেলা চলিল—অবাধ, উদ্ধত। আর সাহিত্যের ঝরিয়া-পড়া পাতা হইতে আসিল মন দেওয়া-নেওয়ার রোমাঞ্চিত রোম্যান্‌স্, বাঙালী অশ্বত্থমার দুগ্ধপান।

নৃপেন্দ্র দত্তের, বৈদ্যনাথ বাঁড়ুজ্জের মত প্রৌঢ় প্রবীণদের পঞ্চাশের ওপারবর্তী ভ্রূকুটি আর পঁচিশের এপারস্থিত অনুগামী যুবকচিত্তকে শাসনে রাখিতে পারে না। সেই বহুদিনের শাসন-অভ্যস্ত প্রবীণ চিত্ত আহত হয়। কিন্তু তাঁহাদের প্রস্তরিত জীবন-প্রাকারেও ক্ষয় দেখা দিল, এখানে-ওখানে ধস ধরিল,

জীর্ণ কাটলের মধ্য দিয়া অস্বীকৃত যৌবনের নিরুদ্ধ কামনা খসিয়া উঠিতে চাহিল।

বীরেনটা এসব কাণ্ড করিয়াছে নাকি?—আগেকার সেদিন থাকিলে বদ্যিনাথ বাঁড়ুজ্জে উহাকে বলিই দিতেন। বলি এখনো দিবেন—চোখে বোদে-দা কম দেখেন আজ—ছানি পড়িতেছে অকালে,—জীবনের অনেক নিপীড়নে, আয়ুক্ষয়ে;—তবু অনাচার সহিবেন না। নরবলিটাই আবার প্রচলিত করিতে হইবে বৈকি। না হইলে এই সব মার্কসিস্ট নাস্তিক আর চরিত্রহীনদের হাতে নৃপেন্দ্র দত্তরা দেশটাকে ছাড়িয়া দিবেন নাকি?

কিন্তু বুঝিতে বাকি থাকে না—আদর্শের সেই দৃঢ় সুনিশ্চয়তা নৃপেন্দ্র দত্তের মনেও আর নাই। ওই মন্থর, শ্লথ, স্থূল মানুষটির মধ্যে যে হৃতচেতন যুবক যৌবন হইতেই মরিতে শুরু করিয়াছিল আজ এই আবহাওয়ায় সে-ই অসময়ে আবার জীইয়া উঠিতেছে: 'বারীনদা' কাণ্ডটা করিলেন কি? আহা, তাঁর বয়স তো আমাদের অপেক্ষাও বেশিই হবে!

অতএব বারীনদার অপেক্ষাও বয়স যাঁহার কম—তাঁহার নিজের হিসাবেই অবশ্য কম—সেই নৃপেনদারও দিন আছে— না, সংসার বাঁধিবার কথা তিনি ভাবিতেই পারেন না, তিনি 'স্বদেশী', 'কর্মযোগী'।

জগন্নাথ চৌধুরী পরিহাস করিল। 'জগা' নৃপেন্দ্রের এককালের সহচরদের কনিষ্ঠভ্রাতা, তাই বরাবরই সে একটু আদরের—'দাদার' সহিত ইয়ার্কিও দেয়। বৎসর সাত আগে অগ্রজের মত 'জগাও' বিবাহ করিয়াছে। তরুণী ভার্যার কথা তাই এখন বলিবার জন্য তাহার এখানে-ওখানে ছুটিতে হয়, যাইতে হয় কুতূহলী বয়ঃকনিষ্ঠদের রসালাপের আড্ডায়। আবার কখনো ফিরিয়া আসিতে হয় সসম্ভ্রম আনন্দ উপভোগের জন্য প্রৌঢ় নিপুদাদের পাশার বৈঠকে। জগন্নাথের সরস পরিহাসটা কিন্তু শেষ করিতে হয় না: 'বারীনদার পরেই নৃপেনদা।' 'নৃপেনদা' গম্ভীরকণ্ঠে চোখ তুলিয়া ডাক দেন—'জগা'! তারপর গম্ভীর হন নৃপেন্দ্র দত্ত। কিন্তু বুঝা যায় সেই স্থূল মানুষের স্থূল অন্তরাবেগ ও চিন্তার মধ্যেও এই প্রশ্নটা ইতিপূর্বেই মাথা তুলিয়া উঠিয়াছিল—তাহা হইলে নৃপেন্দ্রনাথেরই কি সময় একেবারে বিগত? বদ্যিনাথ বাঁড়ুজ্জের অবশ্য কথা ওঠে না।

মুশকিল এই, নৃপেন্দ্র দত্ত-বঙ্কিনাথ বাঁড়ুজ্জেরা সেই প্রশ্নের বাণবিদ্ধ দেহ ও মন গোপন করিতেও জানে না। এ-জাতীয় বিড়ম্বনা সহিবার জন্য তো তাঁহাদের কালে তাঁহারা দেহমনকে প্রস্তুত করেন নাই। তাঁহারা জানিতেন পুলিশের সূচ নখের তলে বসিবে, ব্যাটনের গুঁতায় নাক দিয়া মুখ দিয়া রক্ত পড়িবে, সাহেবের সবুট লাথিতে প্লীহা বা যকৃৎ ফাটিয়া যাইবে, হাত-কড়া পরিয়া মুখ বুজিয়া তাহা সহিতে হইবে,—সহিতে হইবে শেষ দিনের রজ্জুর কণ্ঠালিঙ্গন। কিন্তু এ কি হইল?—এই অলক্ষ্য শরাঘাত, এই শব্দভেদী অস্ত্রপীড়া, অতনুর অদৃশ্য রজ্জুর এই টানা-হেঁচড়া—এ কি দুর্দৈব! তরুণদেরও বুঝিতে বাকি থাকে না নৃপেন্দ্র দত্তের, বঙ্কিনাথ বাঁড়ুজ্জের অন্তরে বাহিরে ফাটল ধরিয়াছে—আর তাহা জোড়া লাগিবে না। পঞ্চাশের দিক হইতে ষাটের দিকে চলিবে আয়ু; ভুলিয়া-যাওয়া যৌবনের ভুল আরও জীর্ণ করিয়া তুলিবে মনের চারিকোণ; আরও অসহায়, আরও বিড়ম্বিত, আরও পরাজিত, আরও পরিত্যক্ত সেই ভগ্ন দেউলের মধ্যে তখন জীর্ণ খণ্ডিত ক্ষয়িত হইবে নৃপেন্দ্র দত্ত, বঙ্কিনাথ বাঁড়ুজ্জে—প্রাক্-মহাযুদ্ধাকাশের অখণ্ড অটল এই দুই 'স্বদেশী' সাধক।··

দেউল ভাঙিয়া পড়িতেছে; কিন্তু দেবতাও কি ছাড়িয়া যাইতেছে সেই দেউল?···

অমিত এই প্রৌঢ়দেরও বন্ধুস্থানীয়। কেমন একটু করুণ বেদনায় তাঁহার মন ভরিয়া ওঠে। নিরঞ্জন বা চিত্তের সঙ্গে বসিয়া জগন্নাথ এই 'পঞ্চশরে দগ্ধকরা' অসহায় 'নিপুদা' 'বোদেদা'র সঙ্গে আপনার ব্যঙ্গ-চাতুর্যের কাহিনী বলে। কিন্তু শুনিতে শুনিতে অমিতের মন ভরিয়া যায় ভাঙা দেউলের ব্যথায়···

শশাঙ্কনাথ একদিন আসিলেন। একটু সময় হইবে কি অমিতের? 'একটু' কেন? শশাঙ্কনাথের জন্য তো অমিতের রাত্রিদিন সর্বক্ষণ মুক্ত। অমিত পরিহাস করে নাই। সত্যই এমন সানন্দ মানুষের সঙ্গে কথা বলিলে মন জীইয়া ওঠে। কিন্তু উহার সময় কোথায়? তাঁহার সহিত অমিতের দেখা হয় সামান্য এই দৈনন্দিন ভ্রমণের সময়টুকুতে। শশাঙ্কনাথ থাকেন এক ছাউনিতে—অমিত অন্যটায়; মধ্যখানে কাঁটা তারের বেড়া ও পাহারা।

শশাঙ্কনাথ বলিলেন : তাই তো মুশকিল—দেখাই হয় না। কিন্তু একটু সাহিত্য পড়াতে পার ?

সাহিত্য ? আমি পড়াব আপনাকে ?

অমিত নাম করিল—নিরঞ্জন ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাশ আর সুবোধ বাঙলায়। শশাঙ্কনাথ তাহা স্বীকার করিলেন ; কিন্তু তিনি শুধু পড়িতে চাহেন না—বুঝিতে চাহেন। এবার বেদনার হাসি তাঁহার মুখে।—ফিলজফি হইতে, ইতিহাস হইতে, জীবনকে ছাঁকিয়া লইয়া তিনি তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন—সে বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্বে। বুঝিয়াছিলেন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। বুঝিয়াছিলেন সে মিথ্যা অনিত্য বটে, কিন্তু অনিত্যের মধ্যেও নিত্যই রূপায়িত হয়। ভাবময় সত্য ইতিহাসের ঘটনার পরিচ্ছদ বুনিয়া-গাঁথিয়া আবার টানিয়া-ছিঁড়িয়া এমনি করিয়াই নিত্য প্রকাশিত হইবে,—ইহাই জানিতেন শঙ্কর-হেগেল-পাঠী শশাঙ্কনাথ। নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়া, 'চিত্তবৃত্তির নিরোধের' মধ্য দিয়া সেই নিত্যলীলার রহস্য উদ্‌ঘাটনেই তাঁহার আত্মোপলব্ধি—আর ভারতের সভ্যতার আত্ম-প্রতিষ্ঠা। ইহাই ছিল সেদিন তাঁহার তপস্যা।

বড় কর্মের মধ্যে যাই নি, ভাই। আমি ছিলাম তোমাদের কর্মযোগের নেপথ্য-শালায়—নিষ্কাম সাধনার দীপশিখা জ্বালিয়ে। কিন্তু যে আলোক আমার ছিল তা নিষ্কাম বুদ্ধির নয় ; ভালোবাসার।

জন্ম-মিশুক মানুষ শশাঙ্কনাথ। মানুষ পাইলেই খুশী। তাঁহার ভালো লাগিত মানুষের মুখ, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। কৌপীন আঁটিয়াছেন ; তবু কঠোর হইতে পারেন নাই,—কাহারও উপর তিনি কঠোর হইতে পারিতেন না। কেহ দোষ করিলে দুঃখ পাইয়াছেন ; তাহার হইয়া বড়দের তিরস্কার সহিয়াছেন। আবার অপরাধীদের যখন সেই দোষ সংশোধন হইল না দেখিয়াছেন, তখন নিজের মনে আরও দুঃখ পাইয়াছেন। মানুষকে তিনি চিনেন না—বন্ধুদের এই তিরস্কার বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু এইবার তাঁহার পঁয়তাল্লিশ বৎসরের সীমা হইতে মনে হইল—মানুষকে কি ইহারাই কেহ চিনিয়াছেন ? কাহাকে চিনিয়াছে কে ?—'ইতিহাস পড়ি, দর্শন পড়ি, সভ্যতার মূল্য বিচার করি—কিন্তু কি দিয়ে ?'

অমিত বলিতে চাহিল : বৈজ্ঞানিক চেতনা চাই, শশাঙ্কদা।

বাধা দিলেন শশাঙ্কনাথ : না, না। বিজ্ঞান সত্য, কিন্তু বিজ্ঞান যথেষ্ট নয়। সে তো দর্শনের ইতিহাসের আর-এক নাম। মানুষকে, বলিতে লাগিলেন—মানুষকে লসাগু-গসাগু করিয়া বিজ্ঞানও তত্ত্বে গিয়া পৌছিয়াছে। কতটা স্নায়ু-তন্ত্রীর সঙ্গে কতটা রক্তমাংস মেদমজ্জা মিশাইয়া পাকাইয়া কি দাঁড়ায়—বিজ্ঞান তাহার নামকরণ করে, হ্রাসবৃদ্ধি হিসাব করে, নিয়ম বানায়।

তত্ত্ব তো শুধু সত্যের অ্যানাটোমি। তাই না?—জিজ্ঞাসা করেন শশাঙ্কনাথ।

অমিত নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেছিল। শশাঙ্কনাথ স্ফূর্তিপ্রিয় লোক, কিন্তু অগভীর নন, তাহা অমিত জানে। কিন্তু কি বলিতে চাহেন আজ শশাঙ্কনাথ? তর্ক করিয়া অমিত বলিল : অ্যানাটোমিও বটে, কিংবা ফিজিওলজিও বটে। অথবা বায়োলজি। কিন্তু তাতে হল কি?

হল এই যে, এরা মানুষ ছাড়িয়ে অ্যাবস্ট্রাক্ট নীতিতে পৌছয়, পরে আর খুঁজে পায় না মানুষকে। তুমিই বলেছিলে একদিন একথা সাহিত্যের কথা বলতে গিয়ে—'সাহিত্য' শিল্প সেই মানুষকে, সেই জীবনকেই ধরে। তার নিষ্প্রয়োজনের খোলস ছাড়ায়, তার মেদমাংস আর আশা-আকাঙ্ক্ষাভরা সত্তাটাকে মুঠোয় চেপে ধরে; একেবারে চুলের মুঠোয় ধরে দাঁড় করিয়ে দেয় চোখের সামনে—'এই জীবন, এই মানুষ'—abstraction নয়, concrete, তত্ত্বকথা নয়—সত্যরূপ!—যাকে দেখি, ছুঁই, বুকে নিই, হাসি-কাঁদি, ভালোবাসি,—আর ভালোবেসেও অন্ত পাই না।' মনে আছে তোমার সেই কথা?

শশাঙ্কনাথের সুন্দর প্রসন্ন সেই আননে কেমন একটা পরিচ্ছন্ন উদ্ভাস, বেদনা ও উৎকণ্ঠা। বলেন, একে আমি চাই—এই মানুষকে চাই। তাই সাহিত্য পড়তে হবে, ভাই। সত্যকে অন্যপথে আমি পাব না; সে আমার পরধর্ম!

দুইজনার নতুন পরিচয়ের বনিয়াদ এইরূপে রচিত হইল। তাহার পূর্বেই শশাঙ্কনাথের নতুন চক্ষু ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ত্রিশ বৎসরের ভুল তো আর ফিরাইয়া লওয়া যাইবে না। শশাঙ্কনাথ আর ফিরিয়া যাইতে পারিবেন না

তাঁহার বিশ-বাইশ বৎসরের যৌবনে ; বিধবা মায়ের চরণ ছুঁইয়া বলিতে পারিবেন না,—'মা, তোমার জন্য দাসী আনতে যাচ্ছি।' বলিতে পারিবেন না কোনো একটি তুচ্ছ মানবদুহিতাকে আপনার সামনে বসাইয়া,—'তুমি সুন্দর'।—সংসারে এমন একটি নিভৃত মানব-ছায়াও নাই যাহাকে শশাঙ্কনাথ একবারের মতো আপনার সব কথা বলিতে পারেন।

যাকে সব বলা যায়—এমন মানুষ ; এমন একটি মানুষ। অমিতবাবু হাসছ তুমি মৃদু মৃদু। কিন্তু এই ভুল যেন তুমি কোরো না,—এ ভুলের কিন্তু সীমা শেষ থাকবে না আর পরে—

ভুল কোরো না···ভুল কোরো না, অমিত।

অনেক সন্তর্পণে আবার এই কথাটাই শশাঙ্কনাথ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। তখন অমিতের মাতৃবিয়োগের সংবাদ আসিয়াছে। মায়ের অতৃপ্ত সাংসারিক আকাঙ্ক্ষার কথা শশাঙ্কনাথ খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। কে এখন দেখিবে পিতাকে? বোন অনু? একদিন তাহারও সংসার হইবে—তারপর? তারপর? তারপর অমিত? তারপর?

অমিত হাসিয়া বলিয়াছে : আবার তারও পর?

শশাঙ্কনাথ তখন সাহিত্য হইতে, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের পাতা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন আপনার জীবনের উত্তর। আর অমিতের সঙ্গে বসিয়া আলোচনা করিয়া লিখিতে বসিলেন—নাওমি মিচিসনের মতো নয়, বাঙালী মায়ের মতো, বাপের মতো করিয়া—বাঙলা, 'আউটলাইন ফর্ বয়েজ অ্যাণ্ড গার্লস।'—যে ভাগ্নে-ভাগ্নীদের দুই-চার বৎসরের তিনি দেখিয়া আসিয়াছিলেন—যাহাদের দেখিয়াও আসেন নাই,—আগামী দিনের ভারতবর্ষ তো তাহাদের লইয়াই ; আগামী দিনের শশাঙ্কনাথের সংসারও তাহাদের লইয়া।

একদিনের ভুলের এই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি—আর একদিন ভালো না বাসিলে তাঁহার মুক্তি নাই।

শশাঙ্কনাথ শুধু একটা মানুষ নয়, একটা যুগও শুধু নয়, নতুন যুগের একটি সূচনাও—এ দেশের সাধনায় জীবন-স্বীকৃতি।

আজ অমিতের সঙ্গে দুই-এক কথা বলিতে বলিতে আবার শশাঙ্কনাথের

মুখে শুভ্র হাসি দেখা দিল। তারপর নিজেই বলিলেন : যাও, সকলের সঙ্গে দেখাশুনো শেষ করোগে। আর আমি স্নান সেরে আসছি, আবার দেখা করব। আর কি চাই ?

অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ—

অমিত ইঙ্গিতটা বুঝিল। মনে মনে মানিল। মুখে হাসিয়া কহিল, 'অসংখ্য'ই তা হলে ; একটি নয় ?—বলিতে বলিতে চলিল।

শশাঙ্কনাথ বলিলেন, এক না হলে অসংখ্য আসবে কোথা থেকে ?

রঘু আসিয়া জানাইল—ম্যানেজারবাবু ভাত নিয়ে আসতে ডাকিছেন।

চল—অমিত আগাইয়া চলিল।

নিরঞ্জন কি একটা লিখিতেছিল, অমিতের কণ্ঠ শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বহু দিনের বন্ধুত্ব তাহাদের। তাহারা সমসাময়িক কালের ছাত্র। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনে দুইজনাতে শুধু দৃষ্টি বিনিময়ের সম্পর্ক ছিল। নিরঞ্জন ইংরেজী পড়িত, অমিত পড়িত ইতিহাস। এখন সেই পরিচয় প্রীতির ও সেবার বন্ধনে সুন্দর হইয়াছে। এমন করিয়া নিজের হাতে অসুস্থ অমিতকে সুস্থ করিবার চেষ্টা আর কেহ করিতে পারে নাই। কিন্তু সেবা এই প্রীতির সামান্যতম একটি অংশ মাত্র। গল্প করিয়া, মৃদু হাস্যে কৌতুক পরিবেশন করিয়া যদি কেহ অমিতের সেই দিনগুলিকেও স্মরণীয় করিয়া থাকে তবে সে নিরঞ্জন ও চিত্ত। এক ছাউনিতে থাকিতেন নিরঞ্জন, অন্য ছাউনিতে অমিত, আর চিত্ত বছর দুই পূর্বেই বন্ধনমুক্ত হইয়াছে। হয়তো এখন সে স্বাধীন ; পরিবারের দুর্দশাভার আবার ঘাড়ে তুলিয়া নিজের উদ্যমে সংসার গড়িতেছে। কলিকাতায় থাকিলে সেও আজ অমিতকে দেখিতে আসিবে ; কলিকাতায় না থাকিলেও আসিবে—দুই দিন আগে কিংবা দুই মাস পরে। ··'যাকে সব কথা বলা যায়···নয় কি চিত্তপ্রিয় বন্ধু তেমন মানুষ ? অমিত বলিতে পারে না, 'না'। কিন্তু নিঃসংশয়ে, বলিতে পারে কি 'হাঁ' ? কাঁটাতারের কৃত্রিম জগতের কৃত্রিম জীবন-যাত্রার মধ্যে চিত্তের অপেক্ষা অমিত নিকটতম সখা আর

পায় নাই। পাইয়াছে সখা নয়—স্নেহভাজন অনুজ; কিন্তু তাহারা সখা নয়। যাহার সহিত চিন্তার বিনিময় স্বাভাবিক, রসবস্তুকে ভাগ করিয়া আস্বাদন করিলে আস্বাদনের আনন্দ বাড়িয়া যায়—এবং যাহার সহিত শিষ্টতার সুচিন্তিত সীমা ছাড়াইয়াও অন্তরঙ্গরূপে একটু আন-পার্লেমেণ্টারি উক্তি আর রঙ্গ-কৌতুকেও মুক্তি পাইতে পারে—অমিতের এমন বন্ধু নাই, চিত্ত ছাড়া ছিল না। নিরঞ্জন দ্বিতীয় ব্যক্তি। এই বন্ধুত্বের জন্যই কৃত্রিম দিন-রাত্রির অধিকতর কৃত্রিম মুখোস পরিয়া তাহাদের বেড়াইতে হইত না—নৃপেন্দ্র দত্ত ও বৈদ্যনাথবাবুর মতো,—জগন্নাথের মতোও। অমিতের দিনগুলি সহনীয় হইয়াছে, সুন্দর হইয়াছে—তিন বন্ধুর বুদ্ধি ও অন্তরের এমনি পরিচয়ে,—অমিতের, চিত্তের, আর নিরঞ্জনের। অমিতের মতো ছিটগ্রস্ত তো তাহারা নয়—এমন নিরেট পণ্ডিত। তাহাদের স্ত্রীপুত্র আছে। তাই বোধ হয় আহরণ করিতে পারে নাই বৈষয়িক মনোভাব, সার করিতে পারে নাই লাভক্ষতির গণনা, নিরাপদ গৃহকোণ ও নিশ্চিন্ত আরাম।

সংসারকে সার করে নাই—কিছুতেই নিরঞ্জন করিতে পারিবে না। এখনো সে শেক্‌সপীয়র খুলিয়া বসে, তাহার গভীর অন্তশ্চেতনা ইংরেজী কবিতার গভীর উজ্জ্বল রসধারায় অভিষিক্ত। আর সমস্ত অন্তরের তীব্রতা দিয়া সে ভালোবাসে বাঙলাকে—বাঙালী জাতিকে, বাঙলার এই নতুন কালচারকে। সে ইংরেজকে করে ঘৃণা, বাঙালী ছাড়া সমস্ত ভারতবর্ষের অন্য জাতিদেরই করে কৃপা। তাহার বুকভরা ঈর্ষার আর বিদ্বেষের যোগ্যতম পাত্র—ইংরেজ—অন্যেরা অনুকম্পার পাত্র। ‘ওদের মধ্যে ভদ্রলোক পাবে না। ওরা হয় নকল-নবাব ওমরাহ, নয় নকল-ইংরেজ; বাদ বাকি গোলাম, গরিব, অনুগ্রহভাজন। ভদ্রলোক নয়—সে গান্ধীই হোন আর জওহরলালই হোন; কিংবা হোন্ জিন্নাহ্। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র ওঁরা বুঝবেন না—ওঁদের মধ্যে জন্মাবে না সেই জলন্ত পুরুষকার—দেশবন্ধু বা সুভাষচন্দ্র। ভদ্রলোকের সমাজ ওসব দেশে নেই।’

নিরঞ্জন ‘বাঙালীর মিশানে’ বিশ্বাসী, ‘ভদ্রলোকের নেতৃত্বে’ আস্থাবান। তাহার অর্থ—বিশ্বাসী সে বাঙালী ভদ্রলোকের ‘ডিভাইন রাইট্ টু রুল’-এ।

অবশ্যই সেই অধিকার অর্জন করিতে হইবে—একদিকে এশিয়াটিক ঐক্যে জাপানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কে হাত মিলাইতে হইবে; অন্যদিকে জাপানীদেরই মতো প্রাণ দিয়া, রক্ত দিয়া, আর সাহিত্য শিল্পকলা দিয়া দিগ্বিজয় করিতে হইবে। বাঙালী তাহা করিতেছে; করিবে। সেই জন্য চাই—শক্তির সংগঠন, অর্থাৎ 'স্টর্ম ট্রুপারস'—বাঙালী 'স্টর্ম ট্রুপারস।' বাঙলা আসাম আর ব্রহ্মের উপর একটা রাজনৈতিক প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। আর তারপর কালচারাল কন্‌কোয়েস্ট্?—নিরঞ্জন পরিহাস-স্বচ্ছ কণ্ঠে বলে, 'একবার শরৎচন্দ্র পড়িয়ে ফেলব, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, সিন্ধী, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়ী সকলকে। দেখবে রাজলক্ষ্মী, অভয়া, কিরণময়ীকে দিয়ে মাত করে ফেলব ভারতবর্ষ। সব্যসাচী শ্রীকান্তরা যেখানে ফেল করবে, সেখানে জয়ী হবে পিয়ারী, কিরণময়ী, সাবিত্রী। বাঙালী রাজনীতি যা শক্তিতে অধিকার করবে, বাঙালী কালচার তাকে দেবে শ্রী।'

অমিত জানে ইহার সবটুকু পরিহাস নয়। আর জানে বলিয়াই উভয়েই জানে এই আন্তরিক বন্ধুত্বের মধ্যখানে কাঁটাতারের বেড়া দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া থাকিবে। অমিতের দৃষ্টিতে নিরঞ্জনের দৃষ্টিতে মিলিবে না; অমিতের পথে নিরঞ্জনের পথে ছাড়াছাড়ি অনিবার্য। সুনীল দত্ত তাই নিরঞ্জনকে দেখিলেই মুখ ফিরাইয়া লইত—'ফ্যাশিস্ত'। কিন্তু অমিত জানে—এ পথ হইতে ও-পথে তাহাদের মুখ চাওয়া-চাওয়ি চলিবে না, অথচ যে-কোনো শেক্‌স্‌পীয়ার-ও রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র-আলোকিত মধুর সন্ধ্যায় তাহারা যখন মুখোমুখি বসিবে—দুই দেশের দুই পথের মোড়ে,—তখনো অমিতের ও নিরঞ্জনের অন্তর মানিয়া লইবে তাহারা সতীর্থ, পৃথিবীর পথে না হোক—জীবনের নিত্যকার পথে, মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের ক্ষেত্রে, তাহারা সহযাত্রী।···আনত মুখখানি অমনি ফিরাইয়া লইত সুনীল দত্ত ··'তুমিও আসলে আমাদের নও, অমিতদা' ··

ভগ্নস্বাস্থ্য নিরঞ্জনের এবার দীর্ঘদিন ধরিয়া পারিবারিক শোক সহিতে হইয়াছে। দিনের পর দিন এই দূরের বন্দিশালায় তাহার কণ্ঠনালীর প্রদাহ আরম্ভ হইল, তারপর জ্বর। শেষে দেখা গেল শ্রবণশক্তিই সে প্রায়·হারাইতে

বসিয়াছে, কিন্তু তবু চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নাই। সম্প্রতি এখানে পীড়াটা এই প্রথম সরকারীভাবে গ্রাহ্য হইয়াছে। কিন্তু এখন মেডিকেল কলেজের বিশেষজ্ঞ সখেদে জানাইলেন—আর আসিলেন কেন? কোনো আশাই আর এখন নাই। নিরঞ্জন ম্লান বিষণ্ণ হাস্যে মানিয়া লইয়াছে এই দুর্ভাগ্য। শ্রবণশক্তি আর সে সম্পূর্ণ ফিরিয়া পাইবে না, উহার আট-আনি লইয়াই চলিতে হইবে। কোনো দিনই সে বাক্‌পটু নয়, শুধু বন্ধুগোষ্ঠীতেই গল্প করিতে পারে—কিন্তু তাহাও আর এখন পারে না। কথা যে কানে স্পষ্ট শুনিতে পায় না সে আলোচনা করিবে কিরূপে? সে ভাবে, মানুষের সঙ্গে কথা কহিবার মত মানুষ সে আর নাই। অবশ্য নিরঞ্জনের মন ভাঙে নাই, কিন্তু দেহ ভাঙিয়া গিয়াছে।

অমিত নিরঞ্জনের কাছে গিয়া দাঁড়াইল: তারপর?

ক্লান্ত মুখে শান্ত হাস্য ফুটিল: যাও।

অমিত বলিল: এসো তুমিও।—অমিত হাত ধরিল।

নিরঞ্জন হাসিল, বলিল, একসঙ্গে? যেতে দেয় কে বলো?

হাতের মধ্যে হাত কাঁপিয়া উঠিল। মৃদুভাবে মন্থরবাহী রক্তস্রোত শীর্ণ হস্তের মধ্য দিয়া অমিতের মন্থরবাহী রক্তস্রোতের সঙ্গে প্রতিবেদন জানাইয়া গেল।

অমিত বলিল, ছেড়েই বা থাকবে ক-দিন, দেখব!

চক্ষে চক্ষে চাহিয়া দুইজনে বিদায় লইল, এবার হইতে দুইজনে দুই দিকে চলিবে। কিন্তু দিন তো শেষ হয় নাই; চলার পথের পথিকদের ঐক্য তো এখনো প্রয়োজনীয়। বরং আরও তাহা নতুন করিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে সমস্ত পক্ষ হইতে। 'মস্কোও তাহা ঘোষণা করিয়াছে সেভেনথ্ কংগ্রেসে,' জানাইবেন বিভূতিবাবু, জানাইত সুনীল দত্ত,—জানে তাহা অমিত। আর বাঙালী 'স্টর্ম ট্রুপার', বাঙালী দিগ্বিজয়?…তাহা দুরাশার পরিহাস মাত্র ইহাও জানে অমিত। ইহাও নিরঞ্জন বোস বুঝিবে। কোথায় থাকিবে সেই স্বপ্ন যদি দুইজনা একসঙ্গে দাঁড়ায় ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের সহ-সৈনিকরূপে? সেই যুদ্ধের তাহারা সহযোদ্ধা ইহাই তো প্রধান কথা।

অনেকের সঙ্গে অমিতের দেখা হইল না। বিভূতিবাবুদের কোণটিতে কেহ নাই। বই খোলা রহিয়াছে, পড়িতে পড়িতে কোথাও তাঁহারা উঠিয়া গিয়া থাকিবেন। এখানে আসিয়াই ক্লাস খুলিয়া বসিয়াছে বিভূতি রায়, এই কয়দিনের জন্যও একটা ক্লাস চাই! কি পড়িতেছিল? অমিত সোৎসুক দৃষ্টিতে একবার দেখিল, 'লেনিনিজম্।' বিচার বিতর্ক সমালোচনা,—আর উৎসাহ, বন্দিশালায় দিনের পর দিন ইহারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ইহারা আজ কর্ম-মুখর, অন্যরা শ্রান্ত। অন্যরা জেলের বাহিরে যাইতেছে যেন একটা ব্যর্থতার বোঝা মাথায় লইয়া—ইহারা বাহিরে চলিয়াছে এক নতুন সত্যের উপলব্ধি লইয়া। তাই অসহিষ্ণুতা, উগ্রতা ও শ্রীহীনতা ইহাদের একদিন যেরূপ পাইয়া বসিতেছিল, আজ আর তাহা নাই। বিভূতিবাবুদের মতো আন্দামান-প্রত্যাগতরা এই সাম্যবাদের পথে আসিয়াছেন, আসিতেছে শ্রেষ্ঠ যুবকেরা, প্রাণবান বলিষ্ঠপ্রকৃতি মানুষেরা—অনেকেই প্রিয় বন্ধু অমিতের। তাহারা স্নেহভাজন কিন্তু অমিত তাহাদের সহিত যোগদান করে নাই। বিভূতিবাবুদের রাতদিন ক্লাস করিয়া পড়া চলিতেছে; লেখাও তাহারা শিখিতেছে; তর্কসভা করিতেছে। ইতিহাসের কলধ্বনি শুনিতেছে কি অমিত? এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?…অমিত, তুমি কি ইহাদের কেহ নও? সুনীলের সেই উগ্র তিরস্কার কি সত্য?

ভুজঙ্গ সেন নিজের ঘরেই ছিলেন। বড় ওয়ার্ডটা চট দিয়া ঘিরিয়া তিন-তিন জনের এক-একটি 'ঘরে' বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যেও নিজের একটু বৈশিষ্ট্য ও একাকিত্ব কেহ কেহ স্থাপন করিতে পারেন—তিনজনী বেড়ার মধ্যেও নিজস্ব একটি কিউবিক্‌ল্ রচনা করিয়া লন। অবশ্য কর্তৃপক্ষের আপত্তি না থাকা চাই। ভুজঙ্গ সেনের ক্ষেত্রে আপত্তির কারণ নাই। তিনি সম্মানিত 'দাদা', অন্যান্য বার তিনি ছিলেন 'গোরা ডিগ্রিতে', নিজের একটি সেলে থাকিতেন। এবারও দীর্ঘদিন ভারতের কোনো কারাগৃহে অবরুদ্ধ থাকিয়া এখন বাঙলার জেলে ফিরিয়াছেন। বন্দীমহলে তাঁহার অনুচর অনেক, সম্ভ্রম প্রায় পূজার সমতুল্য। অমিত বেশি পরিচয়ের সুযোগ পায় নাই, তবু অমিত ইহা বুঝিয়াছে সত্যই ভুজঙ্গ সেন পূজনীয় লোক। বিদ্যা আছে, বুদ্ধির

প্রখরতা আছে, ভুজঙ্গবাবুর বাক্যালাপে নূতনত্ব আছে।—বুদ্ধির অপেক্ষাও চতুরতা তাহাতে বেশি। নিক্তির মাপে তাঁহার আপ্যায়ন বাড়ে কমে—পাত্রভেদে, এবং নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী। তিনি ব্যক্তিত্ববান লোক। কিন্তু বুদ্ধিমান, চতুর, বহুদর্শী ভুজঙ্গ সেন ভুলিয়া গিয়াছেন এই সত্যটা যে, সত্যকারের বুদ্ধির প্রমাণ বুদ্ধির বাহাদুরিতে নয়, আত্মশক্তির প্রমাণ নয় আত্মশ্লাঘা।—হয়তো বহু বহু কাল ধরিয়া একনিষ্ঠ অনুচর-সমাজে আপনার অবিসংবাদিত বুদ্ধি ও শক্তির কথা শুনিতে শুনিতে ভুজঙ্গ সেন নিজেও বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন—তাঁহার শক্তি অতুলনীয় ; আর তাহা নিরঙ্কুশরূপে প্রকাশ করাই মানুষকে তাহা জানাইবার উপায়, তাহাতেই ব্যক্তিত্বেরও পরিচয়। সকলে তাঁহার কথা মানিবেই তো। কারণ সাধারণ মানুষ ব্যক্তিত্বহীন ; ব্যক্তিত্বের প্রকাশকে তাহারা না মানিয়াই পারে না। 'লোক' না 'পোক',—পূর্ববঙ্গীয় এই প্রবাদ তাঁহার নিজেরই স্থির অভিমত। লোকেতে ও পোকাতে কিছু তফাত নাই—তফাত ঘটে ব্যক্তিত্বের বশে। ব্যক্তিত্ব অর্থই—আত্মার বৈশিষ্ট্য। ভুজঙ্গ সেন অধ্যাত্মবাদী। তিনি তাই জানেন—যে সর্বাত্মা তাবৎ চরাচর ব্যাপিয়া প্রকাশিত,—অন্নময়, প্রাণময় কোষ হইতে উঠিতে উঠিতে প্রজ্ঞানময় চৈতন্যের মধ্যে যে আপনাকে উপলব্ধি করিবার মহাযাত্রা শুরু করিয়াছে——ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যেও তাঁহারই বিশেষ বিশেষ আত্মপ্রকাশ মাত্র। আর তাহাতেই বিশ্বের অভিব্যক্তি, ইতিহাসের প্রগতি, ব্যক্তিরও জন্মজন্মান্তর বাহিয়া এই অনন্ত সাধনার মধ্যে ক্রমিক আত্মবিবর্তন, বুদ্ধত্বলাভ, পরমচৈতন্যে প্রতিষ্ঠা। ইহাই দিব্যপথ, নব্য-ভারতের হিস্‌টোরিকাল্ আইডিয়ালিজম্ :—'ঐতিহাসিক বস্তুবাদ' বা পাশ্চাত্য দানব সত্য ইহা নয়। ব্যক্তিত্ব তাই শুধু ব্যক্তির পরিচ্ছদ নয়, উহা আত্মারই আত্মপ্রকাশ—এই 'আত্মবোধও' ভুজঙ্গ সেনের আছে। ইহাও জানেন তিনি—নিম্নতম প্রকৃতিকে ইহা মানাইয়া লওয়াইতে হয়,—প্রাণশক্তি দেখাইয়া, জ্ঞানশক্তি দেখাইয়া, বিজ্ঞান-বিভূতির সাহায্যে। যে প্রকৃতি যেভাবে গঠিত তাহাকে সেভাবেই আত্ম-প্রভাবে আনিতে হয়। এক কথায়—'চাল' দিতে হয়, ইহাই রাজনীতিতে ভুজঙ্গীয় অধ্যাত্মবাদ। ভুজঙ্গ সেন স্বল্পভাষী নন, একটু বেশি-ভাষীই—কিন্তু প্রয়োজন

হইলেও পাত্রভেদে। ভুজঙ্গ সেনের মুখে-চোখে চাতুর্য আছে, মর্যাদা নাই, কথায় দাম্ভিকতা আছে, গাম্ভীর্য নাই। এই চাতুর্যকেই তিনি বুদ্ধি বলিয়া জাহির করেন এবং দাম্ভিকতাকে ব্যক্তিত্বরূপে দাঁড় করাইতে চাহেন নাতি-সূক্ষ্ম আত্ম-কীর্তনে। স্বাভাবিক ভাবেও তিনি মানুষের চিত্তে মর্যাদা উদ্রেক করিতে পারিতেন; কিন্তু উহা উদ্রেক করেন 'চালের মাথায়' চলিয়া—আপনাকে সচেষ্টভাবে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া। একা স্বতন্ত্র তিনি থাকেন;—সকলের সঙ্গে আলাপও করিবেন না; কথা বলিবেন মাপিয়া মাপিয়া। না হইলেই ব্যক্তিত্ব সস্তা হইয়া যায়।

আসুন।

অমিত ঘরে ঢুকিতে হেলান-দেওয়া ডেকচেয়ারে ভুজঙ্গ সেন একটু টান হইয়া বসিলেন—উঠিয়া দাঁড়াইলেন না, দাঁড়ানো তাঁহার ব্যক্তিত্বের রীতি নয়। সেইভাবে বসিয়াই একবার হাত বাড়াইলেন কাঠের চেয়ারটা ছুঁইবার জন্য—অমিতকে তাহাতে বসিতে দিবেন, তাঁহার শিষ্টাচারের মাপকাঠিতে এইটুকু অমিতের প্রাপ্য।—বসুন।—ভুজঙ্গ সেন নাতিউৎসাহে বলিলেন।

কোথায় বসিবে, অমিত? অমিত বলিল, বসব না, সময় হচ্ছে।—

ভুজঙ্গ সেনের নিকটে আসিয়া অমিত চেয়ারের হাতলে একটা হাত রাখিয়া দাঁড়াইল। ভুজঙ্গবাবুর আর চেয়ারটা ছুঁইবার চেষ্টা করার প্রয়োজন রহিল না। অমিত দেখিল, সেই টেবিলের উপরে মাসারিকের 'মেকিং অব দি স্টেট্' রহিয়াছে। সাত দিন আগেও সেখানে অমিত তাহা দেখিয়াছে। সেদিনও বুক মার্ক যেখানে ছিল,—শতখানেক পৃষ্ঠার শেষে,—মনে হয় এখনো সেইখানেই আছে। পার্শ্বেই শ্রীঅরবিন্দের 'লাইফ্ ডিভাইন', ও হিট্‌লারের 'মাইন কাম্‌ফ্'; এডিংটনের 'নেচার অব দি ফিজিক্যাল ওয়ার্লড'; ও রাধাকৃষ্ণনের 'হিন্দু দর্শনের ইতিহাস'।

ভুজঙ্গবাবু বলিলেন: দশটায় যেতে হবে? এখন সাড়ে ন-টা? তা হলে তো আমারও সময় হয়ে এল স্নানের।—তবু চেয়ারের হাতলেই ততক্ষণ বসিয়াছে অমিত।

তারপর? ওটা কিন্তু করলেন না?—বলিলেন ভুজঙ্গ সেন।

আপ্যায়নের সূত্র হিসাবে ভুজঙ্গ সেন দিন পাঁচেক পূর্বে অমিতকে যুবকদের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তক তালিকা প্রণয়ন করিতে বলিয়াছিলেন। 'ঢুকাবেন না-হয় মার্কস লেনিনের বই তাতে।'

অমিত বলিল : না, না।

ভুজঙ্গ সেন বলেন, 'না কেন? পড়বে বৈকি ছেলেরা ওসব।'

পড়ুক কমিউনিজম্ ছেলেরা ;—ভুজঙ্গ সেন তাহাতে ভয় পান না। কি ভয়? যখন আমাদের দেশ, আমাদের অধ্যাত্ম-সম্পদ ও রাজনৈতিক আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া 'আমরা' প্রোগ্রাম দিব—'তখন তাসের ঘরের মতো ভেঙে যাবে এসব 'ইজম্'।'

অমিত জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তাঁহাকে, সে প্রোগ্রাম কোথায়? তৈয়ারি করেছেন কি?

রহস্য-সূচক হাসি হাসিয়া ভুজঙ্গবাবু জানাইয়াছেন—আছে। অমিতেরাও পাইবে। তবে জেলে নয়।—এখানে পলিটিক্স্টা কি? 'যেখানে দশ জনের মধ্যে ন জন স্পাই বা গর্দা মাল।'—ভুজঙ্গ সেন এই সব বাজে লোক লইয়া পলিটিক্স্ করেন না। তবে এখানকার ছেলেগুলিকেও তৈয়ারি করিতে হইবে। আর দেখাই যাউক না অমিতেরও বিদ্যাবুদ্ধি—সে ছেলেদের পাঠ্য-তালিকা কেমন প্রণয়ন করে। সেই পাঠ্য-তালিকারই তাগিদ এখন দিলেন ভুজঙ্গ সেন।

অমিত চেয়ারের হাতলে বসিয়া জানাইল, পুস্তক-তালিকা তৈয়ারি করিবার সময় সে আর পাইল না। আর, উহার প্রয়োজনই বা কি আছে? যুবকেরা সকলেই তো চলিয়াছে।

তাও ঠিক। আর তা ছাড়া এবার নিয়ে দেখলাম এতবার। শতকরা দশটিও টিকে না—জেলের পলিটিক্স্ জেলেই শেষ।

ভুজঙ্গবাবু নিজের অভিজ্ঞতা বলিতে লাগিলেন। যাহারা সরকারের সাপ্লাই করা 'লাল কেতাব' লইয়া এত মাতামাতি করিয়াছে, তাহারাই তো এখন বাহিরে গিয়াছে, যাইতেছে। ভিতরের বস্তু শেষ না হইলে এত সহজে তাহারা বাহিরে যাইতেও পারিত না। অমিতও গিয়া তাহাই দেখিবে। অবশ্য আগে

বাহির হইয়া যাইবার একটা সাময়িক রাজনৈতিক সুবিধাও আছে। আগেই গিয়া দল বাঁধিতে পারিবে।

এই ইঙ্গিত অমিতের পক্ষে দুর্বোধ্য নয়। রঘুও আবার খাবার তাগিদ দিতে আসিয়াছে। তাই চেয়ারের হাতল হইতে স্মিতমুখে অমিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল: রাজনীতি থাক। বৈষয়িক সুবিধা কতটুকু হয়, তাই এখন দেখি গিয়ে—

ভুজঙ্গ সেন হাসিলেন। অর্থাৎ বিশ্বাস করিলেন না অমিতের কথা।—এতটুকু লোকচরিত্র কি তাঁহার জানা নাই? বৈষয়িক সুবিধার আসল পথই তো রাজনীতি। না হইলে ধনকুবেররা পলিটিক্সে টাকা ঢালেন কেন? তবে একটু বিপদসঙ্কুল এই পথ। কিন্তু বিপদ আছে বলিয়াই তো লাভও বৃহৎ। যাহাই বলুক অমিত, অমিতের লক্ষ্য কি?—কর্পোরেশন? কোনো ক্ষমতাবান জাতীয়তাবাদী পত্রের সম্পাদকত্ব? অ্যাসেমব্লির নেতৃত্ব? কি চায় অমিত? কোন টোপ সে গিলিবে? কোন সৌজন্য বা বদান্যতা দিয়া তাহাকে গাঁথিয়া তুলিতে হইবে?

ভুজঙ্গ সেন বলিলেন: যান।—এবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন ভুজঙ্গ সেন,—স্নানের উদ্যোগও করিবেন, অমিতকেও শিষ্টাচার দেখাইবেন,—যান।—তবে আমরাও আসছি।—জোর দিলেন 'আমরা' শব্দটুকুর উপর, যাহাতে বুঝিতে বাকি থাকে না এই 'আমরা'র সামনেই তোমাদের তাসের ঘর ভাঙিয়া যাইবে। ইঙ্গিতপূর্ণ কথাটি বলিয়া ভুজঙ্গবাবু স্নানের তোয়ালে লইতে গেলেন, মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিলেন—অমিতের দিকে চাহিয়া। অমিত বুঝিল, হাস্যমুখে সহজভাবে বলিল: শীগগির শীগগির আসুন আপনারা;—নইলে কিছু হবে না দেশের।

···মানুষ লইয়া খেলা,—আগুন লইয়া নয়, মানুষ লইয়া খেলা—ইহাই কি ইতিহাস, অমিত? আর ইহারই নাম ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সাধনা? তাহার আধ্যাত্মিকতা, তাহার নতুন কালের 'হিস্টোরিকাল আইডিয়ালিজম্'—এডিংটন-অরবিন্দ-অ্যাণ্ডরুজ্?···

নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল অমিত।

দেরি নাই আর। মাত্র এক মিনিটের মতো কথা বলিবার সুযোগ আছে শেখরের সঙ্গে। দুইজনে কেহ উল্লেখ করিল না···কিন্তু একটি অদৃশ্য মুখ দুই জোড়া বেদনাস্তব্ধ চক্ষুর মধ্যে ফুটিয়া রহিল···সুনীলের চোখ···

ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস বিশেষ অধীতব্য বিষয় লইয়া শেখর অমিতের তাড়ায় এম-এ পরীক্ষা দিল। অনেক কষ্টে একবারের মতো হকি ও ফুটবলের ব্যস্ততার মধ্যেও সে সময় করিয়াছে। সুনীল তাহাতেও প্রীত হয় নাই। জেল হইতেও শেখর ফার্স্ট ক্লাস আদায় করিতে পারিল। ফার্স্টই হইত, কিন্তু হয় নাই। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত অধ্যাপনা ছাড়াই যদি কেহ এই সম্মান লাভ করে তাহা হইলে অধ্যাপকদের পক্ষে তাহা লজ্জার কথা হয়। আরও কারণ ছিল, ফার্স্ট হইয়াছে একটি মেয়ে—'লেডিজ ফার্স্ট' বহুদিনের নীতি বিশ্ববিদ্যালয়েরও। নিতান্ত কর্তাদের পুত্র বা জামাতা না থাকিলে কবিধর্মী অধ্যাপকেরা এই নীতি পালনেই তৎপর হন। লেডিজই হউক, কিংবা হউক যে কোনো জামাতা ফার্স্ট, শেখরের তাহাতে যায় আসে না। শেখরের পরিচয় হউক হকিতে, সে অপরাজেয় মিলিটারি ড্রিলে। 'এসে' পেপারে সে বিলাত-ফেরতা যুবক পরীক্ষককে চমক লাগাইয়াছে। শেখরের নিকট সে সংবাদও আসিয়াছিল—ভ্রাতৃগর্বিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতা হইতে শেখরকে লিখিয়াছে; তাহাতে শেখরের একটু তৃপ্তি আছে। অমিতদার নিকট তাহার সেদিনের সাম্রাজ্যবাদের তত্ত্ব ও ভারতবর্ষের ব্রিটিশ-শাসনের বিশ্লেষণ পাঠ ও আলোচনা তাহা হইলে বৃথা হয় নাই। কিন্তু সুনীল তাহাতে আরও ক্ষুব্ধ হইয়াছে। শেখরেরও অতৃপ্তি বাড়িয়া গিয়াছিল—এদেশে এমন বিশ্ববিদ্যালয় কোথাও কি নাই যুদ্ধবিদ্যার ইতিহাস অধ্যয়নের কোনো ব্যবস্থা করে? না হইলে কি লাভ হইবে শেখরের? আর তাহার সহযোদ্ধা সুনীলের? তাহারা প্যারেড করিতেছে; সৈনিকের জীবনের জন্য তৈয়ারি হইতেছে। খেলা আর প্যারেড, প্যারেড আর খেলা—ইহাই তাহাদের রুটিন ছোটখাট মিলিটারি রেগুলেশনের বই পাইয়া বুভুক্ষুর মতো। শেখর তাহা আয়ত্ত করিয়াছে। পড়িয়াছে হামস্‌ওয়ার্থের মহাযুদ্ধের ইতিহাস, চার্চিলের 'ওয়ার্লড ক্রাইসিস্'। অমিতের সাহচর্যে আনাইয়াছে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি হইতে

দুষ্প্রাপ্য 'সেভেন্ পিলার্স অব্ উইস্‌ডম্', আনাইয়া পড়িয়াছে, গরিলাযুদ্ধের রীতিনীতি বুঝিয়াছে। ছাতা-পড়া, পাতা-না-কাটা ক্লাউজভিট্‌জ লইয়া বসিয়াছে; টাইমস্ ও স্টেটস্‌ম্যানের মিলিটারি সংবাদ-দাতার সন্দর্ভের কাটিং করিয়াছে—'সম্ভবত লিডল হার্টের লেখা'। ভারতবর্ষের সীমান্তের ভৌগোলিক আর ঔপজাতিক অবস্থা লইয়া মাথা খুঁড়িতেছে। অমিতদা বলিতেছেন—মহাযুদ্ধ আসিয়া গেল। এতই যদি তাহাদের যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে আগ্রহ তাহা হইলে আজ দাসখত লিখিয়া ও বাহির হইয়া পড়ুক—যুদ্ধের মুখে ইহার পর অপ্রস্তুত হইতে হইবে না।...না, অমিতদা কেবল সংশয়ই জাগাইয়া দেন। শেখরদের মনেও সন্দেহ জাগান—তাহাদের এই প্যারেড ও জঙ্গিপনার স্বরূপ কি? তাহা শেখর ও সুনীল বুঝে কি? তাহারা কি চায়—ব্লাঙ্কিজম? ক্যু-দে-তা?

শেখর অত তর্কের কচকচিতে যাইবে না। সে বিচার বিতর্ক করিবেন বয়োবৃদ্ধরা—অমিতদারা। শেখরেরা, সুনীলেরা হইবে সৈনিক—স্বাধীনতার শাণিত অস্ত্র—দ্বিধাহীন দ্বন্দ্বহীন অস্ত্র।

শুধু এই?—অমিত পরিহাস করিয়াছে,—মানুষকে অস্ত্রে পরিণত করলেই কি যুদ্ধজয় করা যায়? না, মানুষ তাতে সার্থক হয়? মানুষ তো যন্ত্র নয়, সে যন্ত্ররাজ;—তাই সে জয়ী।

শেখর বা সুনীল কিছুতেই অমিতদার এইসব কথা মানে না।—'লাল কেতাব' তাহারা ছুঁইবে না—শেখরও না, সুনীলও না। কিন্তু অমিত জানে শেখরের অতৃপ্তি অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিণত হইতেছে। স্পেনে ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের আত্মদান তাহাদের সংবেদনশীল চিত্তকে মথিত করিতেছে। তাই শেখর যতটা জোর করিয়া অমিতকে এই সব বিষয়ে আঘাত করিতেছে, তাহার চতুর্গুণ জোর দিয়াই সে আপনার পুরাতন বিশ্বাসকে, পুরাতন কর্মপদ্ধতিকে আঘাত দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তারপর?

সুনীলের সঙ্গেও বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গেল শেখরের! অমিত জানে—'সল্' হইবে 'পল্'; তেমনি দৃঢ়ব্রত, অক্লান্ত এবং কর্মোন্মাদও। কর্মোন্মাদ.. উহাই বিপদও শেখরদের লইয়া। যুদ্ধ লইয়াই বা এত মাতামাতি কেন শেখরের?

'যুদ্ধ রাজনীতিরই সম্প্রসারণ—অন্যবিধ বলে'। এ নীতি তুমি মানো ?—অমিতকে শেখর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

আমি কেন, যুদ্ধশাস্ত্রীরা মানে।

কিন্তু যুদ্ধের মূল 'বল' কি? অস্ত্র না অর্থ, মনোবল না জনবল? Prussian Principle না Red Armyর Principle ?

সর্বনাশ, এ তর্ক এখন ?—অমিত বলে।

তর্ক বাইরের জন্য জমা থাকবে; এখন চাই উত্তর।…

…ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে দাঁড়াইয়া থাকে স্ফিঙ্কস্—'উত্তর চাই', 'উত্তর চাই'।

অমিত হাসিয়া বলে: তা হলে শোনো স্ফিঙ্কস্-রূপী শেখর,—যদিও আমি জানি এই শক্তিচয়ের ডায়েলেকটিক্যাল সমন্বয়েই জয়, তবু জানি মানুষকে যুদ্ধাস্ত্রে পরিণত করে যুদ্ধজয় হয় না, মানুষকে যন্ত্ররাজ করেই যুদ্ধজয় হয়। আর তাই সর্বকালের স্ফিঙ্কসেরই প্রশ্নের উত্তর এক :—'মানুষ'।

সেই পথ ধরিয়াই তবে শেখর চলিবে, সৈনিকের নামে যন্ত্র গড়িবে না, মানুষ গড়িবে। আর বন্ধু সুনীলের সঙ্গে তাহার বাক্যালাপ তখন বন্ধ হইয়া গেল। সুনীলই তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।

…যুবক শেখর, স্থিরচিত্ত, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, হয়তো বা স্থিরপ্রজ্ঞ সে এই অস্থির যুগে। আর সুনীল—অস্থির যুগের উদ্দাম অধীর যাত্রী, উল্কার আলোতে যার পথ চিহ্নিত। চিরন্তন সৈনিক তাহারা দুইজনেই ইতিহাসের রক্ত-পিচ্ছিল পথে।… এমনি উহারা। ভুজঙ্গ সেন জানেন কি—ইহাদের 'দশজনের নয়জনই' এইরূপ উদ্দাম প্রাণ লইয়া এখানে আসিয়াছিল ?—কিন্তু কোন প্রাণ লইয়া তাহারা ফিরিয়া গেল ?…আর কোন প্রাণই বা রাখিয়া গেল তাহারা—যাহারা ফিরিল না—যাহারা আর ফিরিবে না…যাহারা ফিরিবে না—যাহারা ফিরিবে না…

শেখর ও অমিত, দুই জনের দুই জোড়া চক্ষের মধ্যে একটি অদৃশ্য মূর্তি ভাসিয়া উঠিল এই নিমেষে…

এক মুহূর্তে যেন অমিতের মুখ নীরক্ত হইয়া গেল, চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল, কালো হইয়া আসিল চক্ষের আলো…সুনীল…সুনীল…

শেখর প্রণাম করিতে গেল—তাহার চক্ষুভরা জল।

জ্যোতিঃ রাগ করিয়া বলিল, দেখা আর শেষ হয় না। এদিকে দশটা বাজে। জেল ছেড়ে যেতে চাও না? এমন কি রেখে গেলে পিছনে?

কী রাখিয়া গেলে পিছনে, অমিত? কী রাখিয়া গেলে পিছনে·· প্রাণ? প্রাণের পরাজয়? না, প্রাণের পাথেয়? ··

অমিত সবিষাদ হাসি হাসিল, বলিলঃ চলো, খেতে খেতে না হয় শুনবে তা।

জ্যোতির্ময়ের পক্ষে রাগ করা স্বাভাবিক। অনেকের অপেক্ষা সে অমিতের আপন। বাহিরে আপন, ভিতরেও আপন। যাহারা মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়াই আনন্দ লাভ করে জ্যোতিঃও তাহাদেরই দলের মানুষ। সেই মৃত্যুর জুয়া খেলিতে খেলিতে তবু সে বাঁচিয়া গিয়াছে, আসিয়া ঠেকিয়াছে এই অচল স্রোতের কর্মনাশা ঘাটে। এখানে করে কি জ্যোতিঃ? খেলা? প্যারেড? ব্যায়াম? কসরত?

অনেক যুঝিয়া, ভালো করিয়া বুঝিয়া জ্যোতিঃ ঝাঁপাইয়া পড়িল নতুন এক প্রবাহে—সে পড়িবে, লিখিবে, জানিবে, বুঝিবে। অমিত তাহার আবেদন অস্বীকার করিতে পারিল না। তখনো বন্দিজীবনের প্রথমার্ধ মাত্র। জ্যোতিঃর আগ্রহ অমিতের আশাকে ছাড়াইয়া গেল। সেই সূত্রেই বন্ধুমহলে দেখা দিল কৌতুক, বিস্ময়, সংশয়, পরে অমিতের বিরুদ্ধে বিরোধিতা। কিন্তু অগ্রজ, অনুজ, সহকর্মীর সকল ঘৃণা বিদ্বেষ মাথায় লইয়া জ্যোতিঃ শুধু অমিতের পার্শ্বেই দাঁড়াইল না, তাহার অগ্রে গিয়াও দাঁড়াইল। সে ঘোষণা করিল—'যুদ্ধং দেহি';—জগৎ সত্য—ব্রহ্ম মিথ্যা। বস্তু ছাড়া বস্তু নাই, আর মার্কস্ সেই বস্তু-ব্রহ্মের প্রবক্তা। কমিউনিজম্ই পথ আর কোমিণ্টার্নই গতি।

অমিত তাহাকে বলিতে চাহিলঃ ধীরে, জ্যোতিঃ, ধীরে—

কিন্তু ধীরতা, লাভ-ক্ষতি গণনা করিয়া জ্যোতিঃ বিচার করে না। সর্বস্বপণই তাহার স্বভাব। সেই সর্বস্বপণের নেশায় সে সমুত্তীর্ণ হইতে পারে অনেক পরীক্ষা···উত্তীর্ণও হইয়াছিল, জ্যোতি মুখ ফুটিয়া না বলুক, অমিত তবু জানিয়াছে।—জেনানা ফটকের দুয়ার দিয়াই এক বৎসর আগে মিনতি রায়

বাহির হইয়া গিয়াছে। অন্য মেয়েরাও কে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে।··· জ্যোতিঃ আর মিনতি, দুই জনাই দুই জনকে না বুঝিয়া বরণ করিয়াছিল এক দুর্জয় ব্রত উদ্‌যাপন করিতে করিতে। সত্যটা তাহারা যখন বুঝিল, তখন আরও জোর করিয়া মুখ ফিরাইয়াছে দুই দিকে—ব্রতটাই সত্য; হৃদয়ের দৌর্বল্য দিয়া তাহা খাটো করা আপনার সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা। জ্যোতির্ময় আজ জানে—ব্রতের নামে হৃদয়কে অস্বীকার করাও আপনার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা। কিন্তু এই নূতন সত্য কি মিনতি জানিয়াছে?···সম্ভবত। নয় শত মাইলেরও ওপার হইতে জ্যোতিঃ তাহা মিনতিকে জানাইতে পারিয়াছে; সম্ভবত মিনতিও তাহা জানিয়া লইয়াই এই ফটক দিয়া বাহিরে গিয়াছে।

সেই মিনতি আসিবেও অমিতদার কাছে—'আজই, কালই।'—মৃদুকণ্ঠে, পরিচ্ছন্ন লজ্জার সহিত জানায় জ্যোতিঃ।—কিন্তু না আসিলেও অমিতদা তাহাকে সংবাদ দিবেন তো?···

কি সংবাদ দিবে, অমিত? মিনতিকে কি জানাইবে, জ্যোতিঃ?—জ্যোতিঃ মনে করিতে পারে না।

···বোলো, 'সুধা তাকে ভোলে নি', না?—অমিত মনে মনে বলে।

মিনতি জানে, জ্যোতিঃ তাহাকে ভোলে নাই। কিন্তু জ্যোতিঃ তাহা মিনতিকে জানাইবে কিরূপে? এই তো অমিতকে এতক্ষণ যাবৎ পাওয়াই যায় না।

অমিত সস্নেহ কৌতুক মনে মনে উপভোগ করিতে লাগিল—সত্যই জ্যোতিঃ রাগ করিতে পারে। যে কথা বলিবার জন্য সে আজ তিন ঘণ্টা ধরিয়া অবসর খুঁজিতেছে—বিছানাপত্র বাঁধিতেছে, অমিতের কাছ ছাড়িতে চাহে না,—সে কথাটাই বলিতে পারিতেছে না লোকের ভিড়ে। খাইতে বসিতে বসিতে অমিত জ্যোতিঃর কথার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

জ্যোতিঃ বলিল: পাওয়াই যায় না তোমাকে। বিভূতিবাবুরা এসে বসে ছিলেন।

এই কথা? এই কথা বলিবার ছিল জ্যোতিঃর? এই জন্য জ্যোতিঃর এতটা

রাগ।…মনে মনে অমিত বলে, না, না, জ্যোতিঃ,—বৃথা কেন সময় নষ্ট কর অমিতের কাছে।

মুখে বলিল: আমি বিভূতিবাবুদের ওখানে গিয়ে ফিরে এলাম যে। আচ্ছা দাঁড়াও, খাওয়া শেষ হলে একবার চট করে আবার ঘুরে আসব। রঘু, ছাখ তো বিভূতিবাবুরা কোথায়?

জ্যোতিঃ বাধা দিল,—দেখতে হবে না। আমি খবর পাঠিয়েছি, এসে যাবেন এখনি।

সত্যই বিভূতিবাবু ও রবি গুপ্ত তখনি আসিলেন। কিছুই আর জ্যোতিঃ বলিতে পারিল না। অমিত উঠিয়া দাঁড়াইতে গেল, তাহাদের বসাইয়া আবার খাইতে বসিল।

বেশি কথার সময় নেই—বেশি কথার প্রয়োজনও নেই।

বিভূতিবাবু তাই সরাসরি বলিলেন, আমাদের কথা তো জানেন, আপনার কাছে গোপন করবারও কোন কারণ নেই। আপনার মত জানতে চাই।

অমিত শান্তভাবে হাসিয়া বলিল, আমার মত তো জানেনই আপনারা—সে মতাদর্শ বদলায় নি।

কিন্তু কথাটা বিভূতিবাবুদের নিকট পরিষ্কার হইল না। আরও স্পষ্ট করিয়া তাঁহারা অমিতের পথ জানিতে চাহেন।

বিভূতিবাবু বলিলেন, তা জানি, তবু · মানে, নীতি, কর্মধারা, পার্টি—

অমিত একটু নীরব রহিল। তারপর বলিল: ধোপে কি টিকবে, না টিকবে জানি না; বড় কথা বলে কি লাভ হবে—কর্মক্ষেত্রে যদি আমাদের খুঁজে না পান?

কর্মেই তো মতাদর্শের পরিচয়: only in action do we live, only in action...

কর্মক্ষেত্রেই পরিচয় কর্মীর।

কথাটা স্পষ্ট হইল না। বিভূতিবাবুরা তাই সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না। কেন পারিতেছেন না, অমিত তাহা বুঝিতে পারে না। পৃথিবী-জোড়া মানুষের অভিযান গড়িতে হইবে আজ। সেখানে কী অমিত? কতটুকু সে? কেন

তাহাকে লইয়া এত উৎকণ্ঠা বিভূতিবাবুদের? ইতিহাসের এই বিপ্লবময় শতাব্দীর মহিমা কি ইহারা বুঝিয়াও বোঝেন না, দেখিয়াও দেখেন না? অমিতকে লইয়া ভাবেন! ভাবেন না কেন সম্মিলিত অভিযানের কথা?—সমবেত কার্যক্রম, উহার আয়োজন?

বিভূতিবাবু বলিলেন: ভাবছিলাম, এ দেশের সম্মুখে এ যুগের স্বরূপ যদি আপনি প্রকাশিত করবার ভার নেন—

অমিত চুপ করিয়া রহিল।...ইতিহাসের এই বিপ্লবী গতির মহিমা,...'এ যুগের দৃষ্টি, এ যুগের সৃষ্টি' ..এ যুগের মানুষের পরিচয়...বিপ্লবময় শতাব্দীর মহিমা...কে বলিতে পারে? কে তাহা বলিতে পারে সার্থক রূপে?

অমিত বলিল: যদি যোগ্য হই, যদি ভার পাই—

যদি...যদি...যদি...

না, অমিতবাবুকে কোনোখানে যেন ধরা-ছোঁয়া যায় না। বিভূতিবাবুরা নিরাশ হইলেও সৌহার্দ্যের সহিত নমস্কার বিনিময় করিয়া চলিয়া গেলেন। মনে মনে বুঝিলেন, পাকা লোক অমিতবাবু, আর নিশ্চয়ই বড় রকমের দাঁ মারিবার সুযোগ দেখিবে। কর্পোরেশনের সভ্যপদ—?

জ্যোতিঃর দিকে অমিতের চোখ পড়িল; সে একটু গম্ভীর। অমিত হাসিয়া বলিল: কি জ্যোতিঃ, কি বলো?

না, কিছু না।

অন্যায় বলেছি কিছু?

না। বরং অন্যরূপ বললেই অন্যায় করতে।—জ্যোতিঃ গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। অমিত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। হঠাৎ শুনিল: একটা কথা ছিল আমার—

আহার-শেষে অমিত উঠিতেছে, অমনি উৎসুক হইল, উৎকর্ণ হইল। বলিল: তাড়াতাড়ি বলো জ্যোতিঃ, লোকের ভিড়ে তোমার সঙ্গে কোনো কথাই হল না।...নিজের কথাটা তবু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না বেচারা জ্যোতির্ময়! শেষে জ্যোতিঃ বলিল, তাই সংক্ষেপে বলছি—তারপর এক মুহূর্ত থামিল, পরে বলিল, তুমি পলিটিক্স্ ছেড়ে দাও—

অমিত থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। আর-একটি প্রার্থনা—ও প্রীতিপূর্ণ অনুনয়—প্রাণময় আর একটি অনুজের এমনি সনির্বন্ধ অভিমান মনে পড়িল ·· আবার মনে পড়িল সেই গম্ভীর ট্রাজেডি। এক গভীর শপথ আপনার কাছে আপনার···

জ্যোতির্ময়কে অমিত বলিল : কেন বলো তো ?

তুমি পলিটিক্‌সের অযোগ্য।

বেশ তো—'আমি নাই বা হলাম নব্যবঙ্গে নবযুগের চালক—'

আমাকে ফাঁকি দিতে চেয়ো না, ফাঁকি দিতে চেয়ো না নিজেকে—পলিটিক্‌স্‌কে তুমি 'ক্যারিয়ার' হিসাবে গ্রহণ কর নি, দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছ। কিন্তু এর বেশি তুমি তা গ্রহণ করতে পারবে না, গ্রহণ করতেও যেয়ো না—

· 'ক্যারিয়র' ? অর্থাৎ মানুষ লইয়া খেলা, মানুষে মানুষে, পার্টিতে পার্টিতে যোগ-বিয়োগ পূরণ-ভাগ, ইহারই নাম পলিটিক্‌স্‌ ? শুধু তাহাই নয়, মিশ্রগণিতও। বিভূতি-ভুজঙ্গ-নিরঞ্জন-লক্ষ্মীধরদের সকলের 'লসাগু' ও 'গসাগু' ;—একটা স্বাধীনতার সম্মিলিত ফ্রণ্ট, কংগ্রেসের শ্রীক্ষেত্র, হরিহর ছত্রের মেলা ? ইহাই তো তুমি চাও, অমিত।

মুখে অমিত বলিল : বেশ ! তা হলে কি 'আই উইল রেস্ট' ?

জ্যোতিঃ বলে, না, অন্ধ জনে দেহ আলো ; তুমি অধ্যাপক ছিলে, সাংবাদিক ছিলে, লেখাপড়া তোমার জাত-ব্যবসা। অ্যাণ্ড দেয়ার ইজ নো রেস্ট দেয়ার। বিশ্রাম চাও না তুমি, বিশ্রাম পাবেও না তুমি—এ অন্ধকারের রাজ্যে।

তাহা ছাড়া কোন পলিটিক্‌সই বা গ্রহণ করিয়াছে অমিত ?—আলোকের উপাসনা : ইহা ছাড়া অমিতের নিকট কিই বা পলিটিক্‌সের অর্থ ?

তৎ সবিতু র্বরেণ্যং ধিয়ো যো নো প্রচোদয়াৎ—সবিতার বরণীয় যিনি···

ছুটিয়া-আসা, ফুটিয়া-ওঠা কোন কথার বিদ্যুচ্ছটা অমিতের মনের মধ্যে ঝলকিয়া উঠিতেছে। অমিত তাহা থামাইয়া দিয়া বলিল : শুধু এই কথা বলবে জ্যোতিঃ ? আর কিছু কথা নেই ?

না।

না, আর কোনো কথা নাই জ্যোতিঃর। এই মুহূর্তে, এই সময়েও তাহার আর কোনো কথা নাই। অন্য কাহাকেও নিশ্চয়ই সে তাহার কথা বলিবে না। বলিলে অমিতকেই বলিত। তবু বলিতে পারিল না।

মানুষ সত্য বটে, খুবই সত্য মিনতি ; কিন্তু ব্রতটাই তবু জ্যোতিঃর নিকটে আসল সত্য। ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তাহারা আত্মবলি দিতে পারে ; অন্তরবলি দিতে পারিবে না জ্যোতির্ময় ?

লোক আসিয়া গিয়াছে—মালপত্র ফটকে লইয়া যাইবে। অমিত বলিল : যা বললে জ্যোতিঃ, তা হয়তো মনে থাকবে না ; কিন্তু মনে থাকবে যা বলো নি।...

অমিত জামা পরিল। ডাকিল : রঘু—মুখস্থ করলি ?

রঘু নীরবে ঘাড় নোয়াইয়া জানাইল,—হাঁ।

খালাস পেলেই দেখা করবি। নইলে বুঝছিস—এখন গান্ধীজীর রাজ্য। জেলে বিড়ি তামাক পাতা কিছু পাবি না।

রঘু হাসিল।

কেমন ? দেখা করবি ?

রঘু মাথা নাড়িয়া জানাইল, করিবে। কিন্তু অমিত জানে—সে আশা কম। রঘুর কয়েদি বন্ধুরা এবার আগাইয়া আসিয়া অমিতের পায়ের ধূলা লইল, রঘুও লইয়া লইল।

দুই-চারিটা বিড়ি তাহাদের বাঁটিয়া দিয়া অমিত বলিল, আমরা চলে গেলে কিন্তু বিড়ি আর তামাক পাতা জেলে ভয়ানক মাগগি হয়ে যাবে, বুঝে চলিস।

কিন্তু আর একবার নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিলে হয় না ? জ্যোতিঃ রাগ করিল,—ভিতরের আঙিনায় নীহার মিত্র প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। সিপাহীরা তাগিদ দিতেছে।—তবু একটু নমস্কার বিনিময় নিরঞ্জনের সঙ্গে—

অমিত ছুটিয়া গেল। নিরঞ্জনও বুঝি জানিত অমিত আবার আসিবে।

অঙ্গনে আরও অনেকে বিদায় দিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। সোল্লাসে কলরব করিতেছে। সীমানা তাহাদের এই অঙ্গনের দ্বার পর্যন্ত। অমিতদা

কোথায়? জেল ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না নাকি? ছুটিয়া আসিতেছে অমিত—নিরঞ্জনদাও আঙিনায় আসিয়াছেন পিছনে পিছনে।

অমিত চলিল কাহাকেও এ-কথা বলিয়া, কাহাকেও ও-কথা বলিয়া। শশাঙ্কনাথ আসিয়া দাঁড়াইলেন: অমিতবাবু, আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি—ভুলো না।—পরিহাসের স্বচ্ছকণ্ঠের মধ্যেও আছে প্রার্থনা।

অমিত হাসিয়া বলিল: নিশ্চয়। 'ভুলব না'।

শশাঙ্কনাথ অমিতকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে নীহারকেও। হাসি, করমর্দন, আলিঙ্গন—শেষ মুহূর্তের শেষ একটুকু আনন্দময় উৎসব। সকলের মনে আশার সঞ্চার হইতেছে—তাহারা পিছনে রহিল বটে, কিন্তু এই তো মুক্তির পালা আরম্ভ হইল, আর দেরি নাই বেশি।

ব্যায়ামশেষে লক্ষ্মীধরবাবু এতক্ষণে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। বাঘের থাবার মতো হাতটি বাড়াইয়া করমর্দন করিলেন: যাও, ভাই, খুব মেরে দিলে যা হোক—বলিবার ভঙ্গিতে একটা হাস্যতরঙ্গের সৃষ্টি হইল। খানিকক্ষণ তাহার আলোড়ন চলিল।

নীহার মিত্রের পিছনে পিছনে অমিত মুক্ত দ্বারের চৌকাঠ পার হইয়া গিয়া দাঁড়াইল—চোখে পড়িল জ্যোতিঃকে, চোখ খুঁজিয়া বেড়াইল শেখরকে, খুঁজিয়া পাইল না রঘুকে। এবার কেমন ভরিয়া উঠিল মন···কেমন ভরিয়া উঠিল···কে রহিল পিছনে? কি রহিয়াছে সম্মুখে?···

একটা জীবন অমিত ছাড়াইয়া যাইতেছে। ছাড়াইয়া যাইতেছে তাহার অনেক দিন-রাত্রির সতীর্থদের।···ছাড়াইয়া যাইতেছ তোমার জীবনের একটা অংশ।···এ যে জন্মান্তর, তোমার, অমিত। এ যে লোক হইতে লোকান্তর; যুগ হইতে যুগান্তর; দেহের মধ্যেই দেহান্তর, অমিত।

নতুন এক বেদনায় সকলকে চোখ দিয়া অমিত আলিঙ্গন করিল। তাহার হৃদয় সকলের সম্মুখে, সকলের পায়ে নুইয়া পড়িতে চাহিল—

'এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির প্রাঙ্গণে।

রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম।'

অমিত দুই হাত তুলিয়া শেষবারের মতো নমস্কার করিয়া বলিল,—এই

শেষ কথাটুকু শেষ মুহূর্তে না বলিয়া পারিল না: 'তোমাদের সবারে প্রণাম।'

জোর করিয়া মুখ ফিরাইল অমিত। পিছনকার শব্দে বুঝিল দুয়ারও বন্ধ হইয়া গেল। বুঝিল—উৎসবের শেষ কলধ্বনি শেষবারের মতো তখনো জানাইতেছে তাহাকে শুভেচ্ছা: 'অমিতদা, ভুলো না।'

৬

'যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই'—বাহিরের আঙিনার প্রত্যেকটি ঘাসের মধ্য হইতে কোন সত্য যেন মাথা তুলিয়া ইহাই বলিল। প্রত্যেককে ছুঁইতে চায় অমিত। প্রত্যেককে আর-একবার চোখ ফিরাইয়া দেখিতে চায়। দোতলায় দুয়ারের ফাঁকে ফাঁকে সেই আগ্রহ-প্রীতি-ভরা মুখগুলি, চক্ষুগুলি এখন ফুটিয়া আছে।—অমিতের গৃহযাত্রা তাহারা দেখিতেছে। কত প্রীতি ওই চক্ষে, কত অদ্ভুত আবেগ, কত জটিল বাসনা, কত স্বপ্নভঙ্গ, আর তবু কত অমর আকাঙ্ক্ষা, অশেষ স্বপ্ন!···কে বলিল—পাতালপুরী? এই তো স্বপ্নপুরী, অমিত। এত স্বপ্ন আর এদেশের কোথাও ফুটিয়াছে কোনো দিন? এমন কত ছোটখাটো সংসারের সুখ-দুঃখের স্বপ্ন, আর বিপুল পৃথিবীর ও মহাজাতির মহামুক্তির স্বপ্ন—আর কাহাদের বুকে এদেশে কোথায় ফুটিয়াছে অমিত?··· কে বলে বন্দিশালা?—বন্দনা যেখানে মানবাত্মার মহত্তম ভবিষ্যতের দিকে দিবারাত্রি সমুত্থিত হইল; বেদনা যেখানে সহস্র বন্ধনের মধ্যেও প্রতিনিয়ত প্রদক্ষিণ করিয়াছে কত দীপহীন গৃহপল্লী-জনপদ?···প্রেতলোক, অমিত? এ যে জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়—জীবনের জয়গান যেখানে রচিত হইয়াছে শত মিথ্যার, শত তুচ্ছতার, শত প্রতিক্রিয়ার পীড়নকে ছাড়াইয়া।···'অপরূপকে দেখে এলাম দুটি নয়ন ভরে'···

অমিত চোখ তুলিল না, ফিরিয়া তাকাইল না, তাহার রহস্য-নিবিড়দৃষ্টি কিছুই দেখিল না···আপনার মনেই মানিয়া চলিল, 'অপরূপ···অপরূপ!'

অশ্বত্থের ছায়ায় 'টিকটিকি' তেমনি প্রস্তুত রহিয়াছে, সেই বেত লাগাইবার ফ্রেম। এক মুহূর্তে অমিতের চক্ষু পীড়িত হইয়া পড়িল। রহস্য-ঘন পরিপূর্ণ হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। কাহাকে ভুলিবে অমিত, কাহাকে? আজ এই শেষ বিদায়ের প্রীতিস্পর্শের মধ্যে—মানুষের অপরূপতার আরাধনায়—অমিত কি ভুলিয়া যাইবে এই পশুদের, শ্বাপদদের, রক্তনখরদন্ত এই জিঘাংসুদের—

মেদিনীপুর জেল। এমনি ফ্রেমে আঁটিয়াছে বারীন নন্দীকে সেখানকার পেশোয়ারী বেত্রধারী, সেখানকার হাসান খাঁ।—এমনি যাহার বিপুল দেহশক্তি সংরক্ষণের জন্য বরাদ্দ আছে প্রতিদিন মাংস আর সুপ্রচুর খাদ্য—কয়েদিদের সে বেত মারিবে। সেই মেদিনীপুরের হাসান খাঁ পেশোয়ারী বেত মারিতেছে বারীন নন্দীকে।...

বলিষ্ঠ বালক। তখনো মুখ কাঁচা, হয়তো বাঙাল বলিয়া। আই-এ ক্লাসের লজিক লইয়া বারীন দিন দুই অমিতের নিকটে এই জেলে লজিক বুঝিতে আসিয়াছিল। অমিত বুঝিতে পারে না লজিকের মাথামুণ্ডু কেন পড়ায় বিশ্ব-বিদ্যালয়? গতানুগতিক নিয়ম বলিয়া? জীবনের লজিককে কেতাবী লজিকে চাপা দিতে হইবে বলিয়া? অমিত যুক্তির সহজ দৃষ্টান্ত লইয়া বসিত,—দৈনিক কাগজের সংবাদ বুঝিবার জন্য যুক্তিতর্ক-প্রয়োগ করিতে শিখাইত। অমিতের মুখে সেই জীবন্ত লজিকের দৃষ্টান্ত শুনিতে শুনিতে, বুঝিতে বুঝিতে সেই বাঙাল বালক বারীন নন্দী খুশী হইয়াছে। তাহার কথা সহজ, বুদ্ধি সহজ, সহজ তাহার জীবন-দৃষ্টি। কিন্তু বারীন আই-এ পাশ করিবার অবকাশ পাইল না। অমিত চলিয়া গেল পাহাড়-জঙ্গলের বন্দিশালায়। বারীন নন্দী জেল হইতে গিয়াছিল কোনো গ্রামের সাপের-বাসা বন্দীঘরে। সাপ তাহাকে আঁটিতে পারিল না, সে বাঙাল দেশের ছেলে, সাপ দেখিয়াছে। কিন্তু সাপ নয়—ম্যালেরিয়া ও দারোগার দাপটেই পড়াশুনা আর বারীনের হয় নাই। সেখানে বই মিলে নাই, পথ্য ও খাদ্য মিলে নাই, ঔষধ মিলে নাই। শেষ পর্যন্ত মিলিয়াছিল নিয়মভঙ্গের জন্য কারাদণ্ড। তারপর সেই সহজ ছেলের সহজ যুক্তি জীবনের যুক্তিতে আপনি রূপ গ্রহণ করিল। দণ্ডাদেশ শেষ হইল।

হুকুম হইল আবার ঠিক সেই গ্রামের সেই ম্যালেরিয়ার ও দারোগার পরিহাস উৎপীড়নের শিকার হইতে হইবে বারীন নন্দীকে। না, বরং সে আবার নিয়ম ভঙ্গ করিবে, আবার জেলের কয়েদি হইবে! বর্ধমান জেলের পরিবর্তে এবার তাহার স্থান হইল মেদিনীপুর জেল—পুরাতন ও দুর্দান্ত কয়েদির জন্য নির্দিষ্ট স্থান। এবার দণ্ডকাল হইল দুই বৎসর। আর দ্বিতীয় ডিভিশনের পরিবর্তে হেবিচুয়াল ক্রিমিন্যালের জন্য ব্যবস্থা হইল সাধারণ কয়েদির তৃতীয় ডিভিশন।

ঘানিঘর, কারখানা সব পাশ হইয়া দুই বৎসর পরে বারীন নন্দী আবার যখন অপেক্ষা করিতেছে মেদিনীপুর জেলেই কয়েদির জাঙ্গিয়া ছাড়িয়া বন্দীর ধুতিজামায়, বন্দীদের ওয়ার্ডে বন্দীরূপে, এণ্ডারসন্ সরকারের নূতন কোনো মর্জির অপেক্ষায়—তখন আসিল গুজরাতী আই-এম-এস্ মেজর পটেল। ছিপছিপে সাধারণ তাহার চেহারা, সাধারণের অপেক্ষাও সে রোগা, দ্রুত চলে দ্রুত বলে জঙ্গি অভ্যাসে, দ্রুত নিয়ম খাটায় জঙ্গি-চালে। জেলের বাইবেল 'জেলকোড' দুই বেলা কপালে ঠেকাইয়া এই রাজ্যের আধিপত্যে নূতন বসিয়াছে মিলিটারি-ফেরতা ভারতীয় মেজর পটেল। প্রথমেই হুকুম হইল—'সরকার' ব্যারাকে ঢুকিলেই বন্দীদিগকেও কয়েদিদের মতো 'ফাইল' করিয়া দাঁড়াইতে হইবে, করিতে হইবে 'সালাম'। জেল কোডের ইহাই নির্দেশ—ডিসিপ্লিন্। কিন্তু এতদিন যদি এই নির্দেশ পালিত না হইয়া থাকে, উভয় পক্ষের স্বীকৃত শিষ্টাচারের আদান-প্রদানেই জেলের ডিসিপ্লিন চলিয়া থাকে? কই, সেই কথা তো কোনো সরকারি হুকুমে লিখিত নাই। তদভাবে মেজর পটেল সরকারি জেলকোড অগ্রাহ্য হইতে দিবেন না; ডিসিপ্লিন তিনি রাখিতে জানেন, সদ্য মিলিটারি হইতে তিনি আসিয়াছেন। তাই জেল-কোডের নিয়ম অনুযায়ী তাঁহার দণ্ডনীতি অগ্রসর হইয়া চলিল। বন্দীদের 'ডায়েট' কাটা গেল, চলা-ফেরা বন্ধ হইল এবং অপরাধীরা 'ডিগ্রীবন্দী' হইল। তারপর একে একে 'ফ্যানভাত', 'ছালা-চট', 'জাল-ডিগ্রী', 'ডাণ্ডাবেড়ি', 'স্ট্যাণ্ডিং-হ্যাণ্ড-কাপ'। কেহ কেহ ভাঙিয়া পড়িতেছে। না ভাঙিলে কেহ কেহ চালান যাইতেছে জেলের হাসপাতালে। কেহ কেহ নিস্তেজ নিরাশ হইয়া ধুঁকিতেছে একা সেলে, তবু ভাঙিতে চাহে না।

এইরূপই জেল-খাটা বারীন নন্দী ভাঙিল না। জেলকোডের দণ্ডচূড়ার প্রান্তে দাঁড়াইয়া মেজর পটেল দয়ার্দ্র চিত্তে তখন ঘোষণা করিলেন, 'ফ্লগিং—ফাইব্ স্টাইপস্। দেট উড্ বি এনাফ।' ডাক্তার ব্যবস্থামত বারীনের দেহ পরীক্ষা করিল, বেত্রদণ্ডের জন্য তাহাকে পাশ করিয়া দিল—বারীন সহিতে পারিবে। পাকানো বেতে চর্বি-মাখা চলে; হাসান-খাঁর মাংসের বরাদ্দের এবার পরখ হইবে। 'টিকটিকিতে' বারীনের উলঙ্গ দেহ বাঁধা হইল। এক-একটি আঘাতের সঙ্গে উলঙ্গ দেহের কাঁচা মাংস উঠিয়া আসে—রক্ত ঝরিয়া পড়ে। অমনি ছোট ডাক্তার ও বড় সাহেব দেখিয়া লয় বারীনের দেহাবস্থা,—হাঁ, ঠিক আছে, সহিতে পারিবে। কেহ বলিতে পারিবে না কর্তৃপক্ষের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নাই। এক ইঞ্চি বাদ দিয়া হাসান খাঁর শিক্ষিত হাতের দ্বিতীয় আঘাত তখন নামে···আশ্চর্য নৈপুণ্য আর আশ্চর্য শক্তি। সার্থক তাহার মাংসের বরাদ্দ। বারীনের কণ্ঠ, বারীনের কথা কেহ তবু শোনে নাই।

পাঁচ ঘায়ের শেষে 'টিকটিকি'র বাঁধন ছাড়াইয়া বারীনের রক্তাক্ত উলঙ্গ দেহ সিপাহীরা মাটিতে দাঁড় করাইল। তাহার স্থির মুখে কি হাসি, না, খুনের নেশা? মেজর পটেলের তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। আগাইয়া আসিয়া মেজর বলিলেন, নাউ, আর ইউ স্যাটিস্‌ফাইড? কেমন সাধ মিটেছে তো?

স্থির ওষ্ঠ বাঁকিয়া উঠিল হাস্যে: হ্যাভ্ ইউ গট্ ইউর সালাম? পেয়েছ সালাম?

মিলিটারি দীপ্তিতে দৃপ্ত মেজর হুকুম করিলেন, ফাইব্ মোর। ও, ইয়েস, হি ক্যান্ স্ট্যাণ্ড ইট্। লাগাও আরও পাঁচ বেত। হাঁ, খুব পারবে এ তা সইতে।

আবার বারীনের দেহ টিকটিকিতে বাঁধা হইল, আবার জেল কোডের নির্দেশমতো ব্যবস্থা হইল—এক-এক ইঞ্চি পরে পরে এক-এক বেত, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরীক্ষা, রক্তাক্ত আঘাতস্থলে অমনি ঔষধ-প্রলেপ,—অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি হইল না।

দ্বিতীয়বার যখন সে দেহ নামাইয়া সিপাহিরা দাঁড় করাইল, তখন

বারীনের পা টলিতেছে। সাহায্যার্থে ধরিবার জন্ত আগাইয়া আসিয়াছে ডাক্তারের বেয়ারা কয়েদি বদ্রিপ্রসাদ—বারীন নন্দী হাত দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিল।

মেজর পটেল বলিলেন: কেমন, চ্যালেঞ্জ করবে আর আমাকে?

চ্যালেঞ্জ ইউ?—বুক-ভরা ঘৃণা আর আগুন-ভরা দৃষ্টি লইয়া দৃপ্ত কণ্ঠে গর্জিয়া উঠিল—আই চ্যালেঞ্জ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার।—চ্যালেঞ্জ তোমাকে করব? চ্যালেঞ্জ করছি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে।

...এক মুহূর্তের মতো সমস্ত ভারতবর্ষের একালের ইতিহাসকে বাণীময় করিয়া তুলিয়াছ তুমি, বারীন নন্দী। 'আই চ্যালেঞ্জ দি ব্রিটিশ এম্পায়ার!' এক মুহূর্তের মতো সমস্ত সতীর্থের তুচ্ছতা ও ভঙ্গুরতা, নিরাশা ও নির্বীর্য দিন-রাত্রিকে মহিমান্বিত সার্থকতা দান করিয়াছ তুমি,—সাধারণ চেহারার, সাধারণ ছেলে বারীন নন্দী, অমিতের কাছে যে পড়িতে আসিয়াছিল লজিক।...

অমিত মনে মনে মহিমান্বিত হইয়া ওঠে—জীবনের লজিক হার মানে নাই এম্পায়ারের বেতের কাছে।

জঙ্গি অভিজ্ঞতা নিরুপায় হইয়া পড়িল কয়েক মুহূর্তের মতো। কয়েক মুহূর্তের মতো বাঙালী ছোট ডাক্তারের জেলে পুষ্ট ছোট মনও কেমন হইয়া গেল।

'এ দেহে আর বেত চলবে না, স্যর'—ডাক্তার সবিনয়ে কিন্তু দৃঢ়ভাবে এবার জানাইল।

টলিতে টলিতে কয়েক পদ গিয়া বারীনের হতচেতন দেহ তখন মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

তারপর মেদিনীপুর ও আলীপুরের ফটক দিয়া কয়েদি জাহাজ 'মহারাজা'র যাত্রীরূপে বারীন নন্দী পৌছিয়াছে গিয়া 'পোর্ট ব্লেয়ারের' ভূস্বর্গে—সেখানে অনশন ধর্মঘটের আর দেরি নাই। সেদিন ডাক্তারের কৃতিত্বে আন্দামানে যেই অনশনরত 'স্বদেশীরা' মরিয়াছে তাহাদের মধ্যে বারীনের নাম অমিত পড়ে নাই! অতএব, বারীন হয়তো ফিরিবে—'দশজনের নয়জনের মতো' নামহীন, গোত্রহীন,—আত্মীয়ের নীড়ে। বারীনও মিশিয়া যাইবে 'বারীনদা',

উপীনদা'দের মতোই নির্বিরোধ জীবনস্রোতে। তাহাই সত্য, তাহাই নিয়ম। তবু জীবনে একবারের মতো সেই রক্তসিক্ত বালক আপনার অন্তরাত্মার মহিমায় ইতিহাসের এই বিরাট চ্যালেঞ্জকে রূপদান করিয়াছে and touched immortality. 'Only in intense living do we reach infinity.'…এমনি এক ফ্লগিং ক্রেমে আটা সাধারণ বালক ক্রুশবিদ্ধ মানবপুত্রের মতো সেই অনন্ত রহস্যকে স্পর্শ করিয়াছে—জীবনের অন্তরতম সত্যকে স্পর্শ করিয়াছে, আর হইয়াছে—ইতিহাস।

অমিত ইতিহাসের ছাত্র, এ কালের এই ক্রুসিফিক্‌শান—সে কি করিয়া ভুলিবে? ইহা ইতিহাস, ইতিহাস, ইতিহাস।…

সম্মুখের বারান্দায় চামড়ার চাবুক হাতে দাঁড়াইয়া সেই পেশোয়ারী হাসান খাঁ। বারান্দার দেয়ালে ঠেস-দেওয়া সুপারের সেই প্রকাণ্ড ছাতা; বড় সাহেব 'রাউণ্ড' দিয়া ফিরিয়াছেন, আপিসে বসিয়াছেন। হাসান খাঁরও এখনি ছুটি হইবে। তাহার দুই চক্ষু অমিতকে চিনিয়া ফেলিয়াছে—বড়সাহেব আজ সকালে যাহার সহিত গল্প করিতেছিলেন সেই 'স্বদেশী' বাবু! অমিত চক্ষু ফিরাইয়া লইল। না, অমিত ভুলিতে চাহিলেও ভুলিতে পারিবে না।… বিধাতা, শুধু, অপরূপকেই তুমি দেখাও নাই মানুষের অসহনীয় শ্বাপদ-রূপও দেখাইয়াছ।

অমিত হাসান খাঁকে এই জেলেই ছয় বৎসর পূর্বে প্রথম দেখিয়াছিল। শ্রান্ত পীড়াগ্রস্ত অমিত চক্ষু বুজিয়া জেল হাসপাতালে পড়িয়া আছে। সহসা একটা কি আপত্তি শুনিল, অনুনয় শুনিল, চোখ মেলিয়া দেখিল—রোগজীর্ণ এক কয়েদিকে এক চড়ে শোয়াইয়া দিয়া এই পেশোয়ারী দৈত্য তাহার মুখ হইতে কাড়িয়া লইল রোগীর পথ্য—দুধের বাটী। এক চুমুকে তাহা শেষ করিয়া সে হাঁকিল কয়েদি শুশ্রূষাকারীদের, লে আও, আর কেয়া হ্যায়। তাহাদের মধ্যে একটা ছুটাছুটি পড়িল। হাসপাতালে হাসান খাঁর জন্য দুধ ও ফল না রাখিলে সেখানকার কয়েদি-কর্মীদের রক্ষা নাই। তাহার জন্য—আর বড় জমাদার খাঁ সাহেবেরও পরিতুষ্টির জন্য—নবাগত ছোকরা কয়েদি এইরূপই বরাদ্দ আছে, হয়তো নেহাত ছোকরাও নয় সকলে তাহারা। এই সেই হাসান

খাঁ পেশোয়ারী—বড়সাহেবের ছত্রধারী, বড় জমাদারের পার্শ্বরক্ষী, যাহার পাশব অত্যাচারে এ জেলেই মানুষ মরিয়াছে। জেলের লজিক ও বাহিরের লজিক আশ্চর্য রকমে আয়ত্ত করিয়া হাসান খাঁ জানে—ইহাই বাঁচিবার লজিক—জগৎ-জঙ্গলে ইহাই আইন :—খুন, আরও খুন, আরও খুন। যত বড় খুনী তুমি তত তোমার জীবন এই জেল-কোডের হত্যাশালায় নিষ্কণ্টক, তত তোমার জীবন এই শ্বাপদ-নীতিক সভ্যতায় 'সাক্‌সেস্‌ফুল'।

আজ অমিতকে দেখিয়া হাসান খাঁ পরিচয়ের হাসি হাসিতেছে। বন্ধুত্বের হাসি—বড়সাহেব আজ অমিতের সহিত অতক্ষণ আলাপ করিয়াছে, বাহিরে চলিয়াছে এবার সেই 'স্বদেশীবাবু'।

অমিত চোখ বুজিল।··বিধাতা, মানুষের এই শ্বাপদ-শক্তিকে এই মুহূর্তেও কি ভুলিতে দিবে না আমাকে ?···কাহাকে ভুলিবে অমিত, কি করিয়া ভুলিবে, কি করিয়া ভুলিবে—সত্যের এই রক্তনখরদন্ত প্রতিসত্যকে, মানবাত্মার এই বিকট বিকৃতিকে ? ইহা কি তুচ্ছ ? ইহা কি নগণ্য ? শুধু এই সত্যই কি মনে রাখিবার মতো—অপরূপকে তুমি দেখিয়াছ, দেখিয়াছ মানুষের মুখ ?···

সম্মুখের দুয়ার খুলিতে দেরি হইতেছিল। শেষবারের মতো পশ্চাদস্থ প্রাঙ্গণের ওপারে অমিত তাকাইল···অপরূপ। ওই রৌদ্র সমুজ্জ্বল পুকুরের জল, শরতের রৌদ্রস্নাত সতেজ তৃণদল, তার ওপারে ওই ওয়ার্ডের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জানালার পিছনে সারি সারি খাটিয়া—যাহার সাদা চাদর দেখা যায়। আর জানালার গরাদের আড়ালে মানুষের মুখ—বিদায়-সম্ভাষণমুখর তাহার সহযাত্রি-মানুষের সেই অস্পষ্ট মুখগুলি !···শেষবারের মতো হাত তুলিল অমিত তাহাদের উদ্দেশে।—সবারে প্রণাম, সবারে প্রণাম, সবারে প্রণাম···

একটি পদক্ষেপে—দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গেল প্রাঙ্গণ, উহার পুকুর, পত্র, বৃক্ষ, ঘাস, সব ; আর বন্দিশালার অভ্যন্তরের উৎসুক, প্রীতিপূর্ণ সেই মুখগুলিও। মাত্র চৌকাঠের এপার হইতে ওপার—অথচ জন্ম ও মরণের মতো একটা বিরাট সমুত্তরণ !

হাস্যভরা মুখে জেলের কর্মচারীরা সংবর্ধনা জানাইল। গোয়েন্দা কর্মচারী পর্যন্ত !—

আসেনই না যে আর, অমিতবাবু!—যুবক কর্মচারী বলিল।

আমি আসি নি ছ-মিনিট—আপনারা তো আসেন নি অনেক বৎসরেও।

সব্যঙ্গ উত্তরে প্রত্যুত্তরে, হিসাবপত্র, খাতাপত্রের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে, আবার অমিত ভুলিয়া গেল পশ্চাতের বাস্তবকে।…এই বইপত্রের এক-একদিনের এক-একটি ছত্রের সহিত তাহার কত ইতিহাস জড়িত। কত ছল করিয়া কেনা জেলখানার বই; কত আয়াসে আয়ত্ত করা এক-একটি অবসর-ক্ষণের এক-একটি লেখা; আশায় নিরাশায় ভরা এক-একটি প্রয়াস। কত গ্রীষ্মের অগ্নিজ্বালার দিন, শীতে হিম-আড়ষ্ট করাঙ্গুলির কাকুতি, বর্ষামুখর পার্বত্য নির্ঝরিণীর উন্মাদ কলহাস্য, আর তাপদগ্ধ মরুভূমির তপ্তবালুকার ক্ষুব্ধ উত্তাপ? এই গোয়েন্দারা কি করিয়া জানিবে সেই সব ইতিহাস? অমিতই কি মনে করিতে পারে আর সেই মুহূর্তসমূহকে—তাহার লেখার এক-একটি শব্দের মধ্যে যাহাদের আয়ু এমন করিয়া মিশিয়া গিয়াছে?

গোয়েন্দা কর্মচারী জানাইল—অমিতবাবু মুক্তিই পাইবেন, তবে দস্তুর মাফিক কিছু বাধাও থাকিবে—"কোনো রাজনৈতিক বন্দী বা ভূতপূর্ব রাজবন্দীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন না; চিঠিপত্র পুলিশকে না দেখিয়ে লিখবেনও না, গ্রহণও করবেন না; সভাসমিতিতে বা কলকাতার বাইরে কোথাও যাবেন না। রাত্রি ন-টার পরে বাড়ির বাইরে থাকবেন না,—আর সপ্তাহে একদিনের জন্য থানায় গিয়ে হাজিরা দিয়ে আসবেন।"

শুধু এইটুকু বাধা? অমিত হাসিল। আরও কত কি তো আদেশ করিতে পারিত কলকাতার পুলিশ। পুলিশকে মহানুভব বলিতে হইবে।

খাতাপত্র বিছানা তল্লাসী হইয়া গেল। একদিন এই খাতা পাইবার জন্যও অমিতকে কত কলহ করিতে হইয়াছে; তবু পায় নাই—জেল কোডের অপূর্ব নিয়মে, তাহারও উপরকার আই-বি কোডের সর্বজয়ী ইঙ্গিতে। নির্জন 'সেলের' শেষে এই ছেঁড়া খাতাটা কত দুর্লভ ঠেকিয়াছিল। মানব-সভ্যতার প্রাচীনতম লিপির মতো দুর্লভ মনে হইয়াছিল এই পাশ করা বাঁধানো খাতাটাকে যেদিন "পরীক্ষিত ও অনুমোদিত" হইয়া উহা সত্যই আসিয়া পৌছিল অমিতের হাতে এই জেলেই। আর আজ এই গোয়েন্দা সাব ইন্‌স্পেক্টর কেমন নিস্পৃহ

লঘু হতেই না উহাদের উল্টাইয়া দেখিয়া 'পাশ' করিয়া দিতেছে: 'কি হবে আর দেখে? বাইরেই যখন যাচ্ছেন।' আর এত খাতা, এত কাগজ, এত লেখা—ইহা কি সত্যই পরীক্ষা করা যায় এই সময়ে?...এত ক্ষোভ, অপমান, আর এত পীড়ন-ভারাক্রান্ত প্রতিটি মুহূর্ত—ইহাও কি তবে এমনি লঘু, এমনি অর্থহীন, এমনি বিবর্ণ বিরস হইয়া যাইবে অমিতের জীবনে?

সব তল্লাসী ও পরীক্ষা শেষ হইল, আধ ঘণ্টাও লাগিল না। নিষিদ্ধ গ্রন্থগুলিও এবার অমিত খাতায় স্বাক্ষর করিয়া গ্রহণ করিতে পাইবে। 'চলন্তিকা', জওহরলালের 'আত্মজীবনী' ফেরত পাইল; আই-বি-র নির্বিচার নিষেধাজ্ঞায় ইহাও একদিন নিষিদ্ধ ছিল। সেদিনকার গোয়েন্দা কর্মচারীর মেজাজ ছিল তিক্ত: পিণ্ডিদাসের মতো—পারিবারিক কারণে কি? না, ইহাই ব্যুরোক্রাসির ধর্ম। অত বিচার বিবেচনার প্রয়োজন নাই—যে বই বন্দীরা চাহিবে, তাহাই বন্ধ করিয়া দিবে। নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে করিতে তাই অমিতের হাসি পাইল—বিধাতা, তুমি শুধু রসিক নও, বিদ্রূপ-বিলাসীও। এত মূঢ়তা যদি এতখানি রূঢ়তার সঙ্গে না জুটাইয়া দিতে তাহা হইলে এই গোয়েন্দা-বিভাগকে এত ঘৃণা সত্ত্বেও এতটা তুচ্ছ করা চলিত না। সেই মানুষগুলিকে শ্বাপদই ভাবিতাম, বুঝিতাম না তাহারা ইতিহাসের সঙ, দিবালোকের শৃগাল।

জেলের কর্মচারীরা একে একে নমস্কার করিতে লাগিলেন। শরৎ গুপ্ত আর একবার বলিলেন, বাড়িতে খবর গিয়েছে (অর্থাৎ তিনিই পাঠাইয়াছেন)—তাঁরা নিশ্চয় খবর পেয়েছেন। সাহেব ওয়ার্ডররা আগাইয়া আসিল। করমর্দন করিল, বলিল: আর এসো না কিন্তু। এ তো নরক। এ-কাজ করতে চাই না—একদিনও।

ফটকের শিখ ও পাঠান সিপাহী ফটক খুলিতে খুলিতে হাসিল। অমিতের অন্তরে শিহরণ জাগিতেছে,—সে বাহিরে পদার্পণ করিতে গোয়েন্দা পুলিশ জানাইল—এদিকে। আমাদের গাড়ি রয়েছে। একবার আমাদের আপিসে যেতে হবে। রায় বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করবেন।

আবার সেই আপিস, সেই রায় বাহাদুর!...অমিত দাঁড়াইল। আবার

সেই।…তথাপি এই তো সম্মুখে মুক্ত প্রাঙ্গণ, মুক্ত আকাশ—মুক্ত মানুষের পথের প্রারম্ভ…

এইখানে…কী হইল?…মা!

অমিত দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে।

অশ্রুস্ফীতমুখী মা…

অশ্রুস্ফীত নয়নের বাঁধ-ভাঙা অশ্রু উদ্গত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা ছাপাইয়া পড়িতেছিল—ওই দেবদারু তলের ছায়ায় আসিয়া। বেদনা-মথিত বুকের মধ্যে ঝড়ের মাতন মা আর ঢাকিয়া রাখিতে পারেন না। বহু বহু রাত্রি জাগা বিমলিন মুখের রেখাগুলি বুঝি ভিতরের ভাঙিয়া-পড়া আবেশের আঘাতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, বহু যাতনায় ভঙ্গুর দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। আছড়াইয়া পড়িতেছে আর মাথা খুঁড়িয়া পড়িতেছে—ওই দেবদারুতলার শীর্ণ ছায়াখানি হইতে,—ওই পাটল পথপ্রান্ত হইতে—এই কারা ফটকের তটভূমিতে জন্ম-জন্মান্তরের মানব মমতা, বাংলা দেশের মাতৃহৃদয়ের অসহায় ব্যাকুলতা, দীর্ঘশ্বাস, অভিশাপ—ও আশীর্বাদ!

ভাঙিয়া পড়িবেন‥ ভাঙিয়া পড়িলেন কি, অমিত, তোমার মা?

পাঁচ বৎসর পূর্বে মাত্র একবারের মতো,—আর তাহাই শেষবারের মতো—অমিতকে জেলে দেখিতে আসিয়াছিলেন তাহার মা—। অমিত তখন এই জেল হইতে চালান যাইবে দেশান্তরে—কোথায় কতদূরে তিনি জানেনও না। সৌভাগ্য বলিতে হইবে অনেক মা তখনো তাঁহাদের সন্তানকে দেখিতে পান নাই; অমিতের মা তবু অমিতকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনু, মনুও দাদাকে দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু পিতা দেখিতে পাইলেন না,—এক সঙ্গে তিন জনের বেশি সাক্ষাতে অনুমতি পায় না, তাই। ফটকের বাহিরে এইখানটিতে বাবা দাঁড়াইয়া রহিলেন। দূর হইতে এক নিমেষ অমিতকে হয়তো দেখিতে পাইবেন, এই আশায়। সাক্ষাৎ শেষে অশ্রুমুখী মাও তাই এইখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। জেলের রুদ্ধ ফটকের মধ্যে যতক্ষণ অমিত অন্তর্হিত না হয় ততক্ষণ গরাদের ফাঁকে অমিতকে তিনিও দেখিবেন। যতক্ষণ চক্ষে দেখা যায় ততক্ষণ চক্ষু ফিরাইবেন কি করিয়া? আর তাহার পরে—চক্ষুই

বা আর কী দেখিবে?…স্থির দৃষ্টিতে মায়ের পার্শ্বে অমিতের ভাই ও বোন স্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। আর অবিকম্প স্থির প্রদীপ-শিখার মতো সকলের পিছনে—সকলের হইতে স্বতন্ত্র, একটু দূরে—দণ্ডায়মান অমিতের পিতা। নিকটে আসিবার, একটি কথা বলিবারও অধিকার তিনি পান নাই। প্রকৃত-পক্ষে অমিতকে এভাবে চক্ষে দেখাও তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ। ওই গরাদের ফটকের মধ্য হইতে সিপাহী, প্রহরীর ও গোয়েন্দা কর্মচারীর বাধা ও নিষেধ অবজ্ঞা করিয়া তথাপি অমিত এইখানে অগ্রসর হইয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাহার যত শাস্তি হউক পরে এই অপরাধে পিতা তাহাকে দেখিতে পাইবেন। হাসিয়া দুই হাত তুলিয়া পিতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছিল—পিছনের দুয়ার তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য তখন অধীর আগ্রহে মুখ ব্যাদান করিয়া আছে। আর বাহিরের পৃথিবীর এই প্রান্ত রেখাটিতে—এই দেবদারু ছায়ার তলে জেল গেটের সম্মুখে—ভাঙিয়া-পড়া তরঙ্গের মতো পিতার চরণপ্রান্তে পড়িয়া যাইতেছিলেন তাহার মাতা। শেষ-বারের মতো অমিত সেই তাঁহার মুখ এই পৃথিবীতে দেখিয়াছে…এইখানে ওই জেলগেটের সম্মুখে।

ওইখানে…ওই দেবদারু ছায়ায়…ভাঙিয়া-পড়া তরঙ্গের মতো সেই মা!…

অমিতকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া গোয়েন্দা যুবক বলিল: এদিকে অমিত বাবু, ওই আমাদের গাড়ি—চলুন!

১

গাড়ি ছুটিয়াছে। বাঁক ঘুরিয়া রাজপথের বুকে পড়িয়াছে। কংক্রিটের সেতুর তলে আদিগঙ্গা শুইয়া আছে। বর্ষান্তের জলস্রোতে একটু স্থির গাম্ভীর্য আসিয়াছে। দুই পারের জীবনের মায়া নদীর নিশ্চল দৃষ্টির উপর ছায়া বিছাইয়া দিতেছে। মোটর গাড়ি উড়িয়া চলিল। ময়দানের সম্মুখে পড়িতে না পড়িতে মোড় ঘুরিল। রৌদ্র-ছায়া-আঁকা লোয়ার সার্কুলার রোড।

অমিত নির্বাক। নির্নিমেষ চক্ষুর সম্মুখে ক্রম-প্রকাশিত পথ, ক্রমোদ্‌ঘাটিত পৃথিবী, চোখের তারায় সেই পথ ও পৃথিবীর চলমান ছায়া জাগিয়া জাগিয়া মুছিয়া যাইতেছে। অমিতের অচঞ্চল দৃষ্টিতে তখনো ফুটিয়া আছে সেই দেবদারু-ছায়ার অশ্রু-মথিত, বেদনা-মথিত মায়ের মুখ।

সেই মুখ আর অমিত দেখিবে না, সেই মুখ আর দেখিবে না। এই সত্যটা এতক্ষণ এমন করিয়া তাহার চেতনায় পরিব্যাপ্ত হইয়া ওঠে নাই। মায়ের স্মৃতি যতই দিনে দিনে তাহার অন্তরে শ্বসিয়া উঠিয়াছে, অমিত ততই উহাকে ঠেলিয়া আরও দূরে সরাইয়া দিয়াছে। ততই তাহার নিকট এই কথাটাও সহজ হইয়া উঠিয়াছে; মা কাহারও চিরকাল থাকেন না। "Life marches", জীবন আগাইয়া চলে। সব পিছনে ফেলিয়া যায়, সকল বন্ধন সে ছাড়াইয়া চলে। অমিত আগাইয়া চলিয়াছে। কাঁটাতারের মধ্যেও তাহার জীবন আগাইয়া গিয়াছে,—আগাইয়া গিয়াছে তাহার মন, তাহার বুদ্ধি, তাহার আত্মা। কিন্তু সেই আগাইয়া-যাওয়া জীবনের গহনতলে, গহনতর চেতনায়, জীবন বুঝি পুরাতন বন্ধনকেও আগাইয়া লইয়া আসে। তাই সেই দেবদারু ছায়া, সেই অশ্রু-মাখা মায়ের মুখ সেই দীর্ঘশ্বাসভরা মায়ের বুক অমিতের দিন ও অমিতের রাত্রির সঙ্গে জড়াইয়া রহিবে। অমিতের এই আগাইয়া-যাওয়া জীবন, অমিতের ক্রমোদ্‌ঘাটিত পৃথিবী মায়ের সেই স্মৃতিকে মুছিয়া মুছিয়াও আবার তাহা প্রগাঢ় তীব্র করিয়া তুলিবে।

কর্কশ চীৎকারে আত্মঘোষণা করিয়া গোয়েন্দা-গাড়ি থামিয়া পড়িল। অমিত চমকিয়া উঠিল, যেন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া গেল। সম্মুখে চৌরঙ্গী। দক্ষিণে ও উত্তরে আপিস যাত্রী শেষট্রামের সার চলিয়াছে। দোতলা একতলা বাস লঘু-পক্ষ বিহঙ্গের মতো দুই দিকে চলিয়াছে। আর ট্রাফিক পুলিসের ইঙ্গিত অপেক্ষায় পূর্বে-পশ্চিমে থামিয়া পড়িয়াছে অধীর মোটর গাড়ির অধীর আরোহীরা; অধীরতর তাহাদের ড্রাইভার, গর্জমান যান্ত্রিক যান।

অমিত এই প্রথম স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইল—নূতন পৃথিবী, নূতন পথ, প্রাণের অভিযান।

সেই চিরদিনকার চৌরঙ্গীই কিন্তু! সেই ট্রাম, সেই বাস, সেই মানুষ

আর সেই পৃথিবী। মানিতে হইবে—সবই সেই, সবই সেই, অমিতের পূর্ব পূর্ব দিনরাত্রির চেতনার সাক্ষী ও সম্পদ সবই সেই। একটা নৈরাশ্য জাগে কি মনে? না, জাগে একটা কৌতুক?··· সেই তোমার চিরদিনকার পৃথিবী —সেই চিরকালের বাঙলা দেশ—অনেক কান্না যাহার চাপা পড়িয়াও চাপা পড়ে নাই লালবাজারী দাপটে, চোরাবাজারী কপটতায়,—কই তাহার আত্মার আগমনী? তাহার সেই অশ্রুশুষ্ক মুখে সেই বিরহের দিন রাত্রির স্মৃতি কই? —অমিতের মনে কৌতুক জাগে—সব সেই, সব সেই। তুমি গ্যাখো বা না-গ্যাখো, তুমি থাকো বা না-থাকো, তোমার চরণ-চিহ্ন এই বাটে পড়ুক, বা না পড়ুক, সেই চিরদিনকার চৌরঙ্গী তেমনি রঙ্গময়ী। আলো ঝরিতেছে, বায়ু বহিতেছে, ট্রাম-বাস চলিতেছে, প্রাণ উপছিয়া পড়িতেছে—যেন কোন বিলাসিনী উদ্যান-বাটিকার মর্মর-কঠিন শুভ্র জলাধারের বুকে উৎসারিত কোন কৃত্রিম উৎস। কে নাচিবে, কে গাহিবে, কাহার দীর্ঘশ্বাসে মথিত হইবে নিশীথের কোন কক্ষতল, আর কাহাদের মত্ত হাস্যে আবিল হইয়া উঠিবে কোন মধ্যাহ্ন-সভা,—কিছু যায় আসে না। সেই অর্ধাবৃত প্রস্তর-রমণীয় কক্ষস্থিত জলাধার হইতে জল ঝরিয়া পড়িবে দিবারাত্রি; চিরদিন স্ফটিকে ফুটিয়া আছে উহার স্বচ্ছ হাস্য। চিরদিনের মতোই চৌরঙ্গীও তেমনি রঙ্গময়ী—প্রাণচঞ্চলা। আর তাই যেন দেখিয়াও শেষ করা যায় না তাহাকে,—এত অপূর্ব।···

বাধামুক্ত গাড়ি গর্জন করিয়া আবার চলিল। লোয়ার সার্কুলার রোডের মসৃণ ঐশ্বর্যকে চোখ মেলিয়া দেখিতে না-দেখিতে এলিসিয়াম রো'র ছায়া-সুনিবিড় তপোবন-শান্ত পথ দিয়া আসিয়া গাড়ি বন্ধ ফটকের দুয়ারে দাঁড়াইল। গুর্খা সান্ত্রী ভিতরের ফটক খুলিয়া দিল।

গোয়েন্দা দপ্তর। অমিত পূর্বেও ইহা দেখিয়াছে। প্রায় ছয় বৎসর পূর্বে এই জেল হইতেই শেষবার এখানে আসিয়াছিল—তাহাও নির্বাসনের নিয়মিত উপক্রমণিকা। গোয়েন্দা-চক্র তখন জ্ঞাপন করিয়াছে—'এখনো আত্মসমর্পণ কর এইখানে—ত্রাণ পাইবে।' কিন্তু তাহার পূর্বেও এইখানে অমিত আসিয়াছে। গ্রেফতারের পরে এখানেই প্রথম আসিয়াছিল। এক সপ্তাহ এখানে একটা জেলে কাটাইয়া বিদায় লইয়াছিল জেলার জেলে—সেখানে দেড়

মাসের মতো নির্জন কক্ষে আবদ্ধ রহিবার জন্য। তখন অমিত জানিত না এখান হইতে সেবার কোথায় সে যাইতেছে। জানিত শুধু—পিছনে ফেলিয়া যাইতেছে ঐ পার্শ্বের বাড়িতে তাহার সাতদিনের বাসভূমির এক সংকীর্ণ নির্জন কক্ষ। এ বাড়ির নয়, ওবাড়ির সেই পিছন দিকটায় দিনের বেলায় তাহার ডাক পড়িত। কোনো একটা ঘরে অমিত একা বসিয়া থাকিত। দিনে দশ পনের মিনিটের জন্য একবার শুনিত 'রায় বাহাদুরের' ফিলজফি ও পলিটিক্স আলোচনা। রাত্রি বেলায় সেই সাতদিন সাত রাত্রি তাহার সহিত পালা করিয়া জাগিয়াছে 'সেলের' লোহার ফটকের সম্মুখে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া রায় বাহাদুরের জন কয় শিকারী অনুচর। সাত রাত্রি ঘুমাইতে না দিয়া তাহাকে ক্রমাগত স্নায়ু সংঘাতে খিন্ন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে।

প্রথম প্রথম অমিতের চক্ষে কৌতূহল জাগিয়াছিল,—কেমন চমৎকার সবল পুরুষ ইহারা! ধোপ-দুরস্ত চেহারা, আর ধোপদুরস্ত সদালাপ। কিন্তু কেমন সম্পূর্ণ করায়ত্ত ইহাদের ইতরতা, আর সুপরিকল্পিত ইহাদের বর্বরতা। কত ঘষিয়া, কত মাজিয়া এই গোয়েন্দার শিষ্টাচার তৈয়ারি হয়। আর কত মাজিয়া তৈয়ারি হয় এই গোয়েন্দার মিথ্যাচার। মানুষে আর পশুতে কেমন মিলিয়া-মিশিয়া উহাদের জীবনটাকে ভাগ করিয়া লইয়াছে; অথচ কোনো-খানে দুই জীবাত্মায় মিলিয়া যায় না। আশ্চর্য উহাদের দেবতার প্রতি ভক্তি; আশ্চর্য ইহাদের পারিবারিক নিষ্ঠা। প্রায় সকলের নিষ্কলুষ চরিত্র। পুলিশ হইলেও মদ্য ও মেয়েমানুষ ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। ভারত-সম্রাটের শ্বাপদ-বৃত্তিতে "চরিত্রবান" লোক ছাড়া অন্য কাহারও স্থান নাই। 'রায় বাহাদুরও' চরিত্রের দুর্বলতা সহ্য করিবেন না। আর, 'রায় বাহাদুর দেবতুল্য মানুষ'—'সকাল বেলা আড়াই ঘণ্টা শিবপূজা করেন।'—কোন রাজবন্দী এই অনুচরদের মুখে এই রায় বাহাদুরের ভক্তি মাহাত্ম্যের কথা না শুনিয়াছে? তিনি যখন 'দেবতুল্য', তখন তাঁহার অনুচরেরাও প্রত্যেকেই দেবদূত। তাহাদের কণ্ঠস্বর সংযত, তাহাদের চলাফেরা সংযত, তাহাদের ইতরতা ও বর্বরতা পর্যন্ত সংযত—প্রয়োজনানুরূপ। এই বাড়ির দেয়ালে-দেয়ালে সেই সংযম-শিক্ষিতদের জয়গাথা অদৃশ্য অক্ষরে লিখিত।

অমিত অবশ্য তাহাদের সংযমশীলতার সামান্যই পরিচয় পাইয়াছে। এই সংযমী পুরুষেরা শুধু সাতদিন সাতরাত্রি নিদ্রার সুযোগ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল। ক্রমাগত প্রশ্ন করিয়াছে, 'সদালাপ' করিয়াছে, কিন্তু গায়ে হাত তোলে নাই, পাঠান রক্ষীদেরও সে কার্যে নিযুক্ত করে নাই। প্রহরে প্রহরে একজনার পর একজনা ইহারা আসিত, গরাদের বাহিরে আসন গ্রহণ করিত, সহাস্যে কুশল জিজ্ঞাসা করিত, তারপর প্রত্যেকেই একবার করিয়া বিস্মিত ব্যথিত হইত—তাই তো অমিতবাবু ঘুমাইতে পায় না,—কী অন্যায়, কী অন্যায়! তখন প্রত্যেকেই আবার নিয়মিত নীতিতে সেলের বাহিরের আসনে বসিত—অমিতের সঙ্গে 'সদালাপ' করিবে! নিদ্রাবঞ্চিত মস্তিষ্কে ক্রমাগত সে আলাপ শুনিতে শুনিতে হঠাৎ অমিতের মনে হইত—একি, সে কোথায়!

'ম্যাও'…

সামান্য গুপ্তচর হইতে শুধু পশুত্বের জোরে বিনোদ বল হইয়াছে এ-এস-আই, এ্যাসিস্টেণ্ট সাব ইন্‌স্পেক্টার। রাত্রি বারোটার পরে সে অমিতের সহিত দেখা করিতে আসে। অমিত কিছুই বলে নাই। ভদ্রতায় কোনো লাভ নাই; তাই বিনোদ বল এক একবার গোঙায়াইয়া উঠিতেছে, ক্রোধে ফুলিতেছে। আবার পরক্ষণে মৃদু হাসিতেছে, 'সব জেনে ফেলেছি আমরা, সব মজা টের পাবে সবাই।'…অন্ধকারে দেখা যায় শুধু এক জোড়া জলন্ত চোখ। কিন্তু বিনোদ বল কই? মানুষ কই?—'ম্যাও'। শুধু সেই কালো বিড়ালটা বসিয়া আছে। আমিতের মুখের উপর একজোড়া চোখ; ক্রূর, নিষ্ঠুর ছুরির ফলক তাহাতে ঝলসিয়া উঠিতেছে।…কতবার এমন হইয়াছে, সত্যই অমিত শুনিয়াছে,—কমলাকান্তের মতো শুনিয়াছে,—ওইখান হইতে বিনোদ বলের কথা শুনিতে শুনিতে সে শুনিয়াছে—মানুষের স্বর নাই, বিনোদ বলের কণ্ঠ মিলাইয়া গিয়াছে, একটা স্বর বলিতেছে—'ম্যাও!' অর্থাৎ তোমাকে পাইয়াছি তুমি আমার কবলে। আবার…'ম্যাও'।

বিনিদ্র ক্লান্ত মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রীর সেই অদ্ভুত জাগ্রতস্বপ্ন। বুঝিতেই অমিতের হাসি ছলকিয়া উঠিতেছে। অমনি কেমন করিয়া সেই কালো

বিড়ালটা বিনোদ বলের দেহাশ্রয় করিয়া গর্জিয়া উঠিয়াছে, 'কি হাসছিস্ যে? শালা কাওয়ার্ড!'

বিড়ালটা বুঝি এবার ফ্যাঁচ করিয়া উঠিল? আরও হাসি পাইয়াছে অমিতের। কিন্তু আরও নূতন নূতন রূপান্তর ঘটিতে লাগিল।

মাধব সরকার সোনার চশমার ফ্রেম মুছিয়া চশমা পরিতে পরিতে দুঃখ জানাইতেছে। কে বলে সেই বৃদ্ধ? বৃদ্ধ হইলেও চটপটে লোক মাধব সরকার। এই তো কেমন স্মার্টভাবে কথা বলিতেছে: তাই তো অমিতবাবু বাজে লোকের পাল্লায় পড়ে কি করলেন! এমন আপনার বিদ্যা, এমন আপনার পাণ্ডিত্য, বিলাতে গেলেন না কেন? যান না চলে এখনো? যাবেন? লেখাপড়া করতে হলে কিন্তু বিলাত যাওয়া উচিত। দেখুন ভেবে।—এবার মাধব সরকারের চোখটা মিটমিট করিতে লাগিল। তখনো রাত্রি নয়টা মাত্র—তিনদিন কি চারদিন ঘুম নাই অমিতের! কিন্তু শুনিতে অমিতের মনে হইয়াছে—একি, মাধব সরকারের মুখটা কেমন করিয়া উড়িয়া গেল? ঘাড়ের উপর চাপিয়ে বসিল একটা বৃদ্ধ মর্কটের মাথা। আর সেই মর্কটের নাকে চড়িয়াছে মাধব সরকারের সোনার চশমাটা, মিটমিটে তাহার চোখ।…মানুষ, না মর্কট!…

একবার মানুষ, একবার মর্কট!

অমিতের সমসাময়িক ছাত্র ভূপেন ঘোষ। অমিতকে সে জানাইল, এই পুলিশ লাইনে কিছু করিতে পারে নাই। করিবে কি করিয়া? তাহার নেশা তো অমিত দেখিয়াছে—প্রাচীন ভারতের সভ্যতা, শাস্ত্র, ইতিহাস সে ভালোবাসিত। এই জন্যই তো অমিতের সঙ্গে আজ ভূপেন ঘোষ তর্ক করিতে আসিয়াছে। গত রবিবারে 'নেশনের' প্রবন্ধটায় অমিত এসব কি আজগুবী কথা লিখিয়াছে? লিখিয়াছে যদি অমিত প্রমাণ দিক। একটা প্রবন্ধে সব প্রমাণ দেওয়া যদি সম্ভব না হয়? তাহা হইলে অমিত বড় গ্রন্থ লিখুক না?—বেশ তো, লিখুক অমিত গ্রন্থ। না, না। ভূপেন ঘোষের মতো অমিত যেন নিজেকে ক্ষয় না করে। অনেক বড় কাজ করিবার আছে অমিতবাবু জীবনে। এদেশের ইতিহাসকে জানা, বোঝা, লেখা,—নূতন করিয়া সৃষ্টি

করা। হাঁ, এই তো দেশ গঠন, জাতি গঠন, স্বাধীনতার বেদি নির্মাণ। এগিয়ে যান অমিতবাবু, বেরিয়ে যান। হাতে তুলে নিন আমাদের কালের ছাত্রদের শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব।'—চোখের কোণে একটা চোরা চাহনি, না? শুনতে শুনতে অমিত যেন বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে—কে কথা বলিতেছে? চিন্তাশীল ব্রজেন্দ্র রায়, না চতুর এ্যাটর্নি সাতকড়ি? এ কোন 'নিশার ডাক' অমিতের কানে? না, এ কোন রাত্রিচারী শৃগালের স্বর?···—মানুষ, না শৃগাল? মানুষ, না শৃগাল?···

অনেকদিনে অনেক বৎসরে একটু একটু করিয়া অমিতের কাছে সেই সাতদিনের এই মানুষগুলির স্মৃতি ঝাপসা হইয়া যাইতেছিল। আবার এখন মনে পড়িতে লাগিল। একবার পারা যায় না সেই মুখগুলিকে মিলাইয়া দেখিতে? সত্যই কি মার্জারের মুখ, মর্কটের মুখ, শৃগালের মুখ, উহাদের? আজ এই মুহূর্তে নিশ্চয় আবার মানুষের মুখেও তাহা পরিণত হইয়াছে! অথবা, মানুষের মুখোসেই এখন তাহা আবার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া।··· ইহাদের কোনটা কাহার মুখ? কোনটাই বা কাহার মুখোস?···

মেডিকেল কলেজ হঠাৎ জ্যোতির্ময়কে মুখ বাড়াইয়া দেখিল—কে ওই যুবকটা? আর অমনি কেন পালাইয়া গেল? চেনা-চেনা মুখ। না, মিথ্যা নয়। পরদিন নিজেই গোবিন্দ ধর নিভৃতে, সন্তর্পণে, জ্যোতির্ময়ের শয্যাপার্শ্বে আসিল। সহজভাবেই সে স্বীকার করিল,—জ্যোতির্ময় দেশে ছিল না; অনেক কথাই সে জানে না। জানে না গোবিন্দ ধরের পিতা বাতব্যাধিতে অচল হইয়া পড়িয়াছেন; জমিদারের কাছারিতে গোমস্তার কাজটুকুও তাঁহার গিয়াছে। জানে না গোবিন্দের মা অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন; গৃহকর্ম বিধবা বোনটিই করে। সে-ই বা যাইবে কোথায়? কিন্তু ছোট ভাইটি ফার্স্ট ক্লাসে উঠিয়া আর পরীক্ষা দিতে পারিল না। পাশ সে করিত, কিন্তু গোবিন্দ ধর তখন তাহার পরীক্ষার ফি জুটাইতে পারে নাই। এখন? এখন সম্প্রতি ভাইটিকে বাটায় এপ্রেন্টিস্ করিতে পারা গিয়াছে—এই আপিসেরই একজন বড় ইন্স্পেকটারের সুপারিশের জোরে। তিনি, গোবিন্দের মামার দেশের লোক, মাতারও পরিচিত।

মাস্টার তাগিদে ও তাঁহারই অনুগ্রহে প্রথম গোবিন্দ গুপ্তচরের বৃত্তি পাইয়াছিল —কলিকাতায়।

জ্যোতির্ময় শুনিয়াছে, 'দেশে যাই নি। দেশে ওকাজ করব কি করে আমি? সেখানে তুমি যে একদিন আমাদের কাঁধে হাত রেখে বলেছিলে স্বাধীনতার কথা স্বদেশীর কথা। বে-ইমানী করি নি সেই নিজের দেশের সঙ্গে, তোমার আমার কোনো সহচরের সঙ্গে। দেশের সঙ্গে বা জাতির সঙ্গেও বে-ইমানী করি নি—পারতে। ফিরে তো যাবে একদিন, গ্রামে জিজ্ঞাসা করো। তারপর বে-ইমানী করে থাকলে যেমন ইচ্ছা শাস্তি দিয়ো আমাকে।' —কলিকাতার পথে পথে তখন গোবিন্দ ঘুরিয়াছে, আই-বি'র গুপ্তচর হিসাবে, চোখ রহিয়াছে মানুষের উপরে। তখনকার দিনে সে বিশ-পঁচিশ টাকা পাইত। তাহাতেই তাহার পিতা, মা ও বিধবা বোন বাঁচিয়াছে। আর ভাইকেও একটা পথ করিয়া দিয়াছে। এখন? গোবিন্দ লেখাপড়া জানা কনেস্টবল হইতে পারে। অবশ্য সে পক্ষের বাধাও আছে,—তাহার স্বাস্থ্য। কিন্তু সেই পদের জন্য তাহার আগ্রহ নাই। ইতিমধ্যে সে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় মোক্তারি ক্লাসে পড়ে। একবার কিছু টাকা যোগাড করিয়া পরীক্ষা দিলেই সে পাশ করিয়া ফেলিবে। ফিবিয়া যাইবে আপনার মহকুমার কোর্টে। বড় কিছু না হউক, সামান্যভাবে খাইবার পরিবার ব্যবস্থা সে নিশ্চয়ই সেখানে করিতে পারিবে। পঁচিশ টাকা যোগাড় করিবার জন্য এমন লাঞ্ছনা সহিতে হইবে না। 'তোমাদের হাতে লাঞ্ছনা নয়ঃ তা সইতে হলে খেদ থাকত না। দেশের লোকের হাতেও আমাদের লাঞ্ছনা নয়; তাও তো আমাদের পাওনা বলেই মনে করতে পারতাম। কিন্তু অসহ এই ব্যবহার গোয়েন্দা এ-এস্-আই থেকে তাদের ইন্‌স্পেক্‌টার পর্যন্ত প্রত্যেকটি জানোয়ারের হাতে। কাকে কাকের মাংস খায় না, শুনেছি। গোয়েন্দা কিন্তু গোয়েন্দার মাংস পেলেই খুশী। অন্তত আমাদের মতো মড়ার উপর খাড়া না চালালে তাদের মনে সুখ নেই। সিংহের লাথি সহ্য হয়,—বুঝি যখন তোমরা অপমান করো;—কিন্তু শেয়ালের লাথি, ব্যাংএর লাথি?'...

গোবিন্দ ধর নিশ্চয়ই মোক্তারি পাশ করিবে; জ্যোতির্ময় তাহার

কথা অর্ধেকটা বিশ্বাস করিয়াছিল। হয়তো গোবিন্দ ইতিমধ্যে করিয়াছে? করিয়াছে কি? না, এখনো করে নাই? গোয়েন্দার গুপ্ত অনুচররূপেই এখনো কি সে সেইরূপ দিন যাপন করিতেছে?…

আঙিনার দুই একটি যুবকের দিকে অমিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল।… ইহাদের মধ্যে কি গোবিন্দ ধর আছে? ইহারাই কি কেহ গোবিন্দ ধর?— বিনোদ বলের মতোই গোবিন্দও সামান্য গুপ্তচর রূপে জীবন আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু, তখনো সম্মানে জীবন গঠন করিবার স্বপ্ন সে দেখিত।—দূর মহকুমার সাধারণ দরিদ্র মোক্তারের জীবিকা লাভ করিয়া সে তাহার অচল পিতাকে, অন্ধ মাতাকে, অসহায় ভগ্নীকে বাঁচাইবে; কনিষ্ঠাভ্রাতাকে মানুষ করিবে; আবার সম্মানের সংসার বাঁধিবে, মানুষের জীবন গঠন করিবে। ততক্ষণ? ততক্ষণ দেশবাসী ক্ষমা করুক তাহার গুপ্তচরবৃত্তি, আত্মদ্রোহিতা, এই মুখের উপর আঁটা মুখোস।…সত্যই গোবিন্দ তাহা রহিয়াছে কি? না, সেই মুখোসের সঙ্গে আপনাকে মানাইতে মানাইতে তাহার আর সেই মুখ ছিল না? …তাহা হইলে এইখানেই কি এখনো বিচরণ করিতেছে সেই গোবিন্দ ধর?… পার্শ্বের ওই দুয়ারে দাঁড়াইয়া চোরা-চাহনিতে এই মুহূর্তেই অমিতকে সে দেখিয়া লইয়াছে,—আগামী দিনে হয়তো পদে পদে সে অমিতকে অনুসরণ করিবে;— কে জানে সে-ই গোবিন্দ ধর কিনা? কে বলিবে এই লোকটার চতুর চোরা-চাহনিভরা মুখটাই মুখ, না উহা মুখোস?—উহার পিছনে আছে ভুপেন ঘোষের মতো কোনো শেয়ালের মুখ, কিংবা গোবিন্দ ধর-নামা কোনো মানুষের মুখ? ইহাদের কে মানুষ কে মুখোস? কোন মুখটা সত্যই মানুষের, কোন মুখটা সত্যই কোনো জলন্তচক্ষু মার্জারের? মিটমিটে তাকানো মর্কটের, কিংবা চুরি-করিয়া তাকানো কোনো শৃগালের?

অমিতের গাড়ির সঙ্গী আফিসের ভিতর হইতে ফিরিয়া আসিল। বলিল: রায় বাহাদুর বারোটার আগে আসবেন না। শিবপূজা না করে তিনি জলগ্রহণ করেন না।

অমিত মনে মনে যোগ করিল—আর 'রায়বাহাদুর দেবতুল্য মানুষ।' কই এখনো তাহা বলিল না যে এই লোকটা? অমিতের হাসি পাইল—

তারকেশ্বরের গুপ্তচরেরা সকলেই জগদীশ্বরের বিশ্বস্ত অনুচর, ইহা একটি পরীক্ষিত সত্য।

লোকটি বলিতেছিল: চলুন। আমাদের রায় সাহেবের সঙ্গেই দেখা করিয়ে দিই—কি হবে অতক্ষণ দেরি করে?

অমিত গাড়ি হইতে নামিল। লোকটিকে অনুসরণ করিল। পার্শ্বদ্বার দিয়া দ্বিতীয় একটা বাড়িতে গিয়া ঢুকিল। বড় একটা কামরার কাছে পৌঁছিতেই দ্বিতীয় একজন ভদ্রলোক তাহাকে সম্বর্ধনা করিল: এসেছেন? চলুন—রায় সাহেবের কাছে। অমিতের সঙ্গীকে বলিল, তুমি এখানেই থাকো।

নিশ্চয়ই এই নূতন লোকটি অন্তত ইন্‌স্পেক্‌টার হইবে। না হইলে এই সাব্‌ইন্‌স্পেক্‌টার পদের কর্মচারীটিকে 'তুমি' বলিয়া এমন অকুণ্ঠিতভাবে সম্বোধন করিতে পারিত না। বাঙালীর সম্বোধন সমস্যা লইয়া বাঙলা মাসিক পত্রে কয়েক বৎসর পূর্বে অমিত তর্ক দেখিয়াছিল। 'তুমি' ও 'আপনির' সমস্যা মীমাংসা করিতে না পারিয়া বাঙলার সম্পাদক ও সাহিত্য-পাঠকদের নিদ্রা লোপ পাইতেছে—যেকালে 'মার্কস', না, 'বেদান্ত' লইয়া বিনিদ্র রাত্রি ও কণ্টকিত দিন যাপন করিতেছিল সুনীল, শেখর, জ্যোতির্ময়েরা। অথচ, গোয়েন্দা পুলিশের নিয়মে কেমন সুমীমাংসিত হইয়া গিয়াছে এত বড় সম্বোধন সমস্যা। এক সঙ্গে কাল যাহারা বসিয়া কাজ করিয়াছি, আজ আমি যখন সেই গ্রেড্‌ ছাড়িয়া উপরে উঠিয়াছি,—হয়তো এখনো অস্থায়ী ভাবেই উঠিয়াছি—অমনি আমার পূর্বসহযোগী হইবে আমার সম্বোধনে 'তুমি', আর আমি থাকিব তাহার সম্বোধনে 'আপনি।' আমি ডাকিলে সে থাকিবে সম্মুখে দাঁড়াইয়া সাব্‌-অর্ডিনেট-সম্মত বিনয়ে, আর আমি থাকিব বসিয়া অফিসার-সম্মত গৌরবে।

কিন্তু বেশ ঐ ভদ্রলোকটি। অমিতকে কেমন সুন্দর সস্মিতমুখে সম্বর্ধনা করিল—যেন কত কালের পরিচয়। অথচ এই প্রিয়দর্শন, স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমান মানুষটিকে অমিত ইতিপূর্বে কোথাও দেখিয়াছে বলিয়া মনেও করিতে পারে না। অমিত পারিত কি ইহার সঙ্গে এমন পরিচিত, এমন চিরকালের চেনার মতো ব্যবহার করিতে?

পর্দা একটু তুলিয়া ভদ্রলোক অমিতকে লইয়া ঘরে ঢুকিল, পা টিপিয়া ভয়ে সম্ভ্রমে। দ্বারের বাহিরে যে দেহ এমন সমুন্নত ছিল দ্বারের এপারে আসিতেই তাহা বিনয়-সঙ্কুচিত হইল। প্রিয়দর্শন মুখখানাও একটা চতুর স্নিগ্ধ স্তুতিতে রূপান্তরিত হইয়া গেল।…চমৎকার!—অমিত মনে মনে স্বীকার করিল, চমৎকার!…মুখে আর মুখোসে এইরূপ পালা-বদল অমিত পূর্বেও দেখিয়াছে। আরও বেশিই দেখিয়াছে। 'রায় সাহেবের' নিকটে ঢুকিতে যতটুকু পা টিপিয়া ঢুকিতে হইল, যতটুকু দেহকে সঙ্কুচিত আনত করিতে হইল, মুখে ধরিতে হইল দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর মতো যতটুকু ভীত দৃষ্টি, কিংবা অনুগৃহীত অধস্তনেব মতো স্তুতি-স্নিগ্ধ চাহনি,—'রায় বাহাদুরের' ঘরে ঢুকিতে উহার মাত্রাই আরও বাড়াইতে হইবে: আরও বেশি পা-টিপিয়া ঢুকিতে হইবে; দেহকে আরও সঙ্কুচিত হইতে হইবে; আরও সন্তর্পণে দাঁড়াইতে হইবে; কিংবা আরও একটু সৌভাগ্যপুষ্ট অনুগ্রহভাজনের হাসি রাখিতে হইবে মুখে ফুটাইয়া।…

চমৎকার!—অমিত মনে মনে মানিল ও হাসিল।

রায়সাহেব কি একটা কাগজ চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া পড়িতেছিলেন। ঘরে পদপাত ও ছায়াপাত দুইই অনুভব করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি আচরণে তাহা তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিলেন না। কর্মব্যস্ত লোকের পক্ষে তাহা নিয়ম নয়। ইন্‌স্পেক্টর ভদ্রলোক খানিকটা ইঙ্গিতে, আবার খানিকটা রায়সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্যই অনুচ্চস্বরে অমিতকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিল,—বসুন।

অমিত বসিতে বসিতে শুনিল টেবিলের অপর দিককার কাগজে-ঢাকা সাহেবি পোশাকের মধ্য হইতে ঘোঁৎ করিয়া একটা শব্দ হইল। সম্ভবত সেই মুখ বলিল—'এ্যা?' যাহাই বলুক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ইন্‌স্পেকটর ভদ্রলোকের মুখ স্তুতির হাসিতে উদ্ভাসিত হইল, তাহার দুইটি হাত সংযুক্ত হইয়া একখণ্ড কাগজ-সুদ্ধ সমুত্থিত হইল কপালের দিকে।

সাহেবি পোশাকের সম্মুখ হইতে কাগজ সরিয়া গেল। একখানা মুখ প্রকাশিত হইল।…

'বাঙালী বুলডগ' হয় না? 'বাঙালী পাঁঠাই' কেবল হয়? বুলডগ কি

একমাত্র সাহেবদের দেশেই জন্মে? অমিত তাহা মানিতে পারিবে না। এইরূপ একটা বাঙালীসুলভ সাধারণ খর্বতার সহিত সাধারণ মুখাবয়ব থাকিলেও মুখ দেখিলেই বুলডগের মুখ বলিয়া চিনিতে পারা যায়—যদি চোখে থাকে এই দৃষ্টি,—সতত উদ্‌গ্রীব, সতত উৎকর্ণ, ইঙ্গিতে যুদ্ধোন্মুখ। ইংরেজ এদেশে অনেক-কিছু করিয়াছে! কিন্তু তাহারা স্পানিশ বা পর্তুগীজ নয়। দো-আঁশলা জাত সৃষ্টি করিবার অপেক্ষা তাহারা শ্বেত রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করায়ই বেশি পক্ষপাতী। সেই সাম্রাজ্যাধিকারীর বিশুদ্ধ রক্ত বিশুদ্ধ রাখিয়াই তাহারা সৃষ্টি করে দো-আঁশলা মানুষ, যেমন, দেশী আই-সি-এস্; যেমন লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাস; যেমন রায়সাহেব অম্বিকাচরণ সরকার—ইংরেজ শাসকের সৃষ্টি 'বাঙালী-বুলডগ্'।

কিন্তু বুলডগও হাসিতে পারে। কে বলিল, 'মানুষই একমাত্র জীব যে হাসিতে জানে।' ঠিক বলিয়াছেন হব্‌স্। উচ্চহাসি একমাত্র মানুষই হাসিতে জানে। কিন্তু মানুষ-বুলডগও একেবারে হাসি ভুলিয়া যায় না। ইংরেজের সৃষ্টি 'বাঙালী-বুলডগ' এই রায়সাহেবও বাঙালীর মতো সানুগ্রহ কণ্ঠে বলিলেন: কি মনোমোহন, কি চাই?

মনোমোহন একপদ অগ্রসর হইয়া কৃতার্থভাবে কহিল: অমিতবাবুকে নিয়ে এসেছি।

অমিতবাবু?—রায় সাহেবের দৃষ্টিটা চশমার মধ্য দিয়া একবার অমিতের দিকে হিংস্র কুটিল তীক্ষ্নতায় ছুটিয়া আসিল।—বুলডগের সন্দিগ্ধ সন্ধানী চক্ষু অমিতের মুখের উপর পড়িল। পরক্ষণেই তাহা আবার বাঙালী ভদ্রতার রীতিতে পরিবর্তিত হইয়া গেল: ওঃ, অমিতবাবু। নমস্কার! নমস্কার!

অমিত নমস্কার করিত, অভ্যাসবশেই নমস্কার করিত, তাহার হাত সেজন্য কপালের দিকে উঠিতেছিল। কিন্তু আরও তাড়াতাড়ি সেই যুক্তকর কপালে উঠিল সহজকণ্ঠে যখন রায়সাহেব জানাইলেন,—'নমস্কার, নমস্কার!' একটু পরাজিত, একটু বিমূঢ়ভাবেই অমিত অর্ধস্ফুটকণ্ঠে সঙ্গে সঙ্গে বলিল: নমস্কার।

তারপর?—রায়সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাড়ি চললেন?

অর্ডার পেলাম রেশ্‌ট্রিক্‌শান সুদ্ধ।

রায়সাহেব তাহার কথাতে কান দিলেন না: ছিলেন ভালো? কি বলেন?

ভালো ছিল অমিত? এবার অমিতের মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটিতেছিল। কিন্তু তাহা ফুটিতে পারিল না। আর তাহার ইচ্ছা নাই ইহাদের এখন বিদ্রূপ করে—এত বৎসর নির্বাসনের পরে সে দুর্বুদ্ধি কাটিয়া গিয়াছে। উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া রায়সাহেব নিজেই বলিলেন: তারপর, কি করবেন এবার, অমিতবাবু?

কি করিবে অমিত? ছয় বৎসরে তাহাই ঠিক করিয়াছে; কিন্তু সত্যই কি ঠিক হইয়াছে? তথাপি অমিত জানে এই প্রশ্ন উঠিবে। এখানে উঠিবে, অন্য লোক‌ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে। আর, এই প্রশ্নের একটা সাধারণ উত্তরও সে স্থির করিয়া রাখিয়াছে। অমিত বলিল: কি করব, আমি তা কি করে বলি? আপনারা কী করতে দেবেন, তার উপরই তো তা নির্ভর করে।

আমরা করতে দোব কেমন, অমিতবাবু? অমরা সরকারী পলিসী অনুসারে কাজ করি; যে রাজা, যে মন্ত্রী, আমরা তো তারই চাকর।

কত সত্য কথা; আর কত মিথ্যাও;—তাই না, অমিত? সত্যই তো তাহারা চাকর মাত্র; আর আরও সত্য—এই দেশে চাকরই কর্তা। তাই এই শাসন-ব্যবস্থার নাম 'নোকরশাহী'। যে-কোনো স্বাধীনজীবী দোকানী কিংবা মিস্ত্রি-কারিগরের অপেক্ষা এদেশে একজন পাহারাওয়ালার বা পিয়াদার ক্ষমতা বেশি, যে কোনো বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিকের স্ত্রীর অপেক্ষা সমাজে ও সংসারে বেশি সম্মান একজন ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রীর—খাঁ বাহাদুরনীর বা রায় বাহাদুরনীর। খাঁ সাহেব ফতে মহম্মদ বা রায়বাহাদুর যাদব দাসের সার্টিফিকেট তোমার 'সচ্চরিত্রতার' প্রমাণ; ডাক্তার মেঘনাদ সাহার পরিচয়-লিপি নয়, ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যও নয়। আর, সেই চর-গুপ্তচর-ইন্‌স্পেক্টরের তৈয়ারী ফাইলে, তুমি অমিত, তাহাদের চক্ষে শুধুই অমিত। অথবা, মাত্র 'ফাইল নং ৫১৩; স্পেশ্যাল কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল,'—ওই যাহা রায়সাহেবের সম্মুখে আগাইয়া দিতেছে মনোমোহন—লাল খেরুয়ায়

বাঁধানো; রামের অজ্ঞাত রামায়ণ। অথবা, ভারতবর্ষের এ-কালের মহাভারতের এই 'অমিতোপাখ্যান।'

রায়সাহেব কিন্তু ফাইল ছুঁইলেন না। নিজের পূর্বেকার কথারই জের টানিয়া বলিলেন : তাও এখন শেষ হোল। সাহেবেরা যাচ্ছে, এবার মজা টের পাবেন ক্রমশ—

অমিত কি কর্নেল পিণ্ডিদাসকে দেখিতেছে নাকি? পাঞ্জাবী ভাগ্যবান পিণ্ডিদাসও বুঝিতেছে, সাহেবদের মুরুব্বিয়ানায় ফাটল ধরিয়াছে। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা সম্বন্ধে তাহারও মনে সংশয় জন্মিয়াছে। সেজন্য কর্নেল পিণ্ডিদাস ইতিমধ্যেই সেই ভবিষ্যতের মতো করিয়া আপনার ভাগ্যতরী ভাসাইবার জন্য প্রস্তুতও হইতেছে। কিন্তু বুলডগ্ রায় সাহেব বুঝি এত সহজে প্রভু-পরিবর্তন মানিয়া লইতে পারিবে না! তাই দুঃখে ক্ষোভে অনুশোচনায় অভিসম্পাতে তাহার চিত্ত মথিত। 'মজা টের পাইবে' এবার তাহার দেশের নির্বোধ লোকগুলি…মজা টের পাইবে বৈ কি? অমিতও তাহা বুঝে। যাইবার নামে ইংরেজ সেইরূপেই 'যাইবে' যাহাতে দেশের লোক 'মজা টের পায়'; রাখিয়া যাইবে তাহার গলিত পূতিগন্ধময় শবের গলিত পূতিগন্ধময় অবশেষ—এই পচা, গলা স্বদেশী চাকর-তন্ত্র; হয়তো তাহাদেরই মতো পচা-গলা নূতন এক মুনিব দল।

রায়সাহেব কিন্তু শ্লেষও করিতে জানেন,—আমরা স্বরাজ পাচ্ছি; নবাবী আমল ফিরে আসছে। দেখবেন এই ডিপার্টমেন্টেও আর আমরা থাকব না।…

কে ইহাকে বিলিতী বুলডগ্ বলে? এ যে বাঙালী বাড়ির গৃহপালিত দেশী কুকুর। নেড়ী কুকুরের পাল দেখিয়া আপনার অভিজাত্য রক্ষার জন্য যে প্রভুর গৃহে ছুটিয়া আসিয়া দুয়ার হইতে সদর্পে ঘোষণা করে আপনার বীরত্ব: 'ঘেউ'। তারপর, একটু মার খাইলেই যাহার কণ্ঠস্বর হইয়া ওঠে সানুনয় 'কেঁও কেঁও'। তখন লাঙ্গুল যায় পদদ্বয়ের অভ্যন্তরে; দেহ সংকুচিত হইয়া আশ্রয় লয় গৃহের অন্তরালে কোনো নিরাপদ সীমায়। এই তো সেই চিরদিনের 'চাকরে' বাঙালী, তোমার-আমার মতো চিরদিনের কুকুর বাঙালী, অমিত।

বুলডগের মুখের অভিযোগও এইবার অনুযোগে পরিণত হইল: কি করলেন আপনারা অমিতবাবু? একটা জেনারেশন শেষ করে দিলেন?

অমিত চমকিত হইল! একটা জেনারেশন বলি দিতে হইবে—ইহাই তাহারাও ধারণা ছিল? এই বহু জেনারেশনের সঞ্চিত আবর্জনা না হইলে দূর করা যাইবে না; বহু বহু ভাবী জেনারেশনকে এই আত্মার অবমাননা হইতে রক্ষা করিতে হইবে। সেই আত্মদানের মধ্য দিয়াই তাহাদের জেনারেশনের আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মোপলব্ধি।···কিন্তু শুনিতে না-শুনিতে অমিতের এই বিদ্যুৎগতি চিন্তার চমক নিবিয়া গেল। রায় সাহেব তখন দুঃখ করিতেছেন: হিন্দু ইয়ংম্যান, আর রইল কই? গিয়ে দেখুন দেশেগ্রামে। হিন্দু ভদ্রলোক আজ আর পরিবার পরিজন, মান ইজ্জত নিয়ে গ্রামে থাকতে পারে না?

রায় সাহেব অম্বিকাচরণ সরকার রীতিমতো ব্যথিত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। হিন্দুর মান ইজ্জত রাখিবার জন্য এই হাজার চারেক কিংবা হাজার পাঁচেক বাঙালী যুবক জীবনপণ করিয়া তাঁহার মতো সাহেবের সেবা করিল না। কী দুর্ভাগ্যের কথা জাতির! —হাসি পাইতেছে কি, অমিত? থাক; আর সেই দুর্বুদ্ধিতে কাজ নাই এখন। অমিত নীরবে শুনিল, হাসিও গোপন করিল। না, রায় সাহেব অম্বিকাচরণ সরকার ইংরেজের পদলেহী নয়; শুধু হিন্দুসমাজের দায়েই তিনি জীবনে এই গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন।

হঠাৎ রায় সাহেব অমিতকে প্রশ্ন করিলেন: বিয়ে করেন নি কেন?

অমিত এই আকস্মিক প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। না হইলে অভ্যস্ত উত্তরই দিত, 'বিয়ে পেলাম কই?' কিন্তু প্রশ্নটা বড় আকস্মিক আসিল। হিন্দুর এতখানি সামাজিক ব্যথা-বেদনায় উদ্বিগ্ন রায় সাহেবের মুখে হঠাৎ এমন একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন! কিন্তু রায় সাহেবের মুখ ততক্ষণে গম্ভীর হইয়াছে: বিয়ে করেন নি কেন? সমাজের একটা যোগ্য লোক আপনি! সংসার করুন, ঘর বাঁধুন, সমাজে সুস্থ আবহাওয়া, পবিত্র জীবন আবার ফিরিয়ে আনুন।

'হোলি ফ্যামিলি'?···শশাঙ্কনাথ, কোথায় তুমি? এইখানে, এই আপিসে এই রায় সাহেব অম্বিকাচরণ সরকারের মুখে গৃহ-বন্ধনের প্রশস্তি একবার

শুনিয়া যাও। ইহাঁদের অপেক্ষা দাম্পত্য জীবনের সুস্থ স্তম্ভ আর কে আছে?

অমিতের কানে গেল রায় সাহেব বলিতেছেন: মেয়েগুলোর বিয়ে হয় না; কি করবে? শেষে পলিটিকসেও আপনারা ছেলে-মেয়ে নিয়ে খেলা শুরু করে দিলেন, অমিতবাবু? কোথায় গেল আপনাদের সে যুগের ব্রহ্মচর্য, সেই আত্মসংযম, তপস্যা?

এবার অমিতের অসহ্য হইল। কিন্তু তথাপি অমিত মাথা খারাপ করিল না। ছয় বৎসরে মাথা এখন কিছুটা ঠাণ্ডাও হইয়াছে। অমিত বোঝে, সহজে যেখানে-সেখানে তাহা গরম করা সুবিধার কাজ নয়। তবু সে বলিল: বরং এইভাবে দেখুন না কেন ব্যাপারটা।—এমন প্রকাণ্ড, অপরাজেয় সত্যের অর্থ কি? 'ড্রেন ইন্‌স্পেক্টারের রিপোর্টই' শুধু দেখছেন কেন?—আর সে ড্রেনও যখন একটা পচা-গলা শাসন-ব্যবস্থারই রচনা—

মুহূর্তমধ্যে বুলডগের চোখ জ্বলিয়া উঠিল। সন্দিগ্ধ শিকারী কুকুরের দৃষ্টি সেই চক্ষে আবার ঝকঝক করিতে লাগিল। রায় সাহেবের কালো মুখের মাংসপেশী লৌহদৃঢ় হইয়াছে। কিছু না বলিয়া তিনি ফাইলটা তুলিয়া লইলেন। মনোমোহন পর্যন্ত প্রমাদ গণিল। খুলিলেন প্রথম পাতাটা। অমিত বুঝিতে পারিল তিনি তাহা পড়িতেছেন না। শুধু আপনার মন স্থির করিয়া লইবার জন্যই একটু সময় লইতেছেন।

ফাইল হইতে চোখ তুলিয়া আবার যথাসম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠে রায় সাহেব বলিতে গেলেন: যান।

সেই কণ্ঠ তেমন পরিষ্কার হইল না। তিনি ফাইল সশব্দে ফেলিয়া দিলেন টেবিলের উপর হইতে মেজেতে, মনোমোহন তাহা অমনি কুড়াইয়া তুলিয়া লইল। রায় সাহেব বলিলেন: যান, কমিউনিজম্ করুন গিয়ে এবার। —কিন্তু দেখ্‌বেন রেশট্রিক্‌শানগুলি ভেঙে আমাদের বিপদে ফেলবেন না। সাহেবরা তো কাউকে ছার্ড়তে চায় না। আমরাই ছাড়তে জোর করছি। দেখবেন,—আমাদের বিপদ ঘটাবেন না।

বলিতে বলিতে অনেকটা পরিষ্কার হইল সেই স্বর। রায় সাহেব বলিলেন, কয়টা মাস একটু সাবধানে থাকবেন। না হয় লেখাপড়াই করুন না এবার?

মনোমোহনের চোখ হইতে অমিত উঠিবার ইশারা পাইয়াছিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিতে করিতে বলিল, ইচ্ছা তো ছিল। এতদিন ইচ্ছামতো বইপত্র পাই নি, দেখি এবার। নমস্কার।

নমস্কার।

অমিত বাহির হইয়া আসিল। ঘরের বাহিরে আসিয়া মনোমোহন চলিতে চলিতে বলিল, এত তর্কও করেন আপনারা— কমিউনিজম্ ধরে অবধি।

অমিত তর্ক করিল, কোথায় ? কিন্তু এই তর্ক অপেক্ষাও অমিতের কৌতুহল জাগিল শেষ কথাটুকুতে 'কমিউনিজম্ ধরে অবধি',—

আপনাদের তাই মনে হচ্ছে বুঝি ?—জিজ্ঞাসা করিল অমিত।

মনোমোহন অমিতকে শিক্ষিত বলিয়া মানে। তাই অমিতের সম্মুখে নিজেকেও বুদ্ধিমান, শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিবার ইচ্ছা তাহার কম নয়। সময় পাইলেই তাহা দিত। কিন্তু সে দেখিয়া হতাশ হইয়াছে রায় সাহেবের উপরেও অমিত কথা বলে—এই সময়ে এখনো আবার সেই তর্ক ! কমিউনিস্টদেরই এরূপ দুর্বুদ্ধি হয়। তথাপি মনোমোহন অমিতকে সাহায্য করিতেও চায়। সে তাই বলিল : কি হয়েছিল ? ওঁরা সেকেলে মানুষ ; বলেছিলেন নয় আপনাকে একটা কথা। অমনি তর্ক বাধালেন। বাড়ি যাচ্ছেন, এ সময়ে এ সব না করলে কী ক্ষতি হত ?

অমিত ছল-অনুতাপে বলিল : তাই তো, বড় ভুল হল, না ?

না, না, বিশেষ কিছু নয়। তবে যাচ্ছেন তো, নিজেই গিয়ে দেখবেন—কি হয়েছে দেশের ছেলেমেয়েগুলি !

অমিত গাড়িতে উঠিতেছিল, বলিল, কেন কি ব্যাপার ?

অমিত বাবু, ক্যাক্টেটার চাই, ক্যাক্টেটার চাই। তাই যদি জাতের নষ্ট হয়ে যায়, তবে জাতের থাকে কি ?

'ক্যারেক্‌টার' ! শেষে এখানে এই গোয়েন্দা আপিসে অমিতের শুনিতে হইল 'ক্যারেক্‌টার চাই, ক্যারেক্‌টার চাই।' ইহাই গোয়েন্দা আপিসের চূড়ান্ত রায় একালের যৌবনের সম্বন্ধে। গাড়ি স্টার্ট লইয়াছিল···অমিত নমস্কার বিনিময় করিল।

'ক্যারেক্টার চাই': হাসিবে, না, কাঁদিবে, অমিত!—অমিত নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল।—সত্য কথাই তো, ইহারাই তো এই গভীর তত্ত্বকথা বলিতে পারে—'ক্যারেক্টার চাই।' সকলেই ইহারা দেবতুল্য মানুষ দেবদ্বিজে ভক্তিমান, 'চরিত্রবান্',—মদ গাঁজায় আসক্তি নাই, কিছুতেই পরস্ত্রী লইয়া কেলেঙ্কারী বাধায় না। চরিত্রবান স্বামী, দায়িত্ববান পিতা। অর্থাৎ দাম্পত্য কর্তব্য পালন করিয়া ভারী অলঙ্কার ও দামি শাড়ি ইহারা যোগাইয়া থাকে। পুত্রকন্যাদের ভালো খাওয়ায়, ভালো পরায়, 'বাজে লোকের' সাহচর্য হইতে সযত্নে তাহাদের রক্ষা করে। চাকরে বা হবু-চাকরে পাত্রের হাতে সালঙ্কারা কন্যাকে সযৌতুক দান করে। আর নিজে গুলিতে মরিয়াও পরিবারের স্বচ্ছন্দ ভরণ ব্যবস্থা পাকা করে।...'কিং চার্লস্ প্রেমবান পতি, স্নেহশীল পিতা ;—ত্রিশ বৎসরের অত্যাচার, স্বৈরাচার বা কুশাসনে তবে ইংলণ্ডবাসীর আপত্তি করিবার কি ছিল?', সেই যুক্তি! অবশ্য ইহারা কেহ কিং চার্লস্ নয়, মেকলের এই তিরস্কারেরও পাত্র নয়। ইহারা ভারতেশ্বরের গুপ্তচর, জগদীশ্বরের অনুচর,—চরিত্রবান স্বামী, দায়িত্ববান পিতা, 'ক্যারেকটারের' গর্ব করিতে পারে বৈ কি? ইহারা গর্ব করিবে না, তবে কি গর্ব করিবে তোমার রঘু চোর—স্ত্রীর খোঁজ যে রাখে না, পরিবারের ধার ধারে না, চরসের ওস্তাদ, তোমাদের দশ-বিশ টাকার চুরি করা নোট বাঁচাইতে গিয়া ডাণ্ডাবেড়ি ও স্ট্যাণ্ডিং হাণ্ড-কাপ্ হাতে পরিয়া মানিয়া লয় এই 'ক্যারেক্টার-ওয়ালাদের' দণ্ড?...

'ক্যারেক্টার' কাহাকে বলে? শশাঙ্কনাথ বলেন, তিনি তাহা বুঝিয়া উঠিতেও পারেন নাই। তুমিই কি পারিয়াছ, অমিত? একদিন জানিতে, সিগারেট খাইলে ক্যারেক্টার নষ্ট হয়। স্কুল জীবনে শুনিয়াছিলে বাল্যজীবনের সহজ সখ্য এই পর্দা-ব্যাহত কৃত্রিম সমাজে যদি কৃত্রিম তীব্রতা ও বিকৃতি সঞ্চয় করিতে থাকে তবে তাহাই চরিত্রহীনতা। এই দেশের কৃত্রিম ও কর্তৃশাসিত সমাজে আপনা হইতেই তুমি তখন শিখিয়াছিলে—রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শকেও কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে নাই। ভালোবাসা লজ্জাজনক অপরাধ। ভালোবাসিয়া বিবাহ করাটা তো নিশ্চয়ই অপরাধ ; বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে ভালোবাসাও হিন্দুর পরিবারে সমাজে নিতান্ত কম অপরাধ নয়। কারণ, তোমার সমাজে কর্তারা

বিবাহ দিবেন, আর তুমি সেই সূত্রে পুত্রকন্যা উৎপাদন করিবে, উহাই নীতি নিয়ম। আর এই নিয়মে চলাই সচ্চরিত্রতা।···তবু ইহার মধ্যে আকাশ ফাটা বিদ্যুৎ নামিয়া আসিল। সেদিন এই সমস্ত ভালোবাসাবাসির উর্ধ্বে উঠিয়া তুমিও বিবেকানন্দের বজ্রবাণীর প্রতিধ্বনি তুলিয়া নিজেকে বলিয়াছিলে, 'অভীঃ, অমিত, অভীঃ'···ইহাই শেষ কথা জীবনের।' এখনো সেই শেষ কথা নিঃশেষিত হয় নাই। তবু ইহাও আজ তুমি জানো, অমিত, "only exploitation is immoral, exploitation of man by man." সর্বমানুষের সেই শোষণহীন মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠাতেই কি 'ক্যারেক্‌টার?' ইহাই 'ক্যারেক্‌টার?'

'ক্যারেক্‌টার' কাহাকে বলে, অমিত? 'শব্দ গন্ধ রূপ রস স্পর্শ—ইন্দ্রিয়ের সর্ব দ্বার সর্ব রকমে রুদ্ধ করে চলবে তুমি জীবনে?···অতটা ভালো ছেলে না-ই-বা হলে তুমি, ওগো ভালো ছেলে'···কে বলিয়াছিল তোমাকে?···অমিত স্মরণ করিল।

মাদাম্ পাবলোভা এদেশে আসিয়াছিলেন। তখনো অমিতের কাব্য-সঙ্গীত-চিত্র তৃষিত আত্মা আপনার এই রস পিপাসাকে সর্বদিকে স্বচ্ছন্দে স্বীকার করিয়া লইতে পারে নাই। নৃত্যকলার লীলারসে, নারীদেহের ছন্দসুষমায়, হাস্যরহস্যে বিমুগ্ধ হইতে অমিতের কেমন ভয়-ভয় করিত। অমিত কলেজের ছাত্র তখন। নৃত্যের টিকিট তাহার নিকট দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্যও। টিকিট কিনিয়া তাহাকে সঙ্গে লইবার জন্য জেদ করিতেছিল ইন্দ্রাণী—আর সাধ্য কি ইন্দ্রাণীকে কেহ ঠেকাইতে পারে?—'অতটা ভালো ছেলে নাই বা হলে তুমি, ওগো ভালো ছেলে।···বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি—সে আমার নয়।'···

অমিত সেই স্মৃতিকে দূরে সরাইয়া দিল। না, ইন্দ্রাণী নয়। মূঢ়তার দিন অমিতের তাহার পূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। তখন অবশিষ্ট ছিল শুধু একটা অভ্যাস।—না, ইন্দ্রাণী নয়।

···প্রণাম তোমাকে, রবীন্দ্রনাথ। জীবন-রসের আনন্দ-সায়রে, তুমি অমিতকে অন্তত মুক্তি দিয়াছ, গান্ধীবাদের কৃচ্ছ্র-সাধনার মধ্যেও তাহাকে এক মুহূর্ত তিষ্টিতে দেও নাই। প্রণাম তোমাদের, বন্দিশালার বন্ধুরা! তোমরা অমিতকে তাহার গৃহ-পথ, সহজ মানুষের সহজ জীবন, পিতা ভ্রাতা মাতার

সংসার পুনঃপ্রদর্শন করিয়াছ! আর প্রণাম তোমাদিগকে জেলের সতীর্থরা, রঘু ও গফুর, তোমরা অমিতকে মনুষ্যলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছ।...তাই বন্দিশালার চরিত্রচূড়ায় বসিয়া ঘৃণা করিতে পারি নাই রঘু চোরকে; আর অশ্রদ্ধা করিতে শিখি নাই এ কালের এই ভালোবাসাবাসি আর প্রাণ কাড়া-কাড়ির ভালোমন্দ বাহকদের।...ছেলেমেয়েগুলি কি ইয়াকিতে, বেহায়াপনায়, মন দেওয়া-নেওয়ায় বখিয়া যাইতেছে? যাক না বখিয়া। 'অত ভালো ছেলে নাই বা হল' এই ছেলেমেয়েরা। নাই বা হইল তাহারা রায় সাহেব অম্বিকাচরণ সরকার, কিংবা 'দেবতুল্য মানুষ রায় বাহাদুর'—পূজা না করিয়া যিনি জলগ্রহণ করেন না।...

কিন্তু একি কাণ্ড! অমিত দেখিতেছে না—চৌরঙ্গীর চলচ্চিত্র চোখের উপর দিয়া ফুরাইয়া যাইতেছে। ওদিকে রৌদ্র ঝলমল ময়দান যে শেষ হইয়া গিয়াছে, পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়াইয়া মোটরের ইঞ্জিন হাঁপাইতেছে। এদিকে ইলেক্‌ট্রিক ঘড়িটা এখনো দেখা যায়; ওদিকে দূরে দেখা যায় হাইকোর্টের চূড়া; উহার পার্শ্বে গঙ্গাতীরের জাহাজের মাস্তুল; আর সম্মুখে টার-ঢালা দীর্ঘপথ এই দ্বিপ্রহরের চৌরঙ্গী। সে পথও আকাশের নিচে হাঁপাইতেছে, উহার উষ্ণশ্বাস অমিতের মুখে চোখে আসিয়া লাগিতেছে। তবু এতক্ষণ অমিত দেখিবার অবসরও পায় নাই কোথা দিয়া ইতিমধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে কত বাড়ি, কত চিহ্ন, ট্রাম লাইনের পার্শ্বে পার্শ্বে ময়দানের ছায়াঢাকা পায়ে চলার পথ—অমিতের কত দিনের নির্জন সন্ধ্যার বন্ধু স্বপ্নাতুর সত্তার সাক্ষী!

প'নে বারোটা হচ্ছে—ঘড়ি মিলাইল গোয়েন্দা সহচর। হাতের ঘড়িটা মিলাইবে কি, কি অমিত? একবার সে সময় দেখিল ঘড়িতে—সে ঘড়িটা একদিন সুনীল হাতে পরাইয়া দিয়াছিল,—আর একটা ঘড়ির কথা স্মরণ করিয়া। তাহাও হাতে আর একদিন পরাইয়া দিয়াছিল আর এক জন, ইন্দ্রাণী—এইরূপ প্রীতিতে ভালোবাসায়। সে ঘড়ি গিয়াছে, সে ভালোবাসাও আজ একটা নিস্তেজ স্মৃতি। সে স্মৃতিতে আছে একটা নির্লিপ্ত নির্মলতা। আর সুনীলের দেওয়া এই ঘড়িতে কি আছে? ভালোবাসার টেস্টামেণ্ট? জীবনের কণ্ডিনেণ্ট?

মেলালেন না ?—গাড়ির সহচর জিজ্ঞাসা করিল। গাড়ি দম লইয়া আগাইয়া চলিয়াছে।

হাঁ,—মেলাব। এতদিন ঘড়ি মেলাবার দরকারও ছিল না। জেলখানায় তো দিন মাসের হিসাব নেই—অনির্দিষ্ট কালের জন্য সকল গতি বন্ধ। সেখানে দু-মিনিট 'ফাস্ট', কি দু-মিনিট 'স্লো'তে কি আসে যায় ?

ভদ্রলোক হাসিলেন। সহজ হাসি, অমিতের তাহা চোখে পড়িল। বলিলেন : এবার তো সময় ঠিক রাখতে হবে।

অমিত বলিল : অন্তত রাত্রি নটার হিসাব। নইলে আপনারা তা মনে করিয়ে দেবেন।

আমরা ? আমরা কী বলুন তো ? এসব রথী-মহারথীরা কি বলেন তাও বুঝি না, আপনারা কি করেন তাও জানি না।

অমিত চমকিত হইল। কথায় এ কেমন সুর ? কে এ ? গোবিন্দ ধর নয় তো ? অমিত গোবিন্দ ধরকে দেখে নাই, চিনে না। অমিতের কৌতূহল দুর্নিবার হইল। চৌরঙ্গী সম্মুখে, প্রসারিত হইতেছে দ্রৌপদীর বস্ত্রের মত। তবু অমিত প্রশ্ন না করিয়া পারে না : যদি কিছু মনে না করেন,—আপনার বাড়ি ?

মনে করার কি আছে ?—খুলনা।

নাঃ।—নৈরাশ্যে অমিত মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহা হইলে সে গোবিন্দ নয়। গোবিন্দ ধর ফরিদপুরের লোক। ইহারই বা তবে কি নাম ?

জিজ্ঞাসা করিতে পারি—আপনার নাম ?

চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী।

'গোবিন্দ ধর' নয়।—না, কিন্তু হয়তো আর একটা মানুষ পাইলে, অমিত, এই নামের সঙ্গে সঙ্গে। মুখোসের রাজ্যে দেখিতেছ হয়তো আর একটি মুখ—চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর মুখ—শ্যামল, সবল বলিষ্ঠ ভালোমানুষের মুখশ্রী।—ভাবিতেই অমিতের কেমন ঔৎসুক্য জাগিয়া উঠিল,—এই তো মনুষ্যলোক—বুলডগ নয়, কিন্তু কী মানুষ চন্দ্রকান্ত ? অমিত আলাপ করিতে উদ্যত হইল। তাহাই বুঝি চন্দ্রকান্তও চাহিতেছিল ; একটা মানুষের সম্মুখে নিজেকে মানুষ বলিয়া চিনিতে জানিতে তাহারও সাধ !

চন্দ্রকান্ত সবে প্রোমোশন পাইতেছে এ-এস্ আই হইতে এস্-আইতে; এখনো মাঝে মাঝে পূর্ব পদে নামিয়া যায়। আজও আসিয়াছে এ-এস্-আই রূপে। আজ একটু সে তাড়াতাড়ি ছুটি চাহিয়াছিল। বাড়িতে কাজ আছে; ছেলেটির ভাত হইবে। এইটিই প্রথম ছেলে, আগে একটি কন্যা জন্মিয়াছে।··

মায়ের ইচ্ছা ভালো করে নাতির ভাত করেন। দেশে গিয়ে করতে খরচ-পত্র অনেক। আমার সামর্থ্যে তা কুলোবে কেন? এখানে আই-বি ব্যারাকে থাকি। সে কোয়ার্টারে এ কাজ করলে আত্মীয় স্বজনকে আনতে পারব না। তারাও আসতে চায় না, আমারও আনতে সাহস হয় না। কিসে কি হবে, আর তখুনি প্রাণ নিয়ে টানাটানি। তাই কাজের বান্দোবস্ত করেছি মাসতুত ভাইএর বাড়ি—সেই টালিগঞ্জে। আত্মীয়-স্বজন তবু আসতে পারবে। আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিলেই ছুটি। ভেবেছিলাম নটা দশটার মধ্যে তা হয়ে যাবে।

সাধারণ মানুষের সাধারণ কথা, সাধারণভাবেই চন্দ্রকান্ত বলিতেছে প্রথম পুত্রভাগ্যের আনন্দ; দশজনকে লইয়া উৎসবের সাধ; আর জন্মগত উত্তরাধিকারের মতোই তাহার চাকরির এই কৃত্রিম বাধা ও অসঙ্গতিকে গায়ে না মাখিয়া উহারই ফাঁকে ফাঁকে, জীবনের বাঁকে বাঁকে সেই সাধারণ জীবনের সাধারণ সুখ দুঃখকে কোনো রকমে আহরণ;—ইহার বেশি কিছু নয়।—চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী, খুলনা জেলায় যাহার বাড়ি, আই এ পাশ করিয়াছিল ভালো। ফুটবল খেলিত চমৎকার, তাই ডসন্ সাহেব তাহাকে চাকরিতে ঢুকাইয়া লইয়াছিলেন। দেখিতে-শুনিতে স্বাস্থ্যবান, কর্মপটু। বেশি বুদ্ধি নাই, বেশি তীক্ষ্ণতা নাই, বেবি মাথাব্যথাও নাই সেই জন্য। একটু দুঃখ গোয়েন্দা কোয়ার্টারে দশজনকে লইয়া গল্প করিতে পারে না।—সে স্পোর্টসম্যান ছিল—খেলার জন্যই চাকরি পায়, দশজনের সঙ্গে মিশিত, গল্প করিত, হাসিতে-খেলিতে ভালোবাসিত—এখন কেহ তাহার সঙ্গে আর দেখা করিতেও আসে না।

আসবে কি? সেবার স্ত্রী বাপের বাড়ি গিয়েছিল। দু দিন পরেই কেঁদে-

কেটে ফিরে এল। পাড়ায় তার পূর্বেকার দিনের সখী ও প্রতিবেশিনীরা তাকে দেখলে মুখ বুজে থাকে। গ্রামের ছুটো ছেলে কিছুদিন আগে ধরা পড়েছে। সকলে বলে, 'নতুন কাকে ধরিয়ে দিতে এসেছে গোয়েন্দার বউ: তার ঠিক আছে?'

বিরক্তি ও ক্রোধের সঙ্গে চন্দ্রকান্ত বলিতেছিল। একটু থামিল। পরে সকরুণ ভাবে হাসিল, বলিল: আমরা আপনাকে ধরাবারই বা কি, ধরবারই বা কে? খেলতে পারতাম বলে তো চাকরি পেয়েছিলাম; কোথায় গেল সেই খেলা?

গাড়ি হোয়াইটওয়ে ছাড়াইয়া চলিয়াছে। সেই মেট্রো সিনেমা - যেখানে, অমিত জেলে বসিয়া এবার শুনিয়াছে, 'আমেরিকান্' ম্যানেজার বাঙালী ফিল্মফ্যান্দের 'জুতিয়ে' ডিসিপ্লিন শেখায়?' বাঙালীকে জুতাইবার লোক তবে আরও বাড়িতেছে। ইংরেজের পরে আসিতেছে আমেরিকানরা।

অমিত চন্দ্রকান্তকে জিজ্ঞাসা করিল: খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড এখন কেমন?

চন্দ্রকান্ত বলিবার মতো কথা পাইল। বলিয়া চলিল: বাঙালীরা গিয়াছে। এখন পেশোয়ার বাঙ্গালোর হইতে প্লেয়ার আসে। মোহামেডান্ স্পোর্টিং এর জয় জয়কার! বাঙালীরা খেলিবে কি? এই তো সে, চন্দ্রকান্ত···

গাড়ি ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে চিত্তরঞ্জন এভিন্যুতে। 'স্টেটসম্যান্' পূর্বভবন হইতে এই নূতন গৃহে আসিয়াছে। ইলেক্‌ট্রিক হাউস আগেও ছিল। স্যার আশুতোষের ধাতু-মূর্তি এখন পথের মোড়ে দাঁড়াইয়াছে,—উচ্চ মঞ্চেও, কিন্তু কোথায় সেই সতেজ ব্যক্তিত্ব? এখন জুতাইয়া ডিসিপ্লিন শিখায় আমেরিকানরা। মূর্তিটা যেন বৈশিষ্ট্যহীন, ব্যক্তিত্বহীন একটা বাহুল্যের পিণ্ড···নতুন পথটা তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে। মন্দার বাজারে সস্তা মালে ভাগ্যবানেরা বাড়ি তুলিয়াছে। খালিও পড়িয়া আছে—অনেক ব্যবসায়ী কোম্পানির বড় বড় জমি।···

অমিত বলিল: একবার কলেজ স্ট্রীট দিয়ে যেতে পারেন? ইউনিভারসিটির সামনে দিয়ে।

চন্দ্রকান্ত খেলার গল্প ছাড়িয়া সবিনয়ে বলিল: তা নিয়ম নয়। কেউ দেখে

ফেললে ?—তারপর একটু থামিয়া নিজেই বলিল : কি আর হবে দেখলে ? চলুন আজ। দেখুকগে যে খুশি !—খেলোয়াড়ের গায়ে না-মাখা ভাব চন্দ্রকান্তের এখনো রহিয়া গিয়াছে। খেলার গল্প করিতে করিতে এখন তাহা বুঝি জাগিয়া উঠিয়াছিল।

একেবারে কলেজ স্কোয়ারের সম্মুখে গিয়া পড়িল গাড়ি। পূজার বাজার লাগিয়াছে দোকানের শো কেসে। সেই সিনেট হাউস। বিশ্ববিদ্যালয়ের এখানে-ওখানে ছাত্রের মুখ, ছাত্রীর মুখ, ইতস্তত শাড়ি ও আঁচলের খানিক ছটা, ভ্রূক্ষেপহীন তারুণ্যের আপন কথায় আপন তর্কে মত্ততা, আর নির্বিকার দৃষ্টি তরুণ-তরুণীর স্বচ্ছন্দগতি, সহজ ভাষণ আপনাদের মধ্যে ;—সেই 'ক্যারেক্‌টারহীন' ছেলেমেয়েরা মুখ তুলিয়া কেহ তাকাইলও না। তাকাইলও না বুঝি সিনেট হাউস্ আর বিশ্ববিদ্যালয়ও মুখ তুলিয়া অমিতের দিকে। সে পিছনে ফেলিয়া যাইতেছে হেয়ার সাহেবের প্রতিমূর্তি ও প্রেসিডেনসী কলেজ।··

বাতিল হইয়া গিয়াছ, বাতিল হইয়া গিয়াছ, তুমি অমিত, এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জীবন হইতে। হয়তো তুমি উহার পুরাতন ক্যালেণ্ডারের পাতার শুধু একটা পোকায় কাটা নাম। তোমাদের বৎসরের ইতিহাসের এম-এ পাশ নামগুলির শিরোদেশে 'শৈলেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়' আর তারপরে তুমি। বস্, এইটুকুমাত্র তুমি আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে। আর, বিশ্ববিদ্যালয়ই বা তোমার নিকটে কি ? জীবনে যে পরিচয় তুমি আহরণ করিয়া আজ গৃহে ফিরিতেছ উহা কি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দান ?···বাতিল হইয়া গিয়াছে তাহার দেনা, বাতিল হইয়া গিয়াছে তোমার পাওনা···কোথায়ই বা সেই শৈলেন আজ ? ছয় বৎসর আগে সেবার বড়দিনের পূর্বে যে কলিকাতায় শ্বশুর গৃহে আসিয়াছিল, মুন্সেফির ডিক্রি ডিসমিশে মশগুল। কোথায় সে-ই বা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে, কোথায়ই বা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দান তাহার জীবনে ? কোথায় তোমাদের সেই সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত পরিকল্পিত বাঙলার ইতিহাস ?·· কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে অন্য সকলে ?·· সার্ভিস-পরীক্ষার দ্বার-পথে চাকর-রাজের দেশে আজ সেই কৃতী ছাত্ররা চাকর-লোকে প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছে। তাহারা এতদিনে লাভ করিয়াছে মোটা বেতন, মোটা পুরস্কার,… মোটা গৃহিণী। শৈলেন হয়তো এতদিনে সবজজ হইয়াছে—কোথায় তাহার সেই ইতিহাসের গবেষণা?…আর তুমি, তুমিই বা কোন প্রতিদান দিলে বিশ্ববিদ্যালয়কে? আর কি প্রোডিগ্যাল পুত্রের মতো তাহার ক্রোড়ে ফিরিবে, স্যার আশুতোষের আবক্ষমর্মর মূর্তিকে নমস্কার করিয়া দ্বারভাঙ্গা হলের দিবান্ধকার লাইব্রেরিতে তোমার বহু পরিচিত সেই গ্রন্থমালা খুলিয়া বসিবে? …সে লাইব্রেরিও নাকি এখন 'আশুতোষ ভবনে' আপন গৃহে সুস্থির হইয়াছে। তাহার প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত হইয়াছে ভারত ইতিহাসের গৌরবময় কাহিনী; এই কথা দূরে বসিয়া সংবাদপত্রেই শুধু পড়িয়াছ। সেই গৃহসজ্জা দেখিবেঁ না, দেখিবে না সেই চিত্রকলা, সেকালের অজন্তার একালে পুনর্জন্ম? না, একদিনের জীবনের অন্যদিনে বিজৃম্ভণ? অতীতের স্মৃতি-সুষমা দিয়া প্রতারণা বর্তমানের সৃষ্টি-চেতনাকে? লুকোচুরি খেলা একালের দৃষ্টির, একালের সৃষ্টির সঙ্গে?

'একালের দৃষ্টি, একালের সৃষ্টি'…থাক এই বিশ্ববিদ্যালয়, অমিত। এ জীবনে প্রধানতম গুরুগৃহ হইতে আজ স্নাতকের মতো তুমি প্রবেশ করিতে চলিলে বিশ্বের বিশালতম বিদ্যালয়ে—তোমার গৃহাশ্রমে। 'অভীঃ অমিত, অভীঃ।

গাড়ি মোড় ঘুরিতেছে—এখনি চোখে পড়িবে সেই গৃহ।

২

বহু পরিচিত পথের সেই বহু-পরিচিত গৃহের দুয়ারে আসিয়া গাড়ি দাঁড়াইল, অমিত তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। বাড়িটা অনেকটা ম্লান—হয়ত বর্ষার জলে। এপাশের ও পাশের বাড়িগুলিও যেন দীপ্তিহীন; তবে এত জীর্ণ নয়। শুধু জীর্ণ হয় নাই, দৈন্যও এই গৃহকে ক্ষয় করিয়াছে, অমিতের তাহা দর্শনমাত্র মনে পড়িল। সম্ভবত দুই-চারি বৎসর চুনকাম হয় নাই।…কই,

কেহ তো অমিতের অপেক্ষায় নাই। তবে কি তাহারা জানে না অমিত আসিবে? শরৎ গুপ্ত শুধু চালই দিয়াছে—শেষ মুহূর্তেও? কই, কেহ নাই, নাকি ওখানেও পথের উপরকার ঐ জানালায়?…

ওখানে ওই জানালায় নাই মা।…

ওই জানালায় বসিয়া থাকিতেন অমিতের মা, বসিয়া ছিলেন শেষ দিনকার দুপুরটিতেও: অমিত আসিতেছে।

অমিতের পা কাঁপিতে লাগিল, চোখ মুহূর্তের মতো দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিল, সমস্ত শরীরের এপারে-ওপারে বিদ্যুতের প্রাণঘাতী স্ফুরণ চলিতেছে। কিছু করিবে কি অমিত? কিছু বলিবে কি অমিত? চিৎকার করিয়া ডাকিবে কাহাকেও—এ জন্মের পার হইতে জন্মান্তরের পারে সেই স্বর পৌঁছিবে কি?

জানালায় একখানা মুখ ফুটিল—হয়তো মোটর থামিবার শব্দ কানে গিয়াছিল। আর মুহূর্তের মধ্যে সে মুখের উপর শরতের রৌদ্র-ঝলমল আকাশের সমস্ত আলো লুটাইয়া পড়িল। তারপর? উচ্চ কলকণ্ঠের আহ্বান তুলিয়া তুচ্ছ সিঁড়ির সোপান ভাঙিয়া, রুদ্ধ সদরের সুদৃঢ় কবাটের খিল খুলিয়া সম্মুখে আসিয়া অমিতের পায়ের উপর ভাঙিয়া পড়িল সেই সুগৌর তেজোময়ী তরুণীর মুখ, আর এক তেমনি আশ্চর্য শ্যাম সমুন্নত যুবকের মাথা।

অনু আর মনু।

এই অনু, এই মনু! এত বড়, এত সুন্দর, এতো বলিষ্ঠ। অমিত সবই জানিত। পত্রাক্ষরের মধ্য দিয়াও কি সে দেখে নাই এই এম-এ পাশ করা কনিষ্ঠের ক্রম-পরিণত সজীব দেহমন? দেখে নাই এই বি-এস্-সি ক্লাসের কনিষ্ঠার ক্রমোদ্ভিন্ন তেজোময়ী গরিমাময়ী মূর্তি? এই ব্যক্তিত্বের রূপরেখা চিঠির মধ্য দিয়াও হয়তো অমিত দেখিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তির প্রত্যক্ষ আবির্ভাবে সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত কল্পনা আর মিথ্যা সত্য হইয়া যায়। মিথ্যা হইয়া গেলে নাকি তুমিও, অমিত,—এই একটু আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে পৌঁছিয়া যেমন বাতিল হইয়া গিয়াছিলে—তেমনই এই তোমার নিজের গৃহচ্ছায়ায়? নিজের ভাই-বোনের সামনে দাঁড়াইয়া মনে হইতেছে না কি—কারামুক্ত কাবুলীওয়ালার

মীতা!—তোমার সংসারের পটভূমিও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, জীবনাঙ্গনে নতুন যৌবন প্রবেশ করিয়াছে, এবার এই রঙ্গমঞ্চে তোমারও পিছাইয়া দাঁড়াইবার দিন আসিল। আশ্চর্য, তুমি অমিত—চিরদিনের ন্যায় শীর্ণ ভঙ্গুর-দেহ বৈশিষ্ট্যহীন যাহার মুখ,—ইহারা তোমার ভাই আর বোন! হাসিবে, না কাঁদিবে, অমিত? নিজের তুচ্ছতায় লজ্জা পাইবে, না গর্বিত হইবে এই সৌভাগ্যে?

অমিতের চেতনার আকাশে ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎ মুহূর্তে মুহূর্তে এমনি করিয়া ঝলসিয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহা বুঝিবারও একটা স্বচ্ছন্দ অবকাশ অমিতের নাই। বুকে মাথা-রাখা, জড়াইয়া-ধরা সেই তেজোময়ী ভগ্নীর মুখখানি হাসিয়া কাঁদিয়া চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে। আর সেই বলিষ্ঠ, গর্বিত অনুজের চোখ বিস্ময়ে বিষাদে ছলছল করিয়া উঠিতেছে।

মায়ের জিজ্ঞাসাই বোনেব মুখে ফুটিল: একি চেহারা হয়েছে তোমার দাদা?

আফগানিস্তানের উপর পর্বতের পারে গিয়া কি কাবুলীওলাকে নতুন পরিচয়ের প্রার্থনা লইয়া আপন কন্যার কাছে দাঁড়াইতে হইবে? ভুল, কবি, ভুল!……

অনুর প্রশ্নেও অভ্যাস মতোই অমিতের মুখের উত্তর আসিয়া গেল: পাহাড়ের বৃষ্টিতে আর মরুভূমির রৌদ্রে সিজন্‌ড্, পাকা হয়েছে আমাদের শরীর—

কিন্তু একটা আবেগ উচ্ছ্বাস বুক ছাপাইয়া উঠিতেছে, চোখে জল দেখা দিতেছে। অবোধ বোনটি তাহার অবাধ্য আবেগের বন্যায় বুঝি অমিতকেও ভাসাইয়া দিবে। মায়ের নাম স্মৃতি মমতা এই মুহূর্তে তাহার এই তরুণ দেহখানির মধ্যে আকুলি-বিকুলি বাধাইয়া দিয়াছে। অনেক দিনের চাপা-পড়া সেই ঝড় অমিতের বুকের মধ্যেও গুমরাইয়া উঠিবে।

ওঃ! বাবা উপরে একা বসে আছেন!—নিজেকে ছাড়াইয়া লইল অনু। চলো, চলো, শীঘ্র চলো।

'শীঘ্র চলো।' কিন্তু অমিত কোথায় চলিবে? এই গৃহে পা বাড়াইতেই যে আজ তাহার পা থামিয়া যাইতেছে।—জানালায় মা নাই, গৃহমধ্যে মা

নাই,—কি করিয়া অমিত যাইবে সেই গৃহে ? আর, দাঁড়াইবে শূন্যগৃহে তাহার পিতার সম্মুখে—যেখানে তিনি বসিয়া আছেন একা !

মন্টু জিজ্ঞাসা করিল : দাঁড়ালে কেন, দাদা ? জিনিস-পত্র ?—তোমরা যাও। আমি সে সব নিয়ে আসছি। তুমি দাদাকে নিয়ে যাও, অনু !

অমিত চলিল।

চন্দ্রকান্ত একবার নমস্কার করিতে ভুলিল না। অমিতের তাহা চোখে পড়িল কি ? প্রতি-নমস্কার করিল কিনা অমিতের তাহা অন্তত আর মনে রহিল না।

অমিত চলিল। ধৌত, পরিচ্ছন্ন সিঁড়িতে একটি একটি করিয়া পা ফেলিয়া অমিত অনুর পিছনে পিছনে চলিল—গৃহ-পথে তাহার যাত্রা আরম্ভ হইল।

অনু বলিতেছে : সকালবেলা খবর পেলাম, তুমি সকালেই আসছ। বসে বসে আর সময় কাটে না। আসোই না তুমি ! বাবাকে খাইয়ে দিলাম।

একটা প্রক্ষালিত পরিচ্ছন্নতা সিঁড়িতে, মেজেয়, অঙ্গনে। কেহ আসিবে তাহা যেন জানা ছিল। চারিদিকে নতুন ধৌত পরিচ্ছন্নতা। কিন্তু কাহার এক-জোড়া বহু-চেনা হাত উহাতে তবু পড়ে নাই, তাহাও অমিত বুঝিতে পারে। সিঁড়ির পার্শ্বের দেয়ালের গায়ের কুলুঙ্গিতে অমিতের বাহিরের জুতা, জুতার পালিশ, ব্রুশ প্রভৃতি থাকিত ; তাহার সঙ্গেই থাকিত মায়ের পায়ের চাপালি।—কখনো-সখনো বাহিরে যাইতে হইলে মা তাহা পরিতেন। সময়মতো দুই-একবার অমিতই তাহা পরিষ্কার করিত ;—শেষের দিকে তাহাতেও অমিত অমনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। কাঠের ঢাকুনিতে কুলুঙ্গির জুতা ব্রুশ প্রভৃতি বন্ধ থাকিত। সে ঢাকুনিটি এখন ভাঙিয়া গিয়াছে ; এখানেও অন্য জুতা আসিয়াছে—মন্টুর, অনুর ; মায়ের পায়ের সে চাপালি জোড়া আর নাই। কলেজ স্ট্রীটের একটি দোকান হইতে শেষ জুতা জোড়া অমিত মায়ের জন্য কিনিয়াছিল। শেষবার তাহা দেখিয়াছে মায়ের পায়ে জেলের সাক্ষাৎকালে। বাঁধুনির সোনালী পালিশ তখন ম্লান হইয়া গিয়াছে। তবু সেই সোনালী বাঁধুনির মধ্যে শেষবার অমিত দেখিয়াছে একজোড়া অনাবৃত অনাদৃত বহুদিনের গৃহকর্মে কয়িত অক্লান্ত চরণ। বয়সে দুঃখে উদ্বেগে সেই পা দুইখানিতে, ক্লান্তি

আসিয়াছে, ক্লান্তি আসিয়াছে; তাহার মাংসপেশিতে শিথিলতা আসিয়াছে। অমিতের দেওয়া চাপালির সোনালী বাঁধুনি তাই সেই পা দুখানিকে তখন আঁটিয়া ধরিয়াছে। মা তবু সেই চাপালি পরিয়া দেখা করিয়া আসেন; তাঁহার ভয়—অমিত না হইলে রাগ করিবে। কলিকাতার উত্তপ্ত পথ ও পাথর মায়ের পায়ে ফুটিতে পারিত।...সেই কুলুঙ্গি এখন পরিষ্কৃত; তাহাতে অন্য জুতা রহিয়াছে; নাই সেই চাপালি জোড়া। সেই চাপালি-মোড়া পা দুইখানি—কতবার এই সিঁড়ি দিয়া তাহা ছুটিত, বয়সের বাধা না মানিয়া উঠিত নামিত, শত বার শত কাজে যাইত রান্না ঘরে, ভাঁড়ার ঘরে, অমিতের সন্ধানে, পিতার কক্ষে।

অমিত সেই কক্ষের সম্মুখে আসিয়া গিয়াছে। কই, সেই প্রশান্ত প্রসন্ন মূর্তি দুয়ারের সম্মুখে অপেক্ষায় নাই তো!—ক্লাসিক্সের শিক্ষাদীক্ষায় সমাহিত-চিত্ত সেই মূর্তি, তবু বাঙালী পিতার মূর্তি—পুত্রের গৃহাগমনে আনন্দে-মমতায় একটু চঞ্চল-উদ্‌গ্রীব-উৎফুল্লও হইবেন,—কই, অমিত দেখিতে পাইল না যে বাবাকে? বাবা তাহাদের কণ্ঠস্বর, পদধ্বনি শোনেন নাই নাকি? অমিত দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কোথায় বাবা? অনু আগাইয়া গিয়াছে গৃহমধ্যে, ওপার্শ্বের ঈজি চেয়ারের দিকে; একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেছে: বাবা,...বাবা, দাদা এসেছেন।

সেই পুরাতন ঈজি চেয়ারের উপর বর্ষীয়ান্ এক মূর্তি ছিল নাকি? অমিত এতক্ষণ তাহা দেখিতে পায় নাই।

দুই হাত দুই দিকের হাতলে, দেহভার তাহার উপর রক্ষিত, ভাঙিয়া-পড়া দেহ একটু আনত: অনুর কণ্ঠস্বরে অনুর দিকে মুখ তুলিয়া এখন জিজ্ঞাসাভরা বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে মূর্তি তাকাইয়া রহিল—যেন কি বুঝিতে চাহিতেছেন, বুঝিতে পারেন না। চোখে আলো নাই, বার্ধক্যের একটা ঘোলাটে দৃষ্টি; দাবদগ্ধ একটা বিবর্ণতা দেহে; গাল ঝুলিয়া পড়িয়াছে; বাহুর মাংসপেশী শিথিল; বিরলকেশ শির, মুখ কপাল গভীর রেখায় খণ্ডিত;—এক নিশ্চল বৃদ্ধ।

এই অমিতের পিতা? ক্লাসিকদের শিক্ষাদীক্ষায় গঠিত সেই মর্মর মূর্তি!

বাবা—দাদা এসেছেন—অন্থু তাঁহাকে একটু উচ্চস্বরে বুঝাইতেছে। *

ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিল: কে?…মন্থু?—

যে কণ্ঠে অস্পষ্টতার চিহ্নও ছিল না, সেই কণ্ঠে, দন্তবিরল মুখে, শুধু অস্ফুট একটা শব্দ ফুটিতেছে; ভালো করিয়া তাহা অমিতের কানেও পৌছিল না। অস্পষ্ট নিরুৎসুক শব্দ…সেই কণ্ঠ, সেই স্বর—অথচ তাহা নয়; সেই মানুষ—অথচ সে মানুষও বুঝি নয়।

অভ্যাস মতো দুয়ারের বাহিরে জুতা খুলিয়া অমিত গৃহমধ্যে অন্থুর পার্শ্বে আসিয়া গিয়াছে! 'কে? মন্থু?' মাত্র দুইটি অস্পষ্ট শব্দ সে শুনিল। দুইটি শব্দেই কিন্তু সুস্পষ্ট হইল—অমিতের অস্তিত্বও আর তাহার পিতার চেতনায় সহজ নাই।…বাতিল হইয়া গিয়াছে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে। ও আপন গৃহেও।… কাবুলীওয়ালা ফিরিবে না আর সেই আপন গৃহে আত্মজনের মধ্যে।

বাবা, আমি—আমি—নুইয়া পড়িয়া অমিত পদধূলি হইল।

অনুচ্চকণ্ঠে অন্থু বলিল: একটু জোরে বলো, দাদা।

অমিত তাহা বুঝিয়াছে; জোরেই এবার বলিল: আমি অমিত—

স্পর্শে ও কণ্ঠস্বরে মিলিয়া সেই দেহ, সেই মনে একটা অসহায় আলোড়ন সঞ্চার করিল। অমিত উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল সেই নিথর চক্ষু জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হইয়াছে।

অমিত আবার বলিল:

বাবা, আমি অমিত—

হাতলের উপরকার ডান হাত কি-যেন ধরিবার চেষ্টায় উপরে উঠিয়াছিল। আসন্ন চৈতন্য বুঝি হঠাৎ আত্মস্থ হইতে পারিল। এবার একটু স্পষ্ট একটু উচ্চ সেই স্বর: অমি—অমি—আসবার কথা ছিল আজ। এলে? এলে অমি?—কখন এলে?

অচল দেহে দাঁড়াবার জন্য একটা প্রয়াস দেখা দিল। টান হইয়া উঠিল সেই নুইয়া-পড়া দেহ উঠিবার চেষ্টায়।

অমিত বসিল: এই তো, এখনি এলাম।

দেহে উদ্দীপনা আসিল; নিঃশ্বাস দীর্ঘ হইল; বুক উঠিতে নামিতে লাগিল। তারপর মাথা আবার ক্লান্তিতে নুইয়া পড়িল। একটা অস্ফুটস্বর তবু শোনা গেল : বসো।

পার্শ্বেই আসন রহিয়াছে, অমিত বসিল। বসিয়া দেখিতে লাগিল সেই নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস-প্রকম্পিত বুকের ওঠা-নামা। আবার কানে গেল :

বসো, অমি, বসো।

কিন্তু সেই ক্লান্তমস্তক তখনো আর উঠিতে পারিতেছে না; চক্ষু তখনো আনত, হয়তো নিমীলিত।

...এই তোমার পিতা, অমিত? কোথায় সেই চির জীবনের শান্ত চিন্তা-শীলতা, ক্লাসিক্স্ পাঠকের অভ্যস্ত সংযম, গাম্ভীর্য?—অমিত তাহার পিতাকে দেখিয়া গিয়াছিল পরিণত প্রৌঢ়ত্বের মহিমায় আত্মস্থ। গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্তি নয়, মানবদেহে অ্যালিফেণ্টার স্থির সৌম্য মাহেশমূর্তি। সে মূর্তিতে ফাটল ধরে, তাহা ভাঙিয়া পড়ে, গুঁড়াইয়া যায়,—ইহাও ভাবিতে পারিত অমিত।...কিন্তু এ কি অমিত, সেই ক্লাসিক্স্-পরিপুষ্ট মনও শ্লথ হইয়াছে, নুইয়া পড়িয়াছে, সেই অখণ্ড সত্তা গলিয়া যাইতেছে—এ কি অমিত? এ কি? মানুষের দেহের এই কি অনিবার্য পরিণাম? আর তুমি তাহা কল্পনাও কর নাই!—এ কোন মানব-সত্যের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে অমিত? এই কি তাহাব সেই স্বপ্নে দেখা গৃহ ও তাহার পিতার পরিণাম? অমিতের অগোচরে নিয়তি এ কি পরিহাস তাহার জন্য রচনা করিতেছিল।

একটু সাবধান, দাদা, একটা স্ট্রোক গিয়েছে, এক বৎসর হল—তোমাকে তা লিখি নি। এখন বাবা সাবধানে চলতে-ফিরতে পারেন। অথচ অনেক কথা বুঝে উঠতে পারেন না।—অমিতকে নিম্নস্বরে অনু জানাইল।

ভাঙা-দেউলের দেবতা··· সেও বুঝি দেউলের মতোই ভাঙিয়া যায়।

অনু বুঝাইয়া বলিতেছে : অনেক কথা যেমন কিছুতেই বাবা বুঝতে পারেন না, আবার তেমনি এক-একটা পুরনো কথাও তাঁর কেমন হঠাৎ মনে পড়ে যায়—

প্রতিদিনের সান্নিধ্যের ফলে অনুর নিকট পিতার এই বার্ধক্য ও জড়তা

একটা পরিচিত সহজ সত্য। ক্রমে ক্রমে চোখের উপর শুকাইয়া যায় যেমন বনস্পতি—যে-কোনো একদিন তারপর দমকা হাওয়ায় ভাঙিয়া পড়িলেই হইল। অনু তাহা জানে। তাহার পূর্বে যে দাদা আসিলেন, বাবাকে দেখিতে পাইলেন, বাবাও দেখিতে পাইলেন দাদাকে, ইহাই যেন তাঁহাদের সকলের জীবনের চরম এক চরিতার্থতা।

এলে, অমি ; এলে—বাবা আবার নিজেরই মনে ধীরে ধীরে আওড়াইতে-ছিলেন। তখনো তিনি অমিতের মুখের দিকে চোখ তুলিতে পারেন নাই। তথাপি অনু তাঁহার এই চেতনা-লক্ষণ দেখিয়া উৎফুল্লভাবে অমিতকে চোখে ইঙ্গিত করিল—পিতার অমিতকে মনে পড়িয়াছে।

স্তিমিত-দৃষ্টি চক্ষু অমিতের মুখের উপরে একবার স্থাপিত হইল। বাবা বলিলেন : অসুখ করেছিল, না ? এখন ভালো আছ, অমিত ?

পাঁচ বৎসর পূর্বেকার সেই অমিতের কঠিন পীড়ার কথাটা তাঁহার স্মৃতির গভীর স্তরে গাঁথিয়া রহিয়াছে, তাহাই বুঝি জীইয়া আছে। ··অমিতের চেহারা তিনি ভালো করিয়া দেখিতে পান না, পরিবর্তন ঘটিয়া থাকিলেও চক্ষু দিয়া তাহা বুঝিয়া লইতে পারেন নাই।

অমিত তাড়াতাড়ি উত্তর দিল : অসুখ ? তা করেছিল। এখন কিছু নেই, বেশ ভালো আছি।

'ভালো আছ'—'ভালো আছ'।—নিজের মনেই আবার আবৃত্তি করিলেন বৃদ্ধ। আবার দেহ ঈজি চেয়ারে এলাইয়া দিলেন, চোখ মুদিত করিলেন। অমিত চোখ মেলিয়া বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল—নিঃশ্বাসে বুক দুলিতেছে ; মুখের মাংসপিণ্ডও কাঁপিতেছে, নাসিকা ও ওষ্ঠের কোণ একটু বাঁকিয়া যাইতেছে। একটু পরেই বাবার চক্ষু আবার উন্মীলিত হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন : কতক্ষণ থাকবে অমি ?

অনু শঙ্কিত হইল। অমিত বুঝাইতে চেষ্টা করিল : আর যেতে হবে না। ছাড়া পেয়ে এসেছি, ছেড়ে দিয়েছে ওরা।

বুঝিতে সময় লাগিল, কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন—একটা দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়া তাহার প্রমাণ মিলিল, এক ফোঁটা চোখের জলও ক্রমে তাঁহার চোখের

কোণে দেখা দিল। অমিতের বুঝিতে বাকি রহিল না—মায়ের করুণ বেদনার স্মৃতিতেও তাঁহার আচ্ছন্ন চেতনা এইবার সম্ভবত আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে।

অমিত চোখ ফিরাইয়া লইল, ঘরের চারিদিকে দেখিতে লাগিল।—সেই পুরাতন গৃহ-পরিবেশটি মায়ের হাতে রচিত। পরিচ্ছন্নতার অভাব ঘটে নাই—পরিবর্তনও ঘটিয়াছে নিজের নিয়মে। পিতার বইপত্র আজ আর এ-ঘরে নাই। তাঁহার লিখিবার ছোট টেবিলে আসিয়াছে ঔষধপত্র; আর অনুর এক-আধখানা বই। এখন অনুই আশ্রয় করিয়াছে এই ঘরের একটি কোণ, না হইলে কে আর সর্ব সময়ে বাবাকে দেখিবে-শুনিবে? কিন্তু এ-ঘরে বোধ হয় অনুও পড়াশোনা করে না। অনুর পুস্তকে, মনুর অধ্যয়নে গবেষণায় বাবার এখন কৌতূহলও নাই। অমিতের বই খাতাপত্রও আর তিনি দেখিবেন কি করিয়া।

বাড়িতে বই আসিয়াছে, বাবা সে বইএর একবার খোঁজ করিবেন না, একবার উলটাইয়া-পালটাইয়া উহা দেখিয়া লইবেন না, আর পাতা উলটাইতে উলটাইতে বইটা পড়িয়া ফেলিবেন না,—একথা অমিত ইহার পূর্বে ভাবিতে পারিত কি? পারিত কি দুই ঘণ্টা আগে? আধ ঘণ্টা আগে? তাহার বাড়ি—গৃহাশ্রম, গৃহবন্ধন, আত্মার আলয়···সেখানে তাহার বাকস-ভরা বই খুলিয়া বাব র সম্মুখে অমিতকে বসিত হইবে; বলিতে হইবে প্রতিটি বই-এর পরিচয়। তাহারই আলোকে অমিতের আলোড়িত, আবর্তিত, বিবর্তিত, এই ছয় বৎসরের মানস জীবনের কথা বাবা বুঝিয়া লইবেন; আপনার নোট খাতা দেখাইতে দেখাইতে অমি ফিরিয়া যাইবে আবার আপনার রচিত খসড়ায়; উনবিংশ শতকের ইতিহাসের উপাদান দেখাইতে একবার পাণ্ডুলিপিটা বাহির করিয়া রাখিবে লজ্জায় সম্ভ্রমে—'আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতির বনিয়াদ'। উহা ফেলিয়া চলিয়া যাইবে পিছনে "মধ্যধুগের বাঙালী সংস্কৃতি"তে, আর আরও পিছনে "বৌদ্ধযুগের জীবনযাত্রার রূপ-রেখা"য়। ঈজি চেয়ারের হাতলের উপরে বাবা একে-একে একদিকে স্তূপায়িত করিবেন অমিতের রচিত পাণ্ডুলিপি, অন্য দিকে সাজাইয়া রাখিবেন অমিতের আনীত পুস্তক। আর সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা জমিয়া উঠিবে: শান্ত মুখে আগ্রহ জাগিবে; হয়তো জাগিবে আপত্তি, উদ্বেগ, বেদনাও: 'না, অমিত, না। Man does not live by the bread alone.

'বহুজনা বহু জাতকাশি' ফস্‌ফরাসের দাবি মিটে,…এ সত্যেও এদেশ প্রতিষ্ঠিত করেছে জীবনযাত্রায়। হয়তো তাতে বড় বেশি বাড়াবাড়ি করেছে; তাই মস্তিষ্কের অপব্যবহারও হয়েছে। কিন্তু বনে শাক আর গাছে তেঁতুলের পাতা থাকতে অভাব হয় না নৈয়ায়িক পণ্ডিতের ঘরে, বলেছিলেন বুনো রামনাথ। আর, তাঁদের ধর্মপত্নীরা? হাঁ, মেয়েদের আদর্শ আর অবস্থা থেকেই বরং তখনকার কালের সামাজিক মানদণ্ডের হিসাব ঠিক মতো পাওয়া যাবে। না, শাঁখাশাছি জোটেনি মহাপণ্ডিতের স্ত্রীর, শুধু লাল সুতো বাঁধা থাকত হাতে। কিন্তু তা দেখিয়ে গর্ব করে বলেছেন গঙ্গার ঘাটে—'এ রঙিন সুতো যেদিন ছিঁড়ে যাবে, সেদিন নবদ্বীপের আলোও নিবে যাবে।' এই আমাদের সামাজিক আদর্শ, এই জ্ঞান-গরিমার এই মূল্যবোধ—তা মিথ্যে রচনা নয়, অমিত।' অমিতও তখন বাবাকে উত্তর দিবে হাস্যমুখে, ওই ঈজি চেয়ারের প্রতিবাদ-চঞ্চল স্থির বিষ্ণুমূর্তির দিকে মুখ তুলিয়া—

কোথায় সেই মূর্তি? কাহাকে উত্তর দিবে অমিত?

বন্দিশালায় বসিয়া বসিয়া সে যখন আপনাব মনে স্বপ্নের জাল বুনিয়াছে, কালের হাত তখন নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাসে ছিঁড়িয়া চলিয়াছে তাহার স্বপ্ন-চিত্রকে, তাহার জীবন-তন্তুকে, তাহার আত্মার উৎসকে…

মন্টু বই-এর বাকসগুলি উপরে আনিয়া ফেলিয়াছে। এই ঘরে তাহা নামাইয়া কাজ নাই। কি হইবে উহাতে—বাবার সহিত একযোগে যাহা অমিত ভোগ করিতে পারিবে না?

সত্যের বৈজ্ঞানিক নির্লিপ্ত অনুসন্ধানে অমিত কৃতার্থ। কিন্তু সত্যের একটা সমগ্রতা আছে; আর সেই সমগ্রতায় সত্য শুধু তথ্য নয়, তাহা রসাপ্লুত। কিন্তু এই মুহূর্তে অমিত জানিতেছে—সেই রস-সমৃদ্ধ সত্য আর তাহার ভাগ্যে মিলিবে না। তাহার চিন্তা মুখামুখি করিতে পারিবে না তাহার পিতার চিন্তার সঙ্গে; তাহার একালের জীবনবীক্ষার উপরে পড়িবে না তাহার পিতৃপ্রাণের জীবন-বোধের সুদৃঢ় স্বাক্ষর। বৈজ্ঞানিক সত্য উগ্র হইয়া উঠিবে আপন পরিধিতে; সমগ্রতাহীন রসহীন হইয়া তাহা অর্ধসত্যে পরিণত হইবে। রসহীন সেই সত্য, প্রাণহীন মান হইয়া কি করিবে, অমিত?

সজোরে একটা শব্দ হইল; অমনি চঞ্চল হইল,—পড়িয়া গেল বুঝি বইএর বোঝাটা। গলা বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল সেই ঘরের দিকে। বইগুলি নষ্ট হইল বুঝি!

আমি যাচ্ছি দাদা, তুমি বসো—তাহার মনের কথা বুঝিয়া অনু হাসিয়া সেদিকে আগাইয়া গেল।

এখন অমনি রেখে দাও। আমি সব সাজিয়ে রাখব পরে—তোমরা পারবে না।

অমিতের কত মায়া-মমতা প্রত্যেকটি বই-এর পাতার সঙ্গে জড়ানো।

দুয়ার হইতে অনু হাসিতে হাসিতে বলিল, আচ্ছা দেখব—পারি কিনা?

মেঘের কোলে একবার সূর্যাভা ছড়াইয়া পড়িল; অমিতও হাসিল। গৃহের তের বছরের সেই কনিষ্ঠা কন্যাটি এখনো কনিষ্ঠা'ই রহিয়াছে,—হোক সে বিশ বৎসরের বি-এস-সি ক্লাশের ছাত্রী। সেই আদরের একগুয়েমি এই দায়িত্বশীলা, তেজোময়ী প্রকৃতির মধ্যেও ফুটিয়া উঠে। আরও উঠিবে, বারে বারে উঠিবে;—সেই জন্যেই তো দাদাকে তাহার চাই। অমিতকে চাই—এখানে এই গৃহে, গৃহবন্ধনের নিবিড় আশ্রয়ে একটি সহোদরা-সত্তার—কালের আবর্তিত উচ্ছ্বাসেও যাহার অন্তরের উৎস-মুখ বুজিয়া যায় না।

অমি—

বাবা ডাকিলেন কি? তাড়াতাড়ি অমি মুখ ফিরাইল। ঈজি চেয়ারে স্থাপিত মস্তক তাহার দিকে ফিরিয়াছে, চোখ তাহার মুখের উপরে স্থাপিত। ডান হাতের আঙুল কয়টি ঈজি চেয়ারের হাতলের উপর চঞ্চল, যেন কিছু ছুঁইতে চায়, ধরিতে চায়, চায় কাহারও স্পর্শ। হয়তো আজন্মের সংযত আবেগ, সংযত আচরণ অভ্যাস এই দুর্বল দেহের আবেগ উত্তেজনার নিকট তথাপি হার মানিবে না, ক্লাসিক্‌সের শিক্ষাদীক্ষা কোনো আবেগ-বাহুল্যকে প্রশ্রয় দিবে না। অথচ চোখের এই স্তিমিত দৃষ্টিতেও আসিয়া গিয়াছে একটা ব্যাকুলতা, একটা প্রার্থনা: অমি—

অমিত চেয়ারের হাতলের উপর হাত রাখিয়া মুখের সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল: কি বাবা?

খেয়েছ ?—কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন ফুটিল।—বেলা শেষ হয়ে গেল না ?

খেয়েছি একবার, আবার নয় খাব কিছু।

বার্ধক্য-শীর্ণ শিথিল হাতখানি উঠিয়া আসিয়া অতি আলগোছে হাতলের উপরের স্থাপিত অমিতের হাতের উপর পড়িল। ক্লাসিক্যের শান্ত মহিমা কি বলিবে জানে না অমিত। কি বলিবে বেদান্ত বিবেকানন্দ-স্বদেশী stoicism তাহাও জানিবার আজ প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই একটি স্পর্শে এই একবারের মধ্যে শশাঙ্কনাথের উপবাসী অন্তরের সাক্ষ্যই যেন অমিতের আত্মায় আবার সত্য হইয়া উঠিল।—সত্য নয় কি, অমিত, গৃহলোকের মায়া-মমতার মধ্য হইতেই অমৃতলোকের সুধা মথিত হইয়া উঠিতেছে ? সত্য নয় কি 'দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন ?' প্রাণরসে রহস্যময় সে জীবন আপনাকে চিনিয়া লয় এমনি মমতা-কম্পিত দেহস্পর্শে···আর 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে মরে পরশ-পাথর'—আদর্শের অন্ধ আবেগে।

শব্দ নাই। ওঘরে অমিতের বাক্স বোঝা নামিতেছে। অমুতে মমুতে এক আধটুকু তর্কও বাধিয়াছে: মুটেমজুরদের বুঝাইতে পারা যায় না সাবধানে নামাইতে হইবে দাদার জিনিসপত্র। ছয় সাল পরে ফিরিতেছেন না বাবু জেল হইতে। 'কুছ নেহি' সেরেফ জুলুম, স্বদেশী আদমি, স্বরাজের লড়াইতে ভারী কাম করতেন। না, না, গান্ধীজীর আদিমি নন, স্বদেশী ইন্‌কেলাবী, ক্রান্তিকারী—পিস্তল বোমা লইয়া যাহারা সাহেবদের খতম করে'—

কি কাণ্ড করিতেছে পাগল দুইটা মিলিয়া। অমিতের হাসি পাইল, মুটে দুইজন বুঝি দেখিতে আসিয়াছে অমিতকে। অমিত দুয়ারের নিকট আগাইয়া গিয়া হাসিয়া বলিল: গরিবদের ঠকাবার ফন্দি বের করেছ তো বেশ। 'বাবু স্বদেশী', অতএব তোরা তার কাজ করে আবার পয়সা চাস ? এত স্পর্ধা!

পয়সা দিয়েছি দাদা। জানোই তো ওদের নিয়মই এই, তবু চাইবে।

আর আমরাও তবু দোব না। উল্টে বলব, 'স্বদেশী'র কাজ করে পয়সা ?—এত স্পর্ধা। না, না, এ পেশাটা চলবে না—'স্বদেশীর' নামে গরিব শোষণ।—অমিত মুটেদের বলিল,—কেয়া ভাই, মিলা ?

সম্ভ্রমে কৃতজ্ঞতায় বলিল দুইটি ঘর্মাক্ত প্রোলিটেরিয়ান্-দেহ: জিনা, সরকার।

'সরকার'! কে যেন চাবুক মারিল অমিতকে।...'সরকার সালাম!' মুক্ত-জীবনে এই প্রথম প্রোলিটেরিয়ান্ সম্ভাষণ অমিতের। অন্তত ঐ শব্দটা নয়, 'হুজুর', 'বাবু', 'সাব'—সব হজম হইবে, কিন্তু ঐ শব্দটা হজম করিতে অমিতের অনেক দেরি লাগিবে।

হাসিয়া অমিত বলিল। 'সরকার' নেহি, ভাই, বলো 'জী'।—অমিত বুঝাইয়া বলিতে চাহিল। কিন্তু প্রোলিটেরিয়ানের নিকট পার্থক্যটা পরিষ্কার হইল না; তবে নীরবে তাহারা 'বাবুজীর' কথা মানিয়া লইল। পার্থক্য সত্যই কিছু আছে কি?—অমিত নিজেকে জিজ্ঞাসা করে। 'বাবুজীরাই' তো দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, 'শাসকশ্রেণী', - আর সেই কারণেই তো তাহারা 'সরকার' অর্থাৎ শাসনকর্তা। কিন্তু পার্থক্য বুঝাইতে হইবে—যতক্ষণ রাষ্ট্র 'উইদার এওয়ে' না করে,—বিশুষ্ক হইয়া না যায়। বলিতে বলিতে ইহারা ক্রমে বুঝিতে শিখিবে। সঙ্গে সঙ্গে শিখিবে যুঝিতে—তারপর?...

বাবার সঙ্গে কথা হল?—অমিতকে মন্টুর ঘরে বসাইয়া অন্টু জিজ্ঞাসা করিল।

অমিত শুনিতে লাগিল—এখনো বাবা চলা-ফেরা করিতে পারেন। দেহযাত্রার নিয়মিত অভ্যাস এখনো মূলত ভাঙে নাই। নিজে মুখ হাত ধুইবেন, সংবাদপত্র পড়িতে পারেন না, তবু প্রভাতে প্রতিদিন উহার খোঁজ লইবেন। আহারের কথাও মাঝে মাঝে ভুলিয়া যান, কিন্তু আহারান্তে হাত ধুইবেন, দাড়ি নিজে কামাইতে পারেন না; তবু একদিন পর একদিন ক্ষৌরী হইবেন। মুখ ধুইবেন নিজে—ঘরে নয়, ছাদে গিয়া। ঐ এক ফালি ছাদেই গিয়া বসিবেন বিকালে। তাঁহাকে ধরিতে হয় না, নিজেই চলেন; কিন্তু চলা আর স্থির নাই। দেহযাত্রা তত বিশ্রস্ত হয় নাই, কিন্তু বিপর্যস্ত হইয়াছে মন, স্নায়ু, চেতনা।...

অমিত জেলেই খাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে আপত্তি টিকিল না। টিকিবে না, অমিত জানিত। তাই পূর্বেও যত কম সম্ভব খাইয়াছে, এখনো

মস্তটা, সন্তম আপত্তি জানাইয়া আহারের জন্য প্রস্তুত হইল। তাহারই জন্য অপেক্ষায় বসিয়া আছে—অনু ও মনু, দাদাকে লইয়া এক সঙ্গে খাইবে। আপত্তি করা কেন আর? দেরিই বা করে কেন?

রান্না কতকটা করিয়াছে বটুক। কতকটা 'আমরা',—জানায় অনু। 'কানাইর মা' এখন কানাইর কাছে থাকে—ছেলের বউ ও নাতিদের লইয়া সে থাকে কালিঘাটে। অনু তাহাকে খবর পাঠাইয়াছে, বুড়ি আসিয়া যাইবে। ঠিকা ঝিই কাজ করে, রান্না সকালে বটুকই চালায়—অনুর তখন কলেজ। মনুর এখন দেখিতে হইলেও চলে। মনু প্রাচীন ইতিহাসের গবেষণা করে, আর করে একটা প্রাইভেট্ টিউশনি এবং দেশীয় একটা ইন্‌শিওরেন্‌স্ কোম্পানির এজেন্‌সি—বি এ পাশ করিয়াই এ কাজ আরম্ভ করিয়াছিল—বাড়ির পক্ষে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল—দূরে বসিয়া অমিতও যে তাহা অনুমান না করিয়াছে তাহা নয়।

ব্যবসা-মন্দার ডামাডোল অমিত আগেই দেখিয়া গিয়াছে। ১৯২৯-৩২এ পশ্চিম জগতের মানসিক বিপর্যয় যদি ঘটিয়া থাকে তবে তাহার কারণ সমস্ত পশ্চিম জগতের আর্থিক জীবনে ফাটল ধরিয়াছিল। কেইনস, স্ট্রাচি, লেইটন হালে পানি পান নাই। কোলে, লাসকি প্রায় কবুল করিয়া ফেলিলেন 'প্লান্‌ড ইকোনমি ছাড়া পথ নাই। রুজভেল্ট 'নিউ ডীলের' নয়া শুকতলার জোরে পুরানো পাদুকার ব্যবসা চালাইতেছেন। সিড্‌নি ও ব্রিয়েট্রিস ওয়েব আমেরিকার 'ক্যাবেনট হিস্টরির' পাতায় সব জমিন তদন্ত করিয়া সোভিয়েট ব্যবস্থার প্রমাণপত্র দাখিল করিতেছেন। চিন্তাশীল, সৃষ্টিশীল ইউরোপ শেষে এই মন্দার দুযোগে সাম্যবাদী চিন্তা ও প্রয়াসের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। অন্যদিকে উহার প্রতিক্রিয়ায় মাথা তুলিয়াছে হিটলার ফ্রাঙ্কো। আর আগামী দিনের আগমনী স্বরূপ উঠিয়াছে ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড্‌ ইহাদের লইয়াই সে কী তর্ক, আলোচনা, অন্তর্বিরোধ, বিচ্ছেদ রক্তক্ষরণ, মৃত্যু আর নবজন্মের আলোড়ন সেদিন অমিতদের বন্দিশালার প্রতিটি জীবনে ঘটিয়াছে।

বিশ্বজোড়া সেই ডামাডোলের স্বরূপ তাহার কারণ, তাহার প্রসার, তাহার সম্ভাব্যতা লইয়া অমিতও অনেকের মতো এই ছয় বৎসর ভাবিয়াছে,—তর্ক

করিয়াছে, আলোচনা করিয়াছে। কিন্তু সে উহার বাস্তব অর্থ কতটুকু বুঝিয়াছে?·· চায়ের শেয়ারের লভ্যাংশ কমিয়াছে, দুই-একটা পুরাতন কোম্পানি উঠিয়া গিয়াছে, পিতার সঞ্চিত সামান্য অর্থ নিঃশেষ হইয়াছে···নিজ গৃহের এই সব অভাব-তাড়নার মধ্যে দিয়া সংকটকে না দেখিয়া ইতিহাসের এই বিকৃতির নির্মম তাৎপর্যই কি তুমি অমিত বুঝিয়াছ? সংকটের তত্ত্বকে দেখিয়াছ, দেখো নাই জীবন-সত্যকে,—প্রাণরসে রহস্যময় সংগ্রাম সাধনাকে, —প্রতিটি মানুষের জীবনের মধ্যে যখন সেই সামাজিক বিপর্যয় ব্যর্থতা জাগাইয়া তোলে, ইতিহাসের গবেষক যখন আপনার জীবিকা সংগ্রহ করে ইন্‌-শিওরেন্সের এজেন্টরূপে!··

পঁয়ত্রিশ টাকার সরকারী ভাতা অমিতের মাতৃবিয়োগের পরে আরও পনের টাকা কমিয়া যায়, বন্দিশালায় অমিত তখন সরকারী হিসাবের নৈপুণ্য দেখিয়া বিদ্রূপে ব্যঙ্গভরে হাসিয়াছে। কিন্তু দিনের পর দিন অভাব ও উদ্বেগের মধ্য দিয়া মনুর মতো তো সে অনুভব করিবার অবসর পায় নাই—পিতার সঞ্চয় ফুরাইয়া গেল, মাতার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়াও আর সংসার চলে না। নিজের পড়াশুনাব সঙ্গে সঙ্গে মনু তাই রোজগারের অন্যবিধ ধান্দায় ঘুরিয়া কলেজের এক একটি সোপান উত্তীর্ণ হইয়াছে। অন্নুর চাকর বামুনের পাট খর্ব করিতে হইয়াছে; আই-এস্-সির পরে ডাক্তারি পড়িবার সাধ তাহাকে বিসর্জন দিতে হইয়াছে। রাঁধিয়া-বাড়িয়া গৃহকর্ম করিয়া, পিতাকে সেবা-যত্ন করিয়া অনু এইরূপে বি-এস্-সির সীমায় পৌঁছিয়াছে—সহজ দায়িত্ব-বোধে মনুর সহযোগী হইয়া উঠিয়াছে। স্নেহ সযত্ন আয়াসে ঘিরিয়া মনুই তবু তাহাকে কঠিন জীবিকা-গঞ্জনা হইতে বাঁচাইয়া লইয়া চলিয়াছে। জীবনে অনেক ঠেকিয়া যদি মনু ফার্স্ট ক্লাসের গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে তথাপি সে বুঝিয়াছে এনশিয়ান্‌ট্‌ হিস্টরি বা কালচারাল এ্যান্‌থ্রোপলজির ছাত্রের পক্ষে এদেশে এ জীবনে ইন্‌শিওরেন্‌স্ এজেন্টের স্বাধীন বৃত্তিও কাম্য—সরকারী আর্কিওয়োলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কর্তার মুখে শুনিতে হয় না 'ভাই-এর কানেক্‌শনটা খারাপ কি না; তাই তোমাকে চাকরিতে নিলে গোয়েন্দা বিভাগ কি বলবে কে জানে?' অতএব আর্কিওয়োলজির বড় কর্তার

সহোদরা শ্যালীর নন্দাইয়ের সে চাকরিটি প্রাপ্য। অমিতের ভাই হইয়া নিজ কলেজের প্রিন্‌সিপালের বিড়ম্বনাও বাড়াইয়া দিতে হয় না—তাঁহার কলেজের একশত টাকা মাহিনার 'লেকচারশিপের' জন্য মন্টু দরখাস্ত করিয়াছে। কি বিপদ!

বরং তোমার মিস্টার মেহ্‌তারাই ভালো ;—মন্টু খাইতে বসিয়া জানায়—তোমাকে ভোলে নি। কেমন আছ খোঁজ নিত তোমার বরাবর। তারপরে ওদের ছেলে-পড়ানোর কাজ আমাকে ওরা খুশী হয়ে দেয়। সে সূত্রেই ওদের ইনশিওরেন্‌স কোম্পানির এজেন্‌সির কাজেও ওরাই দেয় পরামর্শ। ছেলেও পড়ে—এখন সে পড়ে সেণ্ট জেভিয়ার্সে। আমার তাকে সপ্তাহে দুদিন পড়াতে হয় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সভ্যতার কথা। টিউশনিতে দেয় পঁচাত্তর টাকা।

কিন্তু অন্টু খাইতে বসিল না যে? সে পরে খাইবে, আগে দাদাদের পরিবেশন করিবে। বলে কি অন্টু? এখনো এ নিয়মই রহিয়াছে বুঝি দেশে।

চুলোয় যাক সে নিয়ম, সে দেশ।—বলে অমিত।—আর নিয়মই বা কোথায়? এক সঙ্গে বসেই তো আমরা বরাবর খেতাম—মা করতেন পরিবেশন।···

মা পরিবেশন করিতেন। অনেক রান্নাই মা তখন রাঁধিতেন, চাকর-বামুন থকিলেও তিনি মানিতেন না। দিনের অনেকটা সময় তো তাঁহার রান্নাঘরে কাটিত, রাঁধিতেন, কুটিতেন, রান্নার নানা আয়োজন করিতেন, ভাঁড়ার সাজাইতেন,—খাওয়া-দাওয়া ও হেঁসেলের সমস্ত হাঙ্গামা মিটাইয়া কী-ই বা আর সময় পাইতেন? হয়তো বা একটু বাঙলা সংবাদপত্র পাঠ; হয়তো পড়ার নাম করিয়া মেজেয় মাদুর পাতিয়া একটু গড়াগড়ি। এখন স্কুল হইতে ফিরিবে মন্টু—স্কুলের ধূলাবালি সঙ্গে লইয়া, আসিবে অন্টু স্কুলের একরাশি কথা আর খেলার গল্প লইয়া। মা উঠিয়া পড়িতেন,—সময় হইয়া গিয়াছে অপরাহ্নের জলযোগের ও চায়ের। বড় জোর কখনো সময় করিয়া মা বাঙলা মাসিকপত্রের পাতা উল্টাইতেন, বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পড়িতেন;

কানাইর মাকে কখনো পড়িয়া শুনাইতেন রামায়ণ ও মহাভারত।…রান্না আর রান্না, ইহাই ছিল যেন মায়ের জীবনের রুটিন…কিন্তু কাহার জন্য তাহা? আত্মদানের মধ্যেই তাঁহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠা। 'হেঁসেলের হাঁড়ি-কুঁড়ি হইতে মেয়েদের মুক্তি দিয়া রাষ্ট্রচালনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে প্রত্যেকটি রাঁধুনি-মেয়েকে'—লেনিনের কথা। অমিত জোর করিয়া মায়ের স্মৃতি হইতে নিজের মুখ ফিরাইয়া লইল—লেনিনের কথায়। লেনিনের কথা—উহার মধ্যেই তাহার মায়ের এবং আরও কত কত মায়ের জীবনে চাপা-পড়া স্বপ্ন আপনার অজ্ঞাতে আপনার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছে।…

অমিত বলিল: বুঝলে, এই হল এ যুগের দৃষ্টি—লেনিন-সংহিতার কথা। এস বস অনু আমাদের সঙ্গে—

কিন্তু অনুরও আকাঙ্ক্ষা—আজিকার মতো সে রাঁধিবে, নিজের হাতে দাদাকে খাওয়াইবে।…

এই তো সেই গৃহপথ—ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়।…কে বলিল ভাঙিয়া গিয়াছে সেই নীড়?—আফগানিস্তানের কোলে আর কাবুলীওয়ালা ফিরিয়া গিয়া খুঁজিয়া পাইবে না তাহার সেই তিন বৎসরের মিনির মতো মেয়েকে। কিন্তু পাইবে সেই ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়—পাঠানী জায়া-কন্যার স্নেহ-মমতায় তেমনি সুকোমল। বি-এস্-সি-পড়া অনু সেই চিরদিন-কার বাঙালী মায়ের মতো এমনি করিয়া রাঁধিয়া-বাড়িয়া পিতা ভ্রাতাকে রাঁধিয়া খাওয়াইয়া সেবা করিয়া জীবনের রস উপভোগ করিতেছে। আর উহারই মধ্যে কি শশাঙ্কনাথের কথা মতো সেই রসের আস্বাদ অমিত পাইতেছে না, এখনো—এই নিমেষেও? এই লেনিনের বিধান ঘোষণা করিতে করিতে, অনুকে আপনাদের সঙ্গে খাইতে বসিবার জন্য জোর করিতে করিতে? নিজের কাছে অমিত তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়। তবে কি সেই 'সনাতন' নিয়মই এখনো চলিতেছে, ভবিষ্যতেও চলিবে? যত পরিবর্তন ঘটিতেছে ততই অপরিবর্তনীয় রহিয়াছে সেই পুরাতন পৃথিবী? না, না, মিথ্যার এই জারক-রসকে জীবন-রস বলিয়া ভুল করিয়া অমিত আপনাকে নিঃশেষ হইতে দিবে না। এ যুগের দৃষ্টিতে, এ যুগের সৃষ্টিতে জীবনের শাশ্বত সত্যেরও নব-রসায়ন

চলিয়াছে। চিরন্তনী প্রাণলীলা—এরা ভিতার মাত্র শুধু, শুধু লিরিভো নয়। নবায়মান দেহে নবায়মান চেতনায়, নবায়মান শুভপ্রয়াসে সমৃদ্ধিতে জীবন আপনার অভাবনীয় সম্ভাব্যতাকে আবিষ্কার করিয়াছে, চলিতেছে, Life marches অনেক বেশি সম্পূর্ণ, সার্থক হইবে এই রসের আস্বাদন যখন অনু দাদার সঙ্গে দাদার পার্শ্বে আসনে বসিবে—বসিবে না অনু? না বসিলে অমিত আর ভাতই ভাঙিবে না।

হাসিযা একসঙ্গে সব সাজাইয়া অনু দাদার পার্শ্বে বসিল। কুণ্ঠা তাহারও নাই। খাইতে খাইতে গল্প করিবে, ওখানে বসিয়াই প্রয়োজন বুঝিলে আবার দাদাকে পরিবেশন করিবে—না, বাধিবে না, তাহাতেও তাহার বাধিবে না। হয়তো মায়েদের যুগে এইরূপ একসঙ্গে বসিয়া খাইতে, পবিবেশন কবিতে মেয়েদের বাধিত। কিন্তু অনুদেব যুগে আজ এভাবে বসিলে তাহাতে অনু আর বাধা পায় না। কালের পরিবতন হইযাছে, গৃহশ্রী নতুন ভঙ্গিমা লাভ করিয়াছে: Life marches

এ কি কাণ্ড। মাত্র দুই ঘণ্টা হইল অমিত জেলে মধ্যাহ্নভোজন শেষ করিয়াছে। এখন কি এতটা খাওযা যায়? শুধু এক সঙ্গে বসিবে বলিয়া সে খাইতে বসিয়াছে। কিন্তু তাই বলিযা এ কি কাণ্ড।

মাছ কিন্তু খেতেই হবে—ওদেশে তো আব মাছ পেতে না।

মাছ একেবাবে পাইত না তাহা নয়। কবাচীর সমুদ্র-মাছও আসিত, কিন্তু এই রান্না নয়। আর কাহারও সাধ্য হইত না—অমিতের মায়েব পক্ষে ছাড়া—মাছের এই রান্নাটা।

অমিত বুঝিতে পাবিতেছে—কেন অনু আজ রাঁধিল, কেন বাঁধিল অমিতের প্রিয আহাব। কিন্তু শুধু অমিতকে মনে কবিযাই কি অনু বাঁধিয়াছে? আজ তাহারা সকলে সকল কাজে মাকে মনে কবিয়া বসিয়া আছে। এ গৃহেব প্রত্যেকটি আয়োজনেব মধ্যে মাতৃপ্রাণের সেই দিনরজনীব শত আকাঙ্ক্ষা আব ব্যর্থতা আজ ডানা মেলিয়া বসিয়া আছে। কেহ তাহা কিছুতেই সহজে মুখ ফুটিয়া বলিবে না, বলিবে না বলিযাই এখনও বলিল না। শুধু কেহ অনুযোগ করিতেছে আহারের, কেহ অভিযোগ করিতেছে গুরু

ভোজনের। আর গৃহজীবনের ছোটখাটো তথ্য, হিসাব, উহারই মধ্য দিয়া ক্ষণে ক্ষণে পরস্পরে বাঁটিয়া লইয়া উপভোগ করিতেছে।

বিকালে কিন্তু দাদার চায়ের নিমন্ত্রণ আছে সবিতাদের বাড়ি।—ইহারই মধ্যে মনু অনুকে মনে করাইয়া দিল।

সবিতা ?···মনের যে পটে মায়ের সেই আবেগাকুল মূর্তি সেই দেবদারুতলের মুহূর্তটি হইতে বারে বারে অনিবার্য ইঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিতেছিল, মিলাইয়াও একেবারে মিলাইতেছিল না এতক্ষণেও, অকস্মাৎ সেই পটের উপর একটি ছায়াও স্থির সুনিশ্চিত রেখায় মূর্ত হইয়া উঠিল। অমিত জানে—সে ফুটিয়া উঠিবার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল, করিতেছিল 'প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশা'।···

সবিতা ?···অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে অমিত নামটা উচ্চারণ করিতে গেল—একটা অপরিচিত নাম যেন সে শুনিয়াছে। কিন্তু বড় বেশি সহজ, বড় বেশি স্বচ্ছ, আর বড় বেশি ছল-বিস্মৃতির রেশও তাই ফুটিয়া উঠিল কি এই একাক্ষর প্রশ্নটিতে ? অমিত অপেক্ষা করিতে লাগিল তাহা দেখিবার জন্য—মাথা না তুলিয়া চোখের কোণে গোপন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লইয়া দেখিতে লাগিল,—কি বলে অনু ? কি করে মনু ?

অনুই উত্তর দিল প্রথম : ব্রজ জ্যেঠামশায়ের মেয়ে সবিতাদি। কিন্তু তাহার পূর্বে কি অমিতের অবনত মস্তকের উপর দিয়া একটা চকিত দৃষ্টি বিনিময় করিল না অনুর দুই চক্ষু মনুর তেমনি চক্ষুর সহিত ?

অমিত একবার মাথা তুলিল, বলিল : ওঃ হাঁ হাঁ···মনে পড়িয়াছে, অমিতের মনে পড়িয়াছে, ব্রজেনবাবুর মেয়ে সবিতার কথা মনে পড়িয়াছে।

মনু জানাইল : সকাল থেকে সবিতাদি তোমার জন্য এসে বসে ছিলেন—মনুর এই সহজ কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা আগ্রহ রহিয়াছে, একটা সৌহার্দ্যের সুর আছে। সে অমিতকে জানাইল এই বাড়িতে তাহারা খবর পাইবার পূর্বেই সবিতা কি করিয়া জানিতে পায় অমিত আজ মুক্তি পাইবে—জেলের কোন কর্মচারীর কন্যা তাহার ছাত্রী ছিল,—(হয়তো শরৎ গুপ্ত মিথ্যা কথা কহে নাই, অমিত···) সবিতা দুই-এক মাস ওপাড়ার একটা মেয়ে কলেজে মাস্টারিও করিয়াছিলেন। এন্‌শিয়ান্‌ট হিস্টরি এ্যাণ্ড কাল্‌চারে মনুর সঙ্গে

সবিতাও পাশ করিয়াছে ; বৈদিক যুগ ছিল তাহার বিশেষ পাঠ্য। সে ভালো পাশ করিয়াছে, এখন গবেষণা করিতেছে ফিলজফির অধ্যাপক সেনশাস্ত্রীর নিকটে। অমিতের জন্য আজ সমস্ত সকাল অপেক্ষা করিয়া এই শেষে সবিতা চলিয়া গেল। তাহাকেও দেখাশুনা করিতে হয় পিতাকে, ব্রজেন্দ্রবাবু মোটের উপর সুস্থই আছেন। বৃদ্ধ হইয়াছেন ; কিন্তু অমিতের পিতার মত তাঁহার স্মৃতিভ্রংশ ঘটে নাই। সবিতার সমস্ত পাঠ আলোচনা গবেষণায় তিনিই আসলে পথ-নির্দেশক আর সহচরও। 'জ্যেঠামশায়' আজ সাগ্রহে অমিতের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন ; অমিতকে নিমন্ত্রণও তিনিই করিয়াছেন। সবিতাদিও এখনি আসিয়া যাইবেন ; অমিতকে পিতৃসমীপে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। ব্রজেন্দ্র রায় চক্ষে কম দেখেন। সেবার বারাণসীতে বেরিবেরি ও গ্লোকোমা হইবার পর হইতে তিনি আর পড়াশুনা করিতে পারেন না, সবিতাই পড়িয়া শোনায়। তাই সবিতা কলেজেরও কাজ করিতে চাহে না ; বৃদ্ধ ব্রজেন্দ্র রায়ের তাহা হইলে দ্বিপ্রহর কাটিবে কিরূপে ? সবিতা পিতার কাছে বসিয়া বই পড়ে। মাঝে মাঝে লাইব্রেরিতে যায় বা কলেজে সেনশাস্ত্রীর নিকট পরামর্শ লইয়া আসে, আর এই বাড়িতে অনু-মনুর সঙ্গেও দেখা করিয়া যায়, পঠিত বিষয় লইয়া মনুর সহিত আলোচনা করিতে বসে। গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে সবিতাদি, বাজে মেয়েদের মতো ফাঁকি, ফাজলামো, স্মার্টনেসের ধার ধারে না। অমিতের কিংবা তাহার পিতাব খোঁজ বেশি দিন না পাইলে ব্রজেন্দ্রবাবু অস্থির হন, প্রায়ই সবিতাকেও তাই ছুটিয়া আসিতে হয়, 'অমিতবাবুব কি খবর, মনু ?' অমিতের জেলখানাব চিঠি দেখে, চিঠি পড়ে ; তাহা জ্যেঠামশায়কে পড়িয়া শুনাইবার উদ্দেশ্যে লইয়া যায়। আবার কোনো দিন হঠাৎ আসিয়া পড়িলে অমিতের উদ্দেশ্যে লেখা অনুর ও মনুর চিঠিও দেখিয়া যায়। মনুর সঙ্গেই তো এম-এ পড়িত, তাই পড়াশুনার জন্যও প্রায়ই পূর্বে এ বাড়ি আসিত। অমিতের পিতার স্মৃতিশক্তি যতদিন ব্যাহত হয় নাই ততদিন সবিতাও ছিল তাঁহার প্রধান এক সঙ্গী। বন্ধু ব্রজেন্দ্র রায় তত সচল নাই ; অমিতের পিতাও সচল নাই ; দুই জনার মধ্যখানে অতীতদিনের বন্ধুত্ব আর বর্তমান শোকাহত সহমর্মিতার বন্ধন তখন সুদৃঢ় করিয়া রাখিয়াছিলেন সবিতাদি।

. মা যতদিন ছিলেন সবিতাদিকে পেলে সান্ত্বনা পেতেন। আর গোপনে গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন—'এমন মেয়ের এ দশা! এর আর কোনো উপায় নেই কি?'—অনু এই সংবাদটিও যোগ করিল।

অমিতের অচঞ্চল মুখে কি কোনো ক্ষীণছায়াও ফুটিয়া ওঠে নাই? সম্ভবত ওঠে নাই। সম্ভবত কেন, অমিত জানে নিশ্চয়ই ওঠে নাই। এ জীবনে অনেকখানি সংযম অনেকখানি আত্মশাসনের মধ্য দিয়া অমিতকে দিন অতিক্রম করিতে হইয়াছে। অনেক শ্যেনদৃষ্টি 'রায়সাহেব', 'রায়বাহাদুরের' প্রশ্ন ও ছলনাকে সুস্থিরভাবে কাটাইয়া উঠিতে হইয়াছে। অনেক ভুজঙ্গ সেন, বিভূতি বিশ্বাসের শাণিত বুদ্ধি ও সুচতুর 'সদিচ্ছা' তাহাকে সহজ স্বচ্ছন্দ মুখে গ্রহণ করিতে হইয়াছে—বন্দিশালায় যোগদান করিতে হইয়াছে সমমতের ও বিষম মনের বহু বন্ধুগোষ্ঠীর আলোচনায়। ধরা না পড়িবার বিদ্যা তাই অমিতের অনায়ত্ত নয়। সে যথেষ্ট সতর্ক। সেই সতর্ক মন স্বচ্ছন্দ মুখ লইয়া অমিত এতক্ষণ মনুর মুখে সবিতার কথা শুনিতেছিল—ওই সহজ বিবরণ কি সত্য? সত্য মনুর কথা? না, উহা ইঙ্গিত আরও কোনো একটি গভীরতর সত্যের? অমিত নিঃসন্দেহ যে, সবিতাদিব কথা বলিতে বলিতে মনুর মুখে চোখে একটা সহজ উৎসাহ দেখা দিয়েছে;—সবিতাও অমিতের গৃহ-পরিবেশে তাহার পিতা ব্রজেন্দ্র রায়ের মতো অনু-মনুর এখন অনেক বেশি আপনার জন হইয়া উঠিয়াছে, মনুর অকৃত্রিম আস্থা ও সৌহার্দ্যও সবিতাদি লাভ করিয়াছে। দিনের পর দিন এক সঙ্গে লেখাপড়া, সবিতার প্রকৃতিগত সৌন্দর্য ও মর্যাদাময় আচরণ, বিশেষত বন্দী অগ্রজের জন্য সবিতার চাপল্যহীন শ্রদ্ধা ও আগ্রহ,—মনু ও অনুর কাছে বুঝি তাহাকে তাহাদের সমগোষ্ঠীর করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু মনুর সকল উৎসাহের পিছনে কি তাই বলিয়া প্রচ্ছন্ন একটু প্রয়াসও ছিল না—দাদাকে বুঝিয়া লইবার একটু ইচ্ছা? তাই ভাবিয়াই অমিত মনে মনে হাসিতেছিল—অত সহজে ধরা পড়িবার মতো নয় তোমার দাদা, মনু। আর তুমিও মনু বড়ই কাঁচা—নিজের আগ্রহাতিশয্যে নিজেই আবার ভুলিয়া গিয়াছ তোমার সেই উদ্দেশ্যও—ঝোঁকের বশে সবিতাদির গল্পটাই করিয়া চলিয়াছ বেশি। সেই মূল জায়গাটিতেও তোমাকে, ছাখো, কেমন ফিরাইয়া

আনিয়া দিতেছে চতুর্গুণ অশ্রু—মায়ের কথা এই সঙ্গে জুড়িয়া, আর সেই প্রসঙ্গে আরও গভীরতর এবং আরও মৌলিক একটি জিজ্ঞাসা মায়ের মুখের, 'এর আর কোনো উপায় নেই কি ?…' মায়ের প্রশ্ন ? মায়েরই কি ছিল এই প্রশ্ন, অমিত ? আর শুধু প্রশ্নই কি ছিল ? ছিল না তাহার পশ্চাতে কোনো একটি 'হইলে হইতে পারিত' সম্ভাবনার স্বপ্ন, অমিতের নিজ হাতে নষ্ট-করা কোনো একটি শুভ পরিণতির কথা ?

অমিতের সঙ্গে সবিতার বিবাহের কথা একবার উঠিয়াছিল, যেমন উঠে বাঙালাদেশের মেয়েমাত্রেরই বিবাহের প্রস্তাব অনেক স্থলে ও অনেকবার, তেমনি,—তাহার বেশি কিছু নয়। ব্রজেন্দ্র রায় অমিতের সঙ্গে ইতিহাস ও নানা কথা আলোচনা করিয়া মনে সুখ পাইয়াছিলেন। সবিতা তখন বুঝি আই-এ দিয়াছে বা পাশ করিয়াছে, আর অমিত ঝটিকাবিক্ষুব্ধ কালের মোহানায় ভাসাইয়া দিয়াছে তাহার দিনরাত্রির তরণী। কোথায় বা তখন সবিতা, আর কোথায় বা অমিত ? যথানিয়মে সুপাত্রে কন্যাদান করেন ব্রজেন্দ্র রায়, আর অমিতের কুলায়ত্যাগী যৌবনস্বপ্ন দিগন্তের অভিযানে উহার হিসাবও রাখে নাই। তবু বন্ধন দশার পূর্বক্ষণে ব্রজেন্দ্র রায়ের আহ্বানে অমিত এক সন্ধ্যায় তাঁহার গৃহে গিয়াছিল, আর দেখিয়াছিল তাঁহার গৃহের বারান্দায় নব-পরিণীতা, গম্ভীরা, মর্যাদাময়ী সবিতাকে,—লাল পাড়ের শুভ্র বসনের আড়ালে উদ্ভাসিত একটি সুগৌর সুডোল বাহু বল্লরী, চোখে মুখে দেহে গতিতে বিবাহের স্বাভাবিক নিয়মেই মুঞ্জরিত এক নতুন শ্রী, নতুন স্থিরতা, নতুন মহিমা। বলিতে গেলে অমিত সেদিনই সবিতাকে যেন প্রথম দেখিয়াছিল। আর সেদিনই বুঝি প্রথম বুঝিয়াছিল—বিবাহ বিষয়ে নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্ট অমিত—শশাঙ্কনাথের সত্য :—গৃহের আশ্রয়েই জীবন নিশ্চয়তা লাভ করে, পায় তাহার সমৃদ্ধি আর মর্যাদার সন্ধান।

অমিতের সেদিনকার দেখা সবিতাই বহুদিনের অদর্শন সত্ত্বেও অমিতের নির্বিকার চৈতন্যের মধ্য হইতে অদ্ভুত শক্তি, বেদনা ও মাধুর্য লইয়া আবার সমুত্থিতা হইল বন্দিশালায় অমিতের শেষদিককার জীবন-খণ্ডে—যখন বন্দিশালার অতৃপ্ত বায়ুমণ্ডলে শশাঙ্কনাথের হৃদয়ের সদিচ্ছা আর আবেদন বারে

বারে অমিতকে আপনার অতীত, আপনার ভবিষ্যৎ, আপনার পরিত্যক্ত গৃহ আর অবিচ্ছিন্ন গৃহবন্ধন সম্বন্ধে চমকিত, জিজ্ঞাসাকুল করিয়াই তুলিতেছিল; যখন অমিতের নামে ব্রজেন্দ্র রায়ের চিঠি আসে সবিতার হস্তাক্ষরে, আর সেই হস্তাক্ষর জানায় অমিতের জন্য 'প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশা'। এই সত্যি বুঝিয়াই কি এই সুতীক্ষ্ণ শর-নিক্ষেপ করিতেছে এখন এই বুদ্ধিমতী বোন অনু? অমিতের মর্মে তাহা বিঁধিয়াছে কি? বিঁধিয়াছে। কিন্তু অমিতও অত সহজে বিচলিত হইবার মতো নয়, অনু।

অমিত বলিত: উপায় নেই কেন, অনু? কার হুকুমে? সেই মনু মহারাজের বিধানে? কিন্তু মনু মহারাজের অপেক্ষা মানুষ-জীবটা অনেক বেশি বড়।

ধরা দিতেছে কি অমিত? না, না। একটা বিকৃত সমাজ-ব্যবস্থাকে অস্বীকার না করিলেই তো সে ধরা পড়িত। অনু তখন করিত কেন দাদার এই দ্বিধা? তাহাই তো বিকার। আর, আর · এইটুকু পরিমাণে ধরা দিতেই তো চাহে অমিত; শুধু এইটুকু পরিমাণে।

মনু জানাইল—উপায় হওয়া কিন্তু সহজ নয়। তখনকার দিনে ব্রজেন্দ্রবাবু উপায় করিতে চাহিয়াছিলেন—তিনি সবিতার জন্য সংসার নতুন করিয়া গড়িয়া দিবেন। কিন্তু সবিতাই বাঁকিয়া বসিল। কিছুই শুনিল না। তাই শেষ পর্যন্ত আবার সে পড়িতে লাগিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে সে জীবনের অর্থ প্রত্যক্ষ করিবে। ব্রজেন্দ্রবাবুও তাই তাহাকে লইয়া তখন বারাণসী গেলেন, সেখানে সবিতা সংস্কৃতে অনার্স পাশ করিল। এখানে যখন সে ফিরিল তখন পড়িতে লাগিল ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এম-এ। নিয়ম-সংযত মর্যাদায় তাহার জীবন বাঁধা। বলিয়া মনু কথা শেষ করিল: তুমি দেখবে দাদা, এলেন বলে। তোমার কথা তো ওঁদের বাড়িতে লেগেই আছে।

অমিত বলিল: তা বলে আজই যেতে হবে চায়ের নিমন্ত্রণে?

বাঃ! যেতে হবে না? সকাল থেকে এসে বসে ছিলেন সবিতাদি! চায়ের নিমন্ত্রণ কই? জ্যেঠামশায় তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন আর সে কবে থেকে।—কেন, তোমার কোনো বাধা আছে নাকি আজ যাবার পক্ষে?

না, বাধা নয়। এই এলাম। বাবা রয়েছেন—আজ আমি বাড়িতেই থাকতাম তোমাদের কাছে—

যত সহজ করিয়া সম্ভব কথাটা সেইরূপেই অমিত বলিল।

গভীর এই স্বপ্ন ও উপলব্ধি অমিতের: পৃথিবীর যে সত্যকে সে অনায়াসে জন্মাবধি পাইয়াছে,—তাহাকেই এই নবজন্মারম্ভে সে সচেতনভাবে গ্রহণ করিবে। মা আর নাই; তবু পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী,—নাড়ীতে নাড়ীতে বাঁধা এই মানব-সম্পর্কের মধ্যে সে আপনাকে আবিষ্কার করিতে চায়। চায় সেই মানবীয় মায়া-মমতার সাধারণ রসে সঞ্জীবিত হইতে। এই গৃহ-পথে না হইলে পৃথিবীকেও সে আবিষ্কার করিতে পারিবে না; করিবে শুধু পরিক্রমণ; আপনাকেও করিবে পরিশ্রান্ত—শশাঙ্কমোহনের মতো···

মনু বলিল: একবার ঘণ্টা দেড়-দুইএর জন্য তুমি যাবে। শহরটাও দেখা হয়ে যাবে অমনি। আমিও মেহতাকে তখন খবর দিয়ে আসব, জীওনলালকেও পড়িয়ে আসব দু অক্ষর।

অনেকক্ষণ তাহারা পিতার খোঁজ লয় নাই। মা নাই, কিন্তু এইখানে অমিতের জীবনের যে দ্বিতীয় প্রাণ-উৎস তাহাও যে আজ নিঃশেষপ্রায়,—অমিত যথাসময়ে বুঝি এই অমৃত-ধারাও আর স্বীকার করিতে পারিল না।···অমিত পা টিপিয়া টিপিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল—পিতা বিশ্রাম করিতেছেন। শ্রান্ত বুকের আন্দোলন অমিত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। নিঃশ্বাসের সঘন শব্দ শুনিল। তারপর, আবার নিঃশব্দে গৃহের বাহিরে আসিল।

What a piece of work ··অথচ a quintessence of dust তার নিয়তি।

৯

অনু বলিল : ওঘরে বিশ্রাম করবে।

'ওঘরে' পার্শ্বের ঘরে। ইহাই ছিল মায়ের ঘর। এখানেই মা শুইতেন, পার্শ্বে থাকিত অনু। আর ওদিকে ওই দেয়ালের পার্শ্বে ছোট খাটে তখন শুইত মনু। আজ সে খাটই গিয়াছে পিতার ঘরে, তাহাতেই অনুর শয্যা। আর, মায়ের এই খাটে আজ মনুর শয্যা। ঘরের চতুর্দিকে মনুরই নানা উপকরণ আয়োজন : ভাই-বোনের পড়িবার খান দুই টেব্ল্, চেয়ার, ব্যায়ামের সরঞ্জাম, ছাত্র-জীবনের তোলা কোনো কলেজীয় সেমিনারের ফটো, কোনো ফুটবল ইলেভ্ন্-এর ছবি, দুই-একটি কালো কষ্টিপাথরের ভাঙা দেবতা ও ও অপদেবতা, পাহাড়পুর, না বানগড়, কোথায় গিয়াছিল একবার তাহারা ছাত্ররা, সেইখানকার কোনো গ্রামবাসীর নিকট হইতে সস্তায় উদ্ধার করা পোড়ামাটির মূর্তি।—'সূর্যমূর্তিই' হবে,—মনু বুঝায়,—দেখছ না বুটপরা সেই ইরানী 'মিত্র'। শুনিয়া অনেক দিনের পুরাতন প্রেম অমিতের মনে জাগিয়া উঠিতে চায়—'সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙলার ইতিহাস।'…তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে, বাতিল হইয়া গিয়াছ তুমিও, অমিত।

কিন্তু এখন আর গল্প নয়,—অনু বিছানা তৈয়ারি করিয়াছে—দাদা ঘুমাইবেন।

ঘুমুব! পাগল নাকি?

অমিত দ্বিপ্রহরে ঘুমাইত না? তবে কি করিত সে?…তাই তো, কি করিত অমিত, ইহারই মধ্যে যে তাহা বলা অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। পড়িত? হাঁ, পড়িত। কিন্তু সব দিন তো পড়িত না! লিখিত—কিন্তু তাহা মাঝে মাঝে। গল্প করিত? হাঁ, গল্প করিত; কিন্তু তাহাও বা কতক্ষণ কয় মিনিট? ঘুমাইতও নেহাত দুই-একদিন কদাচিৎ। তবে করিত কি অমিত? সত্যই তো, কি করিত, হিসাব তাহার কোথায়।

সহাস্যে অমিত বলিল : গল্প করতাম। আড্ডা দিতাম—আর এখনো তাই করব।

শুধু গল্প ? শুধু আড্ডা ?—মনু বিশ্বাস করিবে না।

'শুধু' কেন ? তাস আছে, পাশা আছে, দাবা আছে, লুডো আছে, মাজং আছে। আবার আছে সেতার এস্রাজ, এমন কি, গ্রামোফোনও।

বাদ ছিল শুধু লেখা আর পড়া, না দাদা ?—হাসিয়া বিছানার পার্শ্বে একটা মোড়ায় বসিল অনু। তাহার উজ্জ্বল চোখের বুদ্ধির ছটা দেখিয়া হর্ষে গর্বে অমিতের দৃষ্টিও নাচিয়া ওঠে—কী দুষ্টু হইয়াছে এই বোনটা।

হাসিয়া অমিত বলে : হাঁ, লেখাপড়া ওখানে নিষিদ্ধ।

সু-সিদ্ধ তবে কি ? ঘুমনো নয়, না ?

ঘুম—বিকল্পে, মধ্যবাভাবে। আড্ডাই প্রশস্ত।

বেশ, তাই হোক ; তুমি শুয়ে পড়ো—আমরা শুনি তোমার কথা।

বিশ্রামের জন্য দেহ শয্যায় এলাইয়া দিল অমিত। নিকটে ঘিরিয়া বসিতে হইল অনুকে মনুকেও।

ছয় বৎসরে কথার শেষ আছে নাকি ? কত কথা উহাদের মুখে ফোটে, অমিতের মনে পড়ে, সে প্রশ্ন করে। অসংখ্য জিজ্ঞাসা মনে চাপা রহিয়াছে, আরও অসংখ্য চিন্তা চেতনার প্রান্তসীমায় পাক খাইতেছে।

…এই খাটে, এইখানটিতে মা শুইতেন ; শেষ দিনও শুইয়াছেন। তাঁহার সেই দেহের স্পর্শ আজও কি এই জীর্ণখাটের কাঠে কাঠে মাখা নাই ? মাখা নাই এই দেয়ালে, চৌকাঠে, দুয়ারে, জানালায় ? এই যে—দুয়ার ধরিয়া যেখানটিতে অশ্রুব্যাকুল মা দাঁড়াইয়াছিলেন—বাহিরে সিপাহী সান্ত্রী-পুলিশ—অমিত বিদায়কালে পদধূলি লইতে লইতে বলিয়াছিল, 'আসি মা।' এখানে উঠিয়াছিল সেই কম্পমান ব্যাকুল দেহের আকুল কণ্ঠস্বর, 'আমার সংসার গড়বার সাধ যে শেষ হল'… মায়ের সেই প্রার্থনা, সেই আকূতি কি জাগিয়া নাই ওইখানটিতে, ওই মেজে, এই মনু-অনুর মাথায়, বুকে হাতে ?…ওই ঘরে বাবা এখনো বিশ্রাম করিতেছেন। কী আশ্চর্য, মানুষের কী শ্লথ পরিণতি ; আশ্চর্য মনীষার কী অভাবনীয় ক্ষয়খিন্নতা ! ইহারই মধ্যে—এই জীবনের মধ্যেই

যেন তিনি থাকিয়াও এখন আর নাই। দেহটাই যা আছে, মন জীবনের বন্ধন হইতে নির্গলিত হইয়া যাইতেছে।…অথচ ওই ইজি চেয়ার হইতে উঠিয়া পুলিশ-পরিবৃত অমিতকে সেদিন তিনিই স্থির নিকম্প কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, 'এসো।' সে তো কণ্ঠস্বর নয়, যেন অভয় মন্ত্র—'অভীঃ অমিত, অভীঃ।' যেন তাঁহার গম্ভীর আত্ম-নিবেদন বিশ্বদেবতার উদ্দেশে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং।…আজও গৃহাগত অমিতকে তিনি বলিলেন, 'এলে'—সেই চেয়ারে বসিয়াই বলিলেন। কিন্তু আজ কতটা ইহা জীবন, কতটা ইহা মৃত্যু? ইহা যেন জীবনের শেষ পংক্তি দিয়া মৃত্যুর পাদপূরণ মাত্র। জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বের এই অনিবার্য পরিণামকে সম্মুখে লইয়া তথাপি তাঁহারই গৃহতলে, সংগ্রামে সংঘর্ষে কেমন করিয়া এই গৃহের আদরে বর্ধিতা বোন—সেই বালিকা অমু জীবনের সশস্ত্র সারথি হইয়া উঠিয়াছে; আর এ পাড়ার পূজায়-পার্বণে মেলায়-উৎসবে পাগল সেই ভাইটি কিশোর মমু দায়িত্ববান অগ্রজ হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তব, কঠিন বাস্তব,—সংসারের দৈন্য, মাতৃহীন জীবনের দ্বন্দ্ব, পিতার বার্ধক্য-গ্রস্ত অসহায়তা,—কেমন করিয়া তাহাদের দুই জনার কৈশোর যৌবনের স্বপ্নে-ভরা, রঙে-ভরা, রসে-ভরা দিনগুলিকে কঠিন দায়িত্ববোধে স্থির গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে! এমন প্রথম যৌবনের দিনে, অমিত, তুমি তোমার জীবনের তরণী কত দুঃসাহসী যাত্রায় ভাসাইয়া দিতে, নিশ্চিন্ত উৎসবে ছাড়িয়া দিতে। সত্য সত্যই তো কৌস্তরী মৃগের মতো আপন গন্ধে পাগল হইয়া বনে বনে ঘুরিবার মতোই ছিল সেই দিনগুলি—কলিকাতার জনারণ্যে, মানুষের মিছিলে, রাঢ়ের লালমাটির পথে, পূর্ব বাঙলার নদীস্রোতের বাঁকে বাঁকে, পুরীর সমুদ্র-তরঙ্গের মধ্যে…

'অমিত!'

কে ডাকিল না? একটা অর্ধবিস্মৃত কণ্ঠস্বর…

তাই তো, এ কোথায় অমিত! অমিতের ঘুম পাইয়াছিল বুঝি। ওঃ, কখন পলাইয়া গিয়াছে দুষ্টুরা—দাদাকে ফাঁকি দিয়া।

অমিতই তাহাদের কথা শুনিতে শুনিতে উন্মনা হইয়া গিয়াছিল—কেমন করিয়া আত্মীয়রা তাহার বিদায়ের পরে একবার কোনোরূপে সংবাদ লইবার

নাম করিয়াই সরিয়া পড়িয়াছিল। অপূর্বের মতো অমিতের বন্ধুরাও মন্নুকে পথে দেখিয়াই একবার কুশল জানিয়া লইত, বাড়ি আসিত না। আত্মীয় কুটুম্বরা কেহ কেহ আরও বিমুখ হইল। অমিত নাকি নিজের সর্বনাশই শুধু করে নাই, করিয়াছে আরও অনেকের সর্বনাশ···

সুরোদির জন্যই প্রথম গোলমাল বাধল ··

কিন্তু কথাটায় অমিত সাড়া দিল না যে? · দাদা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন।

অনু মনু তারপর উঠিয়া গিয়াছে। দাদার জিনিসপত্র তাহারা ততক্ষণে গুছাইয়া ফেলিবে। ঘরটা সাজাইয়া ফেলুক। কিন্তু কাজ করিবার উপায় আছে? অনুর বিরক্তি ধরিয়া যায়—সে সব গুছাইতেছে; মনু কেন হাত দিয়া মিছামিছি সব অগোছাল করিয়া ফেলে?—

তন্দ্রা হইতে জাগিতেই নিজের ঘরের এই তর্ক আপত্তি অমিতের কানে গেল। কি করিতেছে উহারা? অমিত ধীরে ধীরে গিয়া দুয়ারে দাঁড়াইল। সেই লেখার-খাতার বাক্সটা বুঝি—ইহাতেই আছে সুনীল ও সুশীলদার খাতাও।

আমি খুলে দিচ্ছি,—অমিত বলিল,—দু-একটা টুকিটাকি জিনিস আছে। আর খাতাপত্র।

কিন্তু তাহাতেই যে অনু-মনুরও ঔৎসুক্য। মনু না দেখিয়া পারে না—দাদা কি বই আনিলেন। অনু দেখিবে না—দাদা কি লিখিয়াছেন? প্রত্যেকে তাহারা অন্যকে এতক্ষণ বুঝাইতেছিল—এইগুলি সে রাখিয়া দিক, দাদার জিনিস দাদাই বুঝিবেন ভালো। কেন অন্যের উহা নষ্ট করা? কিন্তু দুইজনে এখন একসঙ্গে উত্তর দেয়: বেশ, তুমি দাঁড়িয়ে ছাখো, আমরা তুলে সাজিয়ে রাখছি।

সত্যই ইতিমধ্যে অনু অনেকটা গুছাইয়া ফেলিয়াছে, বাকি আছে বিশেষ করিয়া বই ও খাতা। টুথপেস্ট, টুথব্রাশ, শেভিংসেট্ পুরাতন জায়গায় গিয়াছে। দেয়ালের ছোট আলমিরটায় স্থান পাইয়াছে টুকিটাকি জিনিস! জুতাও বুঝি সিঁড়ির সামনেকার কুলুঙ্গিতে গিয়াছে—যেখানে এখন আর নাই সেই সোনালি বাঁধুনির চাপলি·· সেই পুরাতন গৃহ-সংসার, তার সব তবু নাই আর।

বিছানা এ ঘরে দিলে? বাবার ঘরে দিলে হত না?—অমিত বলিল।

বাবার ঘরে ?—চোখ তুলিয়া তাকাইল অনু। যে হাস্যময়ী বালিকা এতক্ষণ মৃদু কলভাষে কলহ করিতেছিল, সে আবার এই এক মুহূর্তে সেই প্রথম-নিমেষে দেখা দায়িত্বশীলা নারী প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।—বাবার ঘরে তুমি থাকবে? দুদিন পরে হবে। বাবার কখন কি দরকার তুমি জানো না তো এখনো।

কত সহজে অনুর মুখে তাহার কথা নির্দেশের মতো হইয়া উঠে। অমিতকেও তাহা মানিতে হইবে।

এক কাজ করবে? বাবার কাছে গিয়ে বসবে তোমরা? এঘরে আমি কাজ শেষ করে ফেলি। সব শেষ হবে না—বইপত্রের জন্য একটা নতুন আলমিরা কিনতে হবে এবার। ততক্ষণ দেখি কি ভাবে এগুলো রাখা চলে—বলিতে বলিতে অনুর মুখে আবার হাসি ফুটিল : ভয় নেই। তোমার খাতাপত্র চুরি করব না। দেখলাম তো—নোট বইতে বই আব খাতার তালিকা করে রেখেছ। বেশ, কাল না হয় তা মিলিয়ে দেখবে। আজ আমি হিসেব দাখিল করতে পারব না।

অমিত হাসিয়া বলিল : কাল গরমিল হলে আমি আর এই চোরদের পাব কোথায়? তবে দ্যাখো, আমিও প্রেসিডেন্সি জেল থেকে আসছি—সেটা 'মহাবিদ্যার' প্রেসিডেন্সি কলেজ।

কেমন সে কলেজ?··· কি বলিবে অমিত! কাহার কথা বলিবে? কোথা হইতে আরম্ভ করিবে, কোথায় শেষ করিবে? অপরূপের সেই তীর্থ-ক্ষেত্রকে বর্ণনা করা যায়? না, বর্ণনা করা যায় জীবনের বিরূপ-আয়তনকে? বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু ভোলাও যায় না। অমিতের মন গৃহচ্ছায়ায়ও সেই আলো-আঁধারি জাল বুনিতে থাকে। জন্ম-আত্মীয়ের মুখে-মনে আসিয়া সেই অনাত্মীয়ের আভাস মিশে।

আচ্ছা শুনবে সে সব। এখন দেখি বাবা কি করছেন।

বিশ্রামান্তে একটু সজীব সেই মূর্তি। অমিত সানন্দে সেই ঘরে ঢুকিল। এক মুহূর্ত পরেই অমিতকে তিনি চিনিতে পারিলেন। বলিলেন, অমি? বাড়ি এলে কখন?

অমিতের উৎসাহ আবার নিবিয়া গেল। না, বাবা ইহার মধ্যেই সব ভুলিয়া গিয়াছেন। অমিত বলিল : বারোটার সময়েই এসেছি।

বারোটার সময়।—আস্তে আস্তে তিনি কথাটা উচ্চারণ করিলেন। তারপর বলিলেন, ওঃ! বেরলে না আর?

একটা তীক্ষ্ণ আঘাতে যেন অমিত চমকিয়া উঠিল।—অমিত বাড়ি বেশিক্ষণ থাকিবে না, বাড়ি সে থাকিতে চায় না; সেই পুরাতন দিনের কথা এখনো পিতার স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায় নাই। তাই আজও তিনি ধরিয়া লইয়াছেন। নিষ্প্রভ চোখে ক্ষোভ নাই, জিজ্ঞাসাও নাই।—তাঁহার এই কথাকয়টিও শুধুই সেই চিরদিনের অভ্যস্ত কথা ও অভ্যস্ত ভাবনার সহজ প্রকাশ মাত্র। অমিত কি উত্তর দিবে?

আবার ধীরে প্রশ্ন হইল : আজ কাজ নেই বুঝি তোমাদের?

'তোমাদের'—তোমাব নয়। অমিত একটু মৃদু হাস্যে বলিল : না, আজ আর বেরুতে চাই না।—তারপব যোগ করিল উহার সহিত অমিত,—এখন। একটু পরে বাবা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন'—এখন কটা অমিত? বলিবার মতো একটা সহজ কথা অমিত পাইল। বলিল : প্রায় তিনটে। আপিসে যাবে না আজ?

এক মুহূর্তের মতো অমিত বিভ্রান্ত বিমূঢ় হইল : 'অপিসে?' পর মুহূর্তে শুনিতে পাইল,—আর বুঝিতেও পারিল, বাবা বলিতেছেন : পূজা আসছে না? পুজো-সংখ্যার কাজ নেই?

অদ্ভুত এই মেঘাচ্ছন্ন চেতনা। বাবা বুঝিতেছেন—পূজা আসিতেছে; হয়তো সেই সঙ্গে জানেনও—মা আজ গৃহে নাই। আবার এখনো তিনি সেই সঙ্গেই ছয় বৎসর আগেবার অমিতকেই আঁকড়াইয়া বসিয়া আছেন—অমিত বাড়ি ছাড়িয়া পলাইয়া বেড়ায়; পূজায় সংবাদপত্রের বিশেষ সংখ্যা বাহির হইবে; 'নেশনের' সহযোগী সম্পাদকরূপে অমিতেরও এই সময়ে বিশেষ কাজ পড়িবে, অন্তত সেই অজুহাতে অমিত বাড়ি হইতে আরও বেশি পলাইবার সুযোগ পাইবে। কেমন অদ্ভুত এই চেতনা! বাস্তবকে আর তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, অথচ স্মৃতিলোকের কোন একটা রেখা মুছিয়া না গিয়া ইহারই সহিত মিলিয়া-

মিশিয়া বরং নতুন করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। সম্মুখের শাই সত্য পশ্চাতের বিস্মৃত অতীতের মধ্যে তলাইয়া মিলাইয়া যায়। এখানে কাল-পারম্পর্য নাই, আছে শুধু অনুভূতির আর সংবেদনার নিত্যতা। তাই ছয় বৎসর পূর্বেকার পিতৃ-হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনা ও অনুচ্চারিত আশঙ্কা তাঁহার এই অবলুপ্ত প্রায় চেতনার মধ্য হইতে লোপ পায় নাই—তাহা লোপ পাইতেছে না, লোপ পাইবে না।···অমিত, কাল তোমাকে টানিয়া লয়। আগাইয়া দেয়, পিছাইয়াও ফেলে; পাক খাইয়া তুমি ভাসিয়া চল। কিন্তু তোমার পিতার চেতনায়,— তাঁহার সংবেদনা অনুভূতির মধ্যে,—তোমার সেই ছয় বৎসর পূর্বেকার জীবন অবিনশ্বর হইয়া আছে। সেখানে অবিচ্ছিন্ন হইয়া আছে উহার তীব্রতা, উহার উদ্দামতা, আর উহার দৃকপাতহীন নিষ্ঠুরতাও। জীবন আগাইয়া গিয়াছে, তুমি আগাইয়া গিয়াছ—Life marches. কিন্তু তাহা মুছিয়া যায় নাই, ছয়-বৎসর-আগেকার সেই তুমিও এই পিতৃ-চেতনায় এইরূপ বাঁধা পড়িয়া আছ। তুমি তোমার চলমান জীবন লইয়া সেই বাঁধা পড়া তোমার পরিচয়কে ভাঙিয়া গড়িয়া আর পিতার মনে নতুন করিয়া তুলিতে পারিবে না। এই ক্ষীয়মান, বালুকালুপ্ত চৈতন্য-প্রবাহে তুমি, অমিত, তোমার চলমান, ধাবমান চিন্তা-ভাবনা-চেতনার ধারা আর মিশাইতে পারিবে না!

এ কোথায় ফিরিলে তুমি, অমিত, কোন গৃহে? কোথায় সেই মা, কোথায় তোমার সেই পিতা? তোমার সেই জগৎ, তোমার সেই জীবন?···

হয়তো অনেকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, অমিতের আত্মজিজ্ঞাসা আর শেষ হয় না। একটা বেপরোয়া মাছি বাবাকে বারে বারে বিরক্ত করিতেছে। এক-একবার তিনি তাহা বুঝিতেছেন, ক্লান্ত মন্থর ভাবে হস্ত তাড়না করিতেছেন। আবার কিছুক্ষণের মতো ভুলিয়াও যাইতেছেন—শূন্য দৃষ্টিতে দেখিতেছেন সম্মুখের পথ।

অনু এল কলেজ থেকে?

অমিত চমকিত হইল। একবার ভাবিল বুঝাইয়া বলে, অনু আজ কলেজে যায় নাই। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল—কাজ কি? তাঁহার চিন্তা নিজ গতিতেই চলুক না। অনেক তাঁহাকে তোমরা মথিত করিয়াছ; আর কেন?

অমিত বলিল : অনুকে ডেকে দোব ?

না। অনু আসবে।

সেই অর্ধস্ফুট কণ্ঠে একটা শিশু-সুলভ নিশ্চয়তা—'অনু আসবে।' অর্ধস্ফুট শিশু-হৃদয়ের মতো অনেক দিনরাত্রির অপেক্ষায় তিনিও জানিয়াছেন—যথা সময়ে অনুর বাহু তাঁহাকে আশ্রয় দিবে। আর মাতৃ-হৃদয়ের মমতা দিয়াই অনুকেও বুঝি এই আস্থা, এই ভরসা অর্জন করিতে হইয়াছে।

অনু সত্যই আসিল। কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নারীমূর্তি। ইহার কণ্ঠই বুঝি অমিত সেই ঘরে শুনিতেছিল একটু আগে। আপন চিন্তায় অমিত নিমগ্ন ছিল, তাই শুনিয়াও শোনে নাই। এই কণ্ঠস্বরও বুঝি অপরিচিত, কিংবা বিস্মৃত। অমিত তখন শুনিতেছিল শেক্‌সপীয়রের সুপরিচিত কণ্ঠস্বর—'জীবনের সপ্তকাণ্ড,, উহার শেষ দৃশ্য—

Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything…

না, শুধু তাহাও নও, Yet hath my night of life some memory…

অনু ও মনু যেন সেই শেষ অঙ্ককে অস্বীকার করিয়া ঘরে ঢুকিল—মুখে ঔজ্জ্বল্য, চোখে উৎসাহ, কী একটা বলিবার আগ্রহ যেন তাহাদের চোখ ছাপাইয়া, দেহ উপছাইয়া পড়িতেছে। আর তাহাদেরই পিছনে একটু সসম্ভ্রম চরণে ও দৃষ্টিতে তাহাদেব আড়ালে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইয়াছে অপরিচিতা সঙ্গিনী…

অনু সোৎসাহে ঘোষণা করিল : এসে গিয়েছেন সবিতাদি।

অমিত মুখ তুলিয়া দেখিল ;—হয়তো বাবাও মুখ তুলিলেন, কিন্তু অমিতের তাহা লক্ষ্য করিবার মতো অবসর নাই ;—সবিতা !

পরিপূর্ণ যৌবনের মাঝখানে একটি মৃণাললতিকার মতো দীর্ঘদেহী মেয়ে। আত্মসংযত দেহে কোথাও চাঞ্চল্যের আভাস নাই। মুখের বুদ্ধির আভা সম্ভ্রমে নম্রতায় স্নিগ্ধ, এবং আচ্ছাদিতও। শান্ত দৃষ্টিতে তাই কৌতুহলের কোনো ছটাও নাই। আপনাকে আপনি যে মাপিয়া মাপিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে, ছাটিয়া লইয়াছে, তেমনি এক আত্মসমাহিতা সঙ্কুচিতা নারী। ফুটিবার আনন্দে সে ফুটিয়া উঠে নাই,—পৃথিবীর ডাকে, মৃত্তিকার মায়ায়, সূর্যের অমৃত পান

করিয়া প্রাণলীলার দুর্বার সুন্দর মোহে যে ফুটিয়া উঠে—তেমন স্বতঃস্ফুরিতা তরুণী নয়। শান্ত, শ্রীময়ী, কোনো তপোবন-কন্যা,—পাগল হইয়া বনে বনে ফিরিবার মতো হরিণী নয়। সযত্ন-আয়ত্ত সংযম-শীলতায় সে যেন আপন যৌবনকে অগ্রাহ্য করিয়াই আপন জীবনকে বিকশিত করিতে চায়; বাহিরকে ছাঁটিয়া চায় অন্তরে ফুটিয়া উঠিতে। কোনো দূর আকাশের আলোর জন্ত কি তাহার প্রতীক্ষা নাই? সুন্দরী পৃথিবীর কোনো পরিণত দানের জন্ত নাই কোনো প্রত্যাশা?

কি করিবে অমিত? কি করিবে? একটা অস্বাচ্ছন্দ্যতায় মুহূর্ত-কালের জন্য সেও সহজ হইতে পারিল না। অমিত দাঁড়াইয়া উঠিল, নমস্কার করিবার জন্য হাত তুলিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই অমিত ব্যস্ত বিব্রত হইয়া পড়িল—করে কি সবিতা? সে যে পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছে। না, না,—কিন্তু সবিতা তাহা শুনিল না। প্রণাম করিতে চলিল পরে অমিতের বাবাকে।

প্রথম যৌবনের সেই সুডোল গৌরবাহু এখন দীর্ঘ মৃণাল ভুজে পরিণত হইয়াছে। সুপুষ্ট মুখমণ্ডল এখন দীর্ঘ মুখশ্রীতে রূপগ্রহণ করিয়াছে। শান্ত ওষ্ঠাধরের সুচিক্কণ শ্রীতে এখন দৃঢ়তা আসিয়াছে; কপালের উজ্জ্বল দীপ্তির স্থলে আসিয়াছে নির্মল বুদ্ধির স্থির আভা। সেদিনের স্ফুটনোন্মুখী তরুণী আজ বৈধব্য-নিয়তা আত্ম-সঙ্কুচিতা নারী। তাহার এই প্রকাশ তো অমিত কল্পনা করে নাই। অমিতের মনে এর রূপের কোনো ছায়াও জাগে নাই। এই সত্য আর সেই কল্পনাতে মিলাইয়া আবার অমিতকে নতুন করিয়া পরিচয় করিতে হইবে—ইহার সহিত, ও আপনার সহিত।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন: কে?

আমি সবিতা, কাকাবাবু।—কণ্ঠে আত্মীয়তা ও আগ্রহ।

সবিতা—সবিতা এসেছ—। কিন্তু অমি চলে গিয়েছে যে—

হায়, এ কোন চিন্তার সহিত কোন কথা বাবা মিলাইতেছেন। অমিত বুঝিল তাঁহার খণ্ডিত চিন্তার মধ্যে একটা নিগূঢ় সংযোগ আছে। কিন্তু তাহা না বুঝিবার ভান করিয়া অমিত বলিল:

এই যে আমি, যায়। যাবে কোথায়?

বৃদ্ধ কেমন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন: যাবে—কোথায়?—একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল, কি? না, না, অভ্যাস মতো বুঝি তাহাও তিনি গোপন করিলেন, বলিলেন: কে জানে? কিছুই বুঝি না যে আমরা।

অমিতের মাথা নত হইয়া যায়, দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আসে। সকলকে শুনাইয়া সে হাসিয়া বলে: আর যাওয়া নাই এখন।

মন্থু বলিল: বসো সবিতাদি।

বসুন,—কি বলিবে অমিত ইহাকে? 'সবিতা দেবী?' কিন্তু কেমন অদ্ভুত শুনাইবে না? তাহার পূর্বেই মন্থু হাসিয়া উঠিল, বলিল: 'বসুন'!—দেখলে সবিতাদি দাদার কাণ্ড। সবাই 'লেডিজ'—তুমিও!

অমিত বিব্রত হইল। তাহার যৌবনাপরাহ্নের ম্লান মুখেও রক্তাভাস দেখা দিল। রাগ করিয়া মনে মনে বলিল: মূর্খ মন্থু। তুমি কি করিয়া বুঝিবে—জীবনের দীর্ঘতম বৎসরগুলি যে নারী-মুখও না দেখিয়া পুরুষ সংসর্গে, পৌরুষ কল্পনায়, তর্কে আলোচনার আপনার যৌবন অতিক্রম করিয়াছে, তাহার পক্ষে অকস্মাৎ এমনি পূর্ণযৌবনা নারীর সঙ্গে কথা বলা—আলাপ জমাইয়া তোলা,—কত বড় পরীক্ষা? বিশেষত, সবিতার মুখেও লজ্জারক্তিম আভা দেখা দিয়াছে।

থামো মন্থু—সবিতা মন্থুকে সস্নেহে শাসন করিল। তারপর অনেক বৎসরের সম্ভাষণ ফুটিল তিনটি সামান্য শব্দে:

আমাকে 'তুমিই' বলতেন।

মুখে শান্ত সলজ্জ নম্রতা। 'তুমি' বলিত কি অমিত? পূর্বে কোনো দিন সবিতার সহিত সে কথা বলিয়াছে কি? অমিতের কিছুই মনে পড়ে না। বলিয়া থাকিলেও মনে রাখিবার মতো মন তাহার তখন ছিল না। তাহা বুঝিয়া আরও অমিত বিব্রত বোধ করে। আরও নিজেকে স্বচ্ছন্দ করিতে চায়। হাসিয়া বলে, আচ্ছা। কিন্তু আমাকেই কি তুমি 'আপনি' বলতে?

চেষ্টা করিয়া স্বচ্ছন্দ হওয়া যায় না, বরং অপরকেও অস্বচ্ছন্দ করিয়া তোলা যায়। সবিতা তাই কথা বলিতে পারিল না, মাথা নাড়িয়া জানাইল: হাঁ।

অমিতকে সে আপনিই বলিত। তাহার স্বাভাবিক সঙ্কোচ অমিতের অস্বচ্ছন্দতায় আরও বাড়িয়া যাইতেছে।

অমিত বলিল: তা হলে তাও এবার বদলাও।

সবিতা আর উত্তর দিতে পারিল না। অনু ও মনুর মধ্যে একটা চকিত দৃষ্টির বিনিময় ঘটিল কি? অমিতের সেরূপ সন্দেহ হইল। সে তাড়াতাড়ি একটা সহজ প্রশ্ন মনে করিয়া ফেলিল: তোমার বাবা কেমন আছেন সবিতা?

বাঁচিয়া গেল অমিত, বাঁচিয়া গেল সবিতা—সহজ আলাপের বিষয় লাভ করা গিয়াছে। সবিতা বলিল, বাবা ভালো আছেন। আপনার প্রতীক্ষা করছেন।

'প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশা'?…কিন্তু অমিতের মুখে কথা যোগাইবার আগেই মনু বলিল: তোমরা ওঘরে বসবে, দাদা? তোমাকে দেখতে এসেছে এ পাড়ার স্কুলের ছেলেরা। ওরাই সেদিন তোমাদের মুক্তি দাবী করতে মিছিলে গিয়েছিল—

কোথায় তারা?—হাসিয়া অমিত দাঁড়াইয়া উঠিল। আমাদের 'লিবারেটরস্' —মুক্তি-সৈনিকেরা কোথায়?

বারান্দায় জন কয়েক কিশোর বালক দাঁড়াইয়া ছিল। অনু সকলের জন্য মেজেয় মাদুর পাতিয়া দিল। তাহাদের চক্ষে সসম্ভ্রমদৃষ্টি—এই সে 'স্বদেশী' যোদ্ধারা—যাঁহারা দেশের জন্য ফাঁসি-কাঠে প্রাণ দেন, আন্দামানে গিয়াছেন, অনশনে মরিতেছেন,—আর এত সাধারণ দেখিতে!

আমি বাবাকে একটু হরলিক্স দিয়ে আসছি।—বলিয়া অনু চলিয়া যাইতেছিল। সবিতাও তাহার অনুসরণ করিতেছিল, বাধা দিল। মনু একটা মোড়া আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া বলিল: বসুন, লেডি সবিতা!

অমিতের প্রতিও পরিহাস আছে কথাটায়। কিন্তু মনুর মুখে সবিতার প্রতি পরিহাস বেশ স্বচ্ছন্দে জুটিয়া যায়। সবিতাও তাহা গ্রহণ করিতে পারে। দুইজনে তাহারা সহপাঠী ছিল, তাহাদের সৌহার্দ্যও সহজ।

সবিতা ব্যাকুল হইল : কী যে বলো ফাজিলের মতো।

ফাজিল! বেশ বন্ধ করলাম কথা। বিশ্বাস না হয় তা হলে আবার করো তুমি। জিজ্ঞাসা করো দাদাকে কি জানতে চাও। শোনো দাদা, সবিতাদি জেনেই পান না—তোমরা কি করছ, কি ভাবছ, কি পড়ছ। আমরা কি জানাব ওঁকে? তুমি কি চিঠিতে তা লিখতে? নানা লোকের কাছে নানামুখে এখানে-ওখানে গল্প শুনতাম। তাই চাল দিয়ে ওঁকে বলতাম— দাদা লিখেছেন। উনি বলতেন, 'কই, দেখি চিঠি।' তখন বলতাম, হারিয়ে ফেলেছি।

মন্টুর বাক্যস্রোতে আবার সবিতা কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল। অমিতই কুণ্ঠিত হইতেছিল, সবিতা তো হইবেই। সবিতা আপত্তি করিল :

এত বাজে কথাও বানিয়ে বলতে পার তুমি।

জানা না থাকলেই বানিয়ে বলতে হয়। নইলে তোমার মতো মানুষের কাছে আমার দাম থাকত কি? 'অমিতদার ভাই'—এই দামটুকুও তো পেতাম না। দ্যাখো, ভাই বলে বাজারে চাকরি পাই না। ভাই বলে তোমাদের থেকে সম্মানটুকুও আদায় করতে দেবে না?

অমিতের মুখে কথা যোগাইল : এটারও একটা বাজার দর হয়েছে বুঝি? 'রাজবন্দী',—কংগ্রেসে, কর্পোরেশনে তো দর হয়েছে। দেশের মানুষকেও ও-নামটা বিক্রী করে ঠকানো যাবে, না?

এবার মন্টু পরিহাস ছাড়িয়া দিল : ঠকানো কেমন দাদা? মিথ্যা কথা নাকি কথাটা? না, এ সত্যের কোনো মূল্য নেই?

সে মূল্য বুঝি দেশের লোককে পরিশোধ করতে হবে?

এবার আলোচনার আসর তৈয়ারি হইয়াছে।—ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির কথা নাই,—আলোচনার নৈর্ব্যক্তিক সাধারণ ক্ষেত্র। এখানে বুঝি দশজনের মধ্যস্থতায় অমিত ও সবিতার আর কথা বলিতে বাধাও থাকিবে না।

সত্যই সবিতা বলিল : পরিশোধ কেন বলছেন। এ তো স্বীকৃতি। স্বীকৃতি শুধু এই কথাটার—'আমরা মুখ ফুটে যা বলতেও পারি না, তোমরা তা রক্ত দিয়ে ঘোষণা করেছ।'

বড় শ্রান্ত সুরেই সবিতা কথা বলুক, কথাটার পিছনে আবেগ আছে। ভালো করিয়া না বুঝিলেও, ছেলেদের চোখেও এই কথায় সম্মতি ফুটিয়া উঠিল। অমিত সতর্ক হইল। এই মোহ তাহাকে যেন স্পর্শ না করে—বড় চাকরি…বড় মাহিয়ানা…এই বড় 'বীরত্বের' মূল্য।

সে হাসিয়া বলিল: তাতে কিন্তু এক সাংঘাতিক মোহ দেশকে পেয়ে বসবে। 'একদিনের' নাম ভাঙিয়ে আমরা অনেক দিন খাব। আর তারপর সেই নামের সুযোগ নিয়ে আমরা দেশের ও মানুষের কল্যাণকে বিনষ্ট করব—অপমানিত করব।

অমিতের সত্যই আশঙ্কা জন্মিয়াছে। কিন্তু শুধু তাহাও নয়। এই মুহূর্তে একটা 'বক্তৃতার' অবকাশ লাভ করিয়া আপনাকে সে সবিতার সম্মুখে স্বচ্ছন্দ করিয়া লইতে চাহিল।

অনু ফিরিয়া দেখিল একটা তর্ক ও আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। বলিল: ফটিকদের সঙ্গে এখন একটু কথা বলো, দাদা। আমি ততক্ষণ বইগুলি গুছিয়ে ফেলি ওঘরে।

চলো—বলিয়া অনু উঠিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সবিতাও চলিল—অনু আপত্তি করিল: তুমি বসো না, সবিতাদি। দাদার সঙ্গে কথা বলছিলে। ওঃ, দাদার বইপত্র, খাতাপত্র না দেখে ছাড়বে না?—হাসিয়া উঠিল অনু। সবিতা লজ্জা পাইলেও অনুর আপত্তি শুনিল না, তাহার সঙ্গে চলিল।

স্নিগ্ধমুখে এবার অমিত মাদুরে বসিয়া ছেলেদের পরিচয় লইতে লাগিল। ছোট ছোট মুখ কয়টি, তের চোদ্দ হইতে ষোলর মধ্যে ইহাদের বয়স। আরও ছোট আছে দুইজনা, কাচা মুখ, কাঁচা মন—ইহাদের দিকে তাকাইতে কেমন মমতা হয়।· এমনি বয়সেই অমিত তোমার মনের দুয়ারে ভারতবর্ষের মাতৃমূর্তি রূপ ধরিয়া উঠিতে শুরু করিয়াছিল—।

একটু গল্প করিতেই ইহাদের সঙ্কোচ ঘুচিয়া গেল।

অমিত যে আসিয়াছে এ খবর তাহারা জানিয়া ফেলিয়াছে। একটু পরেই কলেজের দাদারাও আসিবেন। মা-মাসীরা আসিবেন সন্ধ্যার পরে। তাঁহারা কি করিয়া অমিতের কথা জানিবেন? জানিবেন না? তাঁহাদের ছেলেরা

মেয়েরা গিয়াছিল আন্দামান অনশনের সময়কার মিছিলে। যাইবে না? দ্বীপান্তরে এমন করিয়া মারিবে নাকি আমাদের দেশের বীর যোদ্ধাদের?

তোমরা বীরবালকেরা দেশে থাকতে—না?—অমিত সকৌতুকে বলিল। ছেলেরা কিন্তু হাস্যকৌতুক বুঝে। হাসিয়া সলজ্জভাবে আপত্তি করে: আমরা বীর হব কি করে?

বীর তবে কি রকম? শাল গাছ দিয়ে যে দাতন করে? পাহাড়ের চূড়া ভেঙে ছুঁড়ে মারে? বাঃ! হাসছ যে? বীর কি, মহাবীর তোমরা—

কৌতুকে ছেলেরা খুশী হইয়া উঠিল। কথা জমিয়া উঠিল। সেদিনের মিছিলের গল্প তাহারা অমিতকে বলিতে লাগিল। পুলিশ লাঠি চালাইয়াছে। মেয়েরাও দুই একজন আহত হইয়াছেন।···

সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা গিয়াছিল। ডাক শোনা গেল: মন্নু! মন্নু!

অমিতের পরিচিত কণ্ঠস্বর। অধ্যাপক রবিশঙ্কর দত্ত। অমিতের তিনি অধ্যাপক ছিলেন, মন্নুরও তিনি অধ্যাপক। একদিন অমিত তাঁহার প্রিয় ছাত্র ছিল। তখন অমিতের প্রথম কলেজ জীবন। অধ্যাপক দত্তেরও অধ্যাপনার প্রথম প্রভাত। এম-এ ক্লাশের তীর হইতে অমিত তাঁহাকে হারায়, তিনি তখন পদোন্নতির ফলে গিয়াছেন রাজসাহী কিংবা চট্টগ্রাম। বৎসর সাতেক আগে যখন আবার তিনি কলিকাতায় ফিরিলেন তখন অমিতেব জেল-প্রস্থানের দিন সন্নিকট। পথে একবাব অধ্যাপক দত্তের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল; অমিত তাঁহার বাড়িতে যাইতে পাবে নাই। যাইত, কিন্তু সময় হইল না। আর উৎসাহও নিবিয়া গিয়াছিল। সেই প্রোফেসর দত্ত,—শাণিতবুদ্ধি, শাণিত-ভাষী, সুরসিক লোক—সেদিন পথে দেখা হইতেই অমিত দেখিল, তাঁহার সাদা পাঞ্জাবির উপব দিয়া গলার তুলসীর মালা দেখা যাইতেছে। কথায় তখনো সজীবতা আছে স্নিগ্ধতা আছে। কিন্তু নাই আব সেই বিজ্ঞানান্বেষীর দুঃসাহস স্পর্ধা, পৃথিবীকে যুদ্ধে আহ্বান। অধ্যাপক দত্তেব একমাত্র পুত্র হঠাৎ মাবা গিয়াছে, আব সঙ্গে সঙ্গে সেই অধ্যাপক দত্তেরও দেহাবসান ঘটিয়াছে। অমিত প্রোফেসর দত্তের শোকে মায়াবোধ করিয়াছে, কিন্তু নিজে ইহাও অনুভব করিয়াছে—প্রোফেসর দত্তকে আর সে তেমন।

করিতে পারিবে না। তাই তাঁহার সহিত দেখা করিবার আগ্রহও অমিতের আর ছিল না। কিন্তু অমিতের গ্রেপ্তারের পরে তিনিই খোঁজ করিয়া অমিতের বাড়ি আসিলেন; আর সেদিন হইতে তিনি অমিতের খোঁজ ছাড়িতে পারিলেন না। তারপর মন্টু তাঁহার ছাত্র হইল, সেই পরিচয় নিকটতর হইল। অমিতের মায়ের পীড়ার সময় অধ্যাপক দত্ত যাচিয়া রাইটার্স্ বিল্ডিং-এ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন—তাঁহার এত ছাত্র সেখানে বড় চাকরে; আরও অনেকে অমিতের সমকালীন ছাত্র; হয়তো অমিতের পরিচিত; তাঁহারা অমিতের জন্ত এইটুকু করিবে না? কেন করিবে না—অন্তত তাহার মায়ের এই মৃত্যুকালে? অধ্যাপক দত্তের ছুটাছুটি সার হইয়াছে। কিন্তু রবিশঙ্কর দত্তের জন্য আত্মীয়তা বোধ অমিতের পিতামাতা ভ্রাতা ভগ্নী সকলের মনে স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। তাই আজ মন্টু সর্বাগ্রে তাঁহাকে কলেজে ফোন করিয়া সংবাদ দিয়াছে—অমিত আসিতেছে। আর কলেজ হইতে অধ্যাপক দত্ত সোজা আসিয়াছেন অমিতকে দেখিতে।

অন্নু দাদার ঘরে ছেলেদের লইয়া চলিল—একটু ফলমুল খাওয়াইবে আজ সকলকে। না হইলে দাদা সন্তুষ্ট হইবেন না।

অধ্যাপক দত্তকে অমিত প্রণাম করিতে গেল।

নারায়ণ, নারায়ণ!—বলিয়া রবিশঙ্কর দুই পা পিছনে হটিয়া গেলেন, কিন্তু প্রণাম বন্ধ করিতে পারিলেন না। সাদা পাঞ্জাবি-চাদরের উপরে তুলসীর মালা দেখা যাইতেছিল, কিন্তু ওই শব্দ দুইটি যেন অমিতকে আরও সচকিত করিয়া তুলিল। একটা কৌতুক মনে জাগিতেছিল, কিন্তু তাহা স্থির হইতে পারিল না। রবিশঙ্করের দুই বাহু অমিতকে টানিয়া আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিল। আর সেই বক্ষস্পর্শের মধ্য দিয়া মানবীয় প্রাণের আবেশ-উত্তাপ অমিতের প্রাণেও সঞ্চারিত হইল। কৌতূহলের পরিবর্তে কেমন একটা আত্মীয়তা বোধ মনে জাগিল।...

অদ্ভুত এই মানুষের স্পর্শ! শুধু করস্পর্শের মধ্য দিয়া ক্ষমতা-চতুর লেঃ কর্নেল পিণ্ডিদাসকেও মানুষ বলিয়া মানিতে হয়। একটুকু বক্ষস্পর্শের মধ্য দিয়া এই তুলসীর মালা-পরা বৈষ্ণব অধ্যাপককেও আত্মীয় বলিয়া চিনিয়া

রোমাঞ্চিত হয়। এই প্রীতিমুগ্ধ আত্মীয়তাবোধের সূত্রেই অধ্যাপক রবিশঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে অমিতের এখন মনে পড়িল শশাঙ্কনাথকে। অমনি আবেগ-বাহুল্যহীন এক প্রীতি জাগিল অধ্যাপক দত্তের জন্য। মুখ তুলিয়া রবিশঙ্করকে বলিতে বলিতে গিয়া অমিত নিঃসংশয় হইল—এই মুখে শশাঙ্কনাথের সেই হাসির, সেই মমতার, সেই আনন্দের আভাসই সে দেখিতে পাইতেছে। মনে হইল অনেক কালের সুহৃদকে সে দেখিতেছে।

বসুন, স্যর।—অমিত আসন আগাইয়া দিল।

তুমি বসো আগে। আরে, বাঃ, সবিতা! চেনো নাকি অমিতকে! তোমার বাবা কেমন আছেন? তোমার গবেষণা চলছে কেমন? বসো তুমি, বসো তোমরা—এ মোড়ায় বসো অমিত। হাঁ, আজ তুমিই বসবে প্রথম। হোক ওরা মেয়ে, ওরা বসবে পরে। আমাদেব দেশের মেয়েরা তোমাদের এটুকু সম্মান অন্তত আজ দেখাক—এক দিনের মতো। কি বলো সবিতা?

অমিত বসিল। কিন্তু বসিবারও পূর্বে এই কণ্ঠ, এই সম্ভাষণ শুনিতে শুনিতে আলোড়িত হইয়া উঠিল। কিছুই মিল নাই শশাঙ্কনাথের সঙ্গে এই মানুষের রূপে। অথচ কেমন করিয়া সেই দুইটি পরস্পরের অপরিচিত মানুষ অমিতের জীবন-কক্ষে পরস্পরের আত্মীয় হইয়া উঠিল। অমিতকে ভালোবাসে বলিয়া—না. অমিত তাহাদের ভালোবাসে বলিয়া?—সেই ভালোবাসায় একসূত্রে গাঁথা পড়ে সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্রজেন্দ্র রায়, শশাঙ্কনাথ ও রবিশঙ্কর, রঘু ওড়িয়া আর সুনীল দত্ত ·

একটা চিড়-খাওয়া আকাশে যেন বজ্র হাঁকিবে এইক্ষণে। কিন্তু না না…

রবিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন—অমিত সুস্থির হইল অমনি।

কেমন ছিলে অমিত? স্বাস্থ্যের কথাই জিজ্ঞাসা করি—যদিও চোখেও দেখছি—আরও রোগা হয়েছ। চুল পাকছে? পাকুক। অসুখে বড় ভুগেছ, কষ্ট পেয়েছ।

আপনাদেরও তো কষ্ট দিয়েছি, স্যর, শুনলাম। সেই রাইটার্স বিল্ডিং-এ ছুটোছুটি করেছিলেন ওদের কাছে।

তা আর কষ্ট কি? আমাদের ছাত্র ওরা কেউ-কেউ; তোমাদেরও সমসাময়িক।

সে সব ওদের ঝেড়ে-মুছে ফেলতে হয় যে, স্যর। নইলে এই মেশিনারিতে ওদের স্থানই হত না।

তা সত্য। কিন্তু অমিত, আমিও তো সেই মেশিনারিরই একটা নাট-বল্টু। ওদের পর নই।

আপনারা শিক্ষা-বিভাগ; বিশেষ আবার আপনি। ওই মেশিনারির পক্ষে অপ্রয়োজনীয়। না থাকলেই বরং ভালো।

তবু আছি যখন না গিয়েই বা তখন ছাড়ি কেন?

অমিত একটু মাথা নিচু করিয়া রহিল। পরে বলিল: কিন্তু ভালো লাগে নাই, স্যর। কোথায় যেন একটা অপমান-অপমান ঠেকে।

না না অমিত, এতে নতুন অপমান কিছুই নেই। তুমি বলবে সমস্তটাই অপমান। এক দিক থেকে দেখলে আমিও তা মানি। কিন্তু তার বেশি আর কিছু নয়। আব কি জানো—ওরা মেশিন ঠিক, কিন্তু মানুষও।

'মেশিন ঠিক কিন্তু মানুষও'—সেই পিণ্ডিদাস আর খাঁ সাহেব ফতে মহম্মদ সেই রায়বাহাদুর আর রায়সাহেব, বেত-মারা মেজর-মর্কট আর বেত্রধারী পেশোয়ারী হাসান খাঁ—সবাই মানুষ! And what man has made of man.

অমিত কিছু বলিতে পারিল না। সবাই মানুষ? কিন্তু সবাই কি এক শ্রেণীর মানুষ?—মানুষের শত্রুও যে মানুষ। কোনো মানুষ মানুষের শত্রু, কোনো মানুষ মানুষের স্বপক্ষে—তাহাও কি জানিতে হইবে না? হাঁ, মানুষ সকলেই—কিন্তু সকলেই তাই বলিয়া মানুষের স্বপক্ষ নয়।

রবিশঙ্করের সন্দেহ হইল—তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া অমিতের মনে ক্ষোভ রহিয়াছে। আর তাই সেই ক্ষোভের বশেই সে উহাকে ভুল করিতেছে রবিশঙ্করের অপমান বলিয়া। আর সেই সূত্রে অমিত তাহার সমকালীন সতীর্থদের উপর আরও ক্ষোভ জমাইয়া তুলিতেছে। রবিশঙ্কর তাই মৃদু হাসিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিলেন:

সেই সিদ্ধার্থ সেন—তোমাদের ক্লাসের,—চোখ তুলে কথা বলতে পারল না, যখন দেখা করলাম।

অমিত হাসিল : চোখ তুলে সে কথা বলতে পারে না পুলিশের আই-জি, ডি-আই-জির সামনেও।

রবিশঙ্কর তাহা মানিলেন : খুব সম্ভব। বরাবরই লাজুক, 'শাই' স্বভাবের সে। তাই বলে মানুষ তো বদলায় নি।

মানুষ বদলায় না? বলেন কি প্রোফেসার দত্ত—নিজেই যিনি আর সেই প্রোফেসার দত্ত নাই। মানুষের ভাবান্তর হয়, পক্ষান্তর হয়—আর তা হলে মানুষের বদলানোর আর কি বাকী থাকে? শুধুই হাড়-মাস।

অমিত বলিল : বদলায়ও স্তর। চোখ রাঙিয়ে ওই সিদ্ধার্থ সেন চটকলের ধর্মঘটের সময় হাওড়ার কুলিদের ওপর গুলি চালিয়েছিল।

রবিশঙ্করের চোখে বেদনা ফুটিল।—তাই বলি, কী যে ওদেব বিপদ। সিদ্ধার্থকেও দিতে হয় গুলি চালাবার আদেশ।

অমিত বলিল : তা হলে What man has made of man.

এবার রবিশঙ্কর হাসিলেন। তাই অমিত তাই ;—যতক্ষণ শুধু মানুষকেই দেখি—দেখি না এই লীলা-রহস্যকে।

অমিত স্থির দৃষ্টিতে রবিশঙ্করের দিকে তাকাইল। একটা মৃদু মুগ্ধ আলোক সেই চোখে ; আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে আনন্দময় বিমুগ্ধতা। এমনি আলো, এমনি আনন্দময়তা লইয়া শশাঙ্কনাথও বন্দিশালায় এবার আসিয়াছিলেন। তখনো তিনি জানিতেন না—আসলে মানুষের রহস্যকেই তিনি না জানিয়া পাশ কাটাইয়া কাটাইয়া চলিয়া আসিয়াছেন। আজ শশাঙ্কনাথের চক্ষে সেই রহস্যাবিষ্কারের সঙ্গে সবিষাদ রহস্যবোধও আসিয়াছে। কিন্তু কোন পথে রবিশঙ্করের বিদ্যুৎ তীব্র মনীষা এমন রহস্যালোকের সন্ধান পাইল? পুত্রের মৃত্যুতে—পৃথিবীর জরা-মরণময় গৃহাশ্রমের নিয়মে? একি তাঁহার আত্মসান্ত্বনা, না, আত্মবঞ্চনা? দুইই হয়তো এক জিনিস। যাহাই হউক, ইহাই বুঝি সংসার চায়, গৃহাশ্রমও দাবী করে—এই মায়া। আর 'এ যদি মায়া হয় বড় মধুর তবে এ মায়া'—বলিতেন শশাঙ্কনাথ। আবার তাহাই

কাটাইতে কাটাইতে বিশ্বরূপে বিমুগ্ধ রবিশঙ্কর বলিলেন—লীলাময়ের বিশ্বলীলা।...

রবিশঙ্কর বলিতেছেন : শরীর দেখছি। মনের কথা তুমি না বললেও বুঝতে পারছি। তা ভাঙবে না। কিন্তু করলে কি এতদিন, বলো।

করলাম কি? কিছুই না, স্যর। কিছু করবার থাকে না বলেই তো এত মারাত্মক ও জায়গাটা।

মনু আপত্তি করিল : 'কিছুই না' কেমন? ও ঘরে যাবেন, স্যর? বই, খাতা-পত্র, পাণ্ডুলিপির পাহাড়।

তাহাকে শেষ করিতে না দিয়া অমিত বলিল : জঞ্জাল। আর তাতে হিজি-বিজি। মাথার লক্ষ পোকা।—তুমি থামো, মনু।

সোজা হইয়া বসিলেন রবিশঙ্কর। দুই-এক কথা শুনিয়াই উৎসাহিত বোধ করিলেন, মনু তাঁহাকে বইপত্র দেখাইতে লইয়া চলিল। অমিত দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু থাকিতে পারিল না। কেমন কুণ্ঠিত বোধ করিতে লাগিল। ইহারা অধ্যাপক দত্তের সম্মুখে দাদার লেখা লইয়া কী পাগলামি করিবে। সে লজ্জিতও হইতেছিল, গর্বও বোধ করিতেছিল।—কি বলিবেন প্রফেসার দত্ত, কে জানে? নীরবে সে ঘরেব দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইল।

অনু প্লেটে করিয়া ফল লইয়া আসিল : জানি, বাইরে খান না। কিন্তু আজ একটু খাবেন - সামান্য একটু দেশী ফল।

মন হইতে কুণ্ঠা সরাইয়া রবিশঙ্কর বলিলেন : দাও। তারপর অমিতের দিকে চক্ষু পড়িল। উৎফুল্ল চক্ষে খাতাপত্র ফেলিয়া বলিলেন : এ কি, অমিত এ কি করেছ?

ছেলেরাও এই ঘবে ছিল। এখন এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে। সবিস্ময়ে তাহারা দেখিতেছিল অমিতের জিনিসপত্র—অনুকে প্রশ্ন করিতেছিল। বিস্ময়ের অপেক্ষা তাহাদের বালক-দৃষ্টিতে লোভ ফুটিতেছিল—রাজবন্দী হইলে এত জিনিসপত্রও লাভ হয় নাকি! তাহাদের বালক-মনের সরল প্রশ্নে অনু বিব্রত বোধ করিতেছিল, ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। অমিতের এই মনোভাব অপরিচিত নয়। আর তাহার উদ্দেশ্য ছিল—উহাদের মোহনাশ হউক। কিন্তু

সত্যিটাই যেন উহারা জানে। যাই যাই করিয়া এখনো তাহারা যায় নাই, দেখিতেছিল অমিতের খাতাপত্র লইয়া অধ্যাপক দত্তের উৎফুল্লতা। অমিত তাহাদের মনে রাখিয়াই বলিল :

ছয় বৎসরের বাহুল্য, স্যর।—ছাতা, লাঠি, জুতা, জামা থেকে স্যুটকেস, হোল্ড-অল্, বাক্স, ঘড়ি, ফাউনটেন্পেন—একটা দোকান। তাই না, ফটিক্ ইচ্ছা হয় না রাজবন্দী হতে ?

ফটিক প্রস্তুত ছিল না। প্রথম চমকিত হইল, তারপর এই কথায় লজ্জা পাইল। কিন্তু চিন্তাটা তাহার একার নয়।

রবিশঙ্কর তাড়াতাড়ি বলিলেন : আমি ওসবের কথা বলছি না।

অমিত বলিল : না বলুন, চোখে তো দেখছেন। ছেলেরা তো অবাক হয়ে গিয়েছে। কর্তারা একদিন সত্যই পুতুলের খেলাঘর সাজিয়ে দিয়েছিল—আমাদের মন ভুলোবে। কিছু কিছু মন ভুলে ছিলও। কিন্তু খেলাঘর দু মিনিটেই ভেঙে যায়। আমাদের বাঙালী আই-সি-এসের বাঙালী মাথায় এখন এই বুদ্ধি এসেছে—পুতুল দিয়ে ভুলানো যখন গেল না তখন যাঁতাকলে পিষে ফেলাই ভালো। আমাদের বন্দী ক্যাম্পের কম্যাণ্ড্যাণ্ট মেজর তাই আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করে বলতেন, 'ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট বলেই এত হিউম্যান্। তোমাদের জন্য সপ্তাহে দুদিন করে বাঙালীর খাদ্য মাছ আসছে বারো শ মাইল দূর করাচী থেকে রেলে।' আমরাও উত্তর দিই, 'আসবেই তো। আমাদের জন্য মাছ কেন, স্ঁচ আসছে শেফিল্ড থেকে, আসছে ল্যাঙ্কেশায়ার থেকে, তুমি আসছ স্কট্ল্যাণ্ডের নিরন্ন গ্রাম থেকে।—আর আসছ তোমরা দেড় শত বৎসর ধরে। আসলে এসব আসে তো আমাদের জন্য নয়—তোমাদের জন্য, তোমরা এদেশটা শোষণ করছ বলে।' কম্যাণ্ড্যাণ্টের কথা থাক। জেলের বাঙালী ডাক্তারের চোখে ভালো লেগেছিল আমার শীতের এই চেস্টারফিল্ডটা। জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাম কত ?' মনে পড়ল কোহিনূরের দাম কে জিজ্ঞাসা করেছিল রণজিৎ সিংকে। রণজিৎ সিং বলেছিলেন, 'দশ জুতি।' তা বলবার মতো মুখ আমাদের নেই। কিন্তু ডাক্তারবাবুকে বললাম ; দাম—ছ-বৎসরের জেল। কারণ ছ বৎসরের এই তো রোজগার।—এর সঙ্গে আছে অনেক পরিবারের

অনশন। এখন লাভ ক্ষতি কষে বের করুন দাম।—কি বলো, ফটিক, কত দাম এই ফাউন্টেন্ পেনটার ?

ফটিক এবার অপ্রস্তুত হইল না, বলিল : কেন, দশ জুতি।—

অমিত সচকিত হইল। বলিল : সে কি ফটিক ?

ফটিক বলিল : যেদিন দশ জুতি মারতে পারব ইংরেজকে সেদিনই ফিরিয়ে দোব এই ফাউণ্টেনপেন।

অমিত চমকিত হইল।··· পৃথিবী তুমি তোমার অক্ষপথে দিন রাত্রি বৃথাই আবর্তিত হও নাই এই ছয় বৎসর। ভারতবর্ষ, তুমি তোমার ধ্যান-স্থির আসনে সেই মোহন-জো-দড়োর দিন হইতে শুধুই নাসিকাগ্র স্থাপিত দৃষ্টি যোগীর মতো আজও অপেক্ষা করিয়া নাই। আর স্থনীল দত্ত, জানো তোমাদের দুঃসাহসী-চেতনার সেই উত্তরাধিকার নতুন নতুন স্থনীল দত্তদের মধ্যে নতুন ভঙ্গিমায় স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে ?···

আবার ছেলেদেব সঙ্গে অমিত কথা বলিতেছিল। রবিশঙ্কর বই দেখিতে দেখিতে বলিলেন : তা হলে বই-টই পেতে অমিত ?

অমিত জানাইল, কোনো আসল কাজে সে হাত দিতে পারে নাই। গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্র পাওয়া যাইত না। দশজনের টাকা একত্র করিয়া যাহাও বা তাহারা দাম যোগাড কবিত, সে বইও গোয়েন্দা সেন্সরের বেড়া ডিঙাইয়া অনেক সময় আসিতে পারিত না। সেই পুলিশী পরীক্ষার কোনো যুক্তি নিয়ম নাই। তাহাদের জালে 'চলন্তিকা' 'বাশিয়ার চিঠি', 'রাজাপ্রজা'ও ঠেকিয়া যায়। গোয়েন্দা আপিসের বারান্দায় এখনো তাহা পড়িয়া আছে। হিটলারের মতো উহারা একদিন একটা ভালো লাইব্রেরি পোড়াইতে পারিবে।

রবিশঙ্কর পাতা উলটাইতেছিলেন। বলিলেন : তবু অমিত কাণ্ডটা করেছ কি ? এত লেখা এত পড়া, এত নোটস !

এবার অমিত লজ্জিত হইল।

রবিশঙ্কর অনেকটা আপন মনেই আবার বলিল : তাই বলি, এ রহস্য কে বুঝবে—এত নোট, এত বিষয়ে তোমার লেখা। তুমি বন্দিশালা থেকে এলে, না, এলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ?

রবিশঙ্করের বড় আনন্দের দিন, আজ—অমিত আসিয়াছে। কিন্তু সেই আনন্দকেও ছাড়াইয়া যাইতেছে এক রহস্য-বোধ। কে জানিত অমিতের এই অজ্ঞাত বিকাশ?—এ যে বিধাতরাই এক প্রকাশ!

অমিতের মন পুলকিত হইল। হাঁ, কারাগৃহ নয়, এ-বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গুরুগৃহ হইতে অমিত ফিরিতেছে। পুলকিত মনে সে তথাপি জানাইল—সে নিজে পড়াশুনা বিশেষ করিতে পারে নাই। কিন্তু কেহ কেহ সত্যই বৎসরের পর বৎসর দিনে দশ বারো ঘণ্টা করিয়া পড়াশুনা করিয়াছে। বাকী সময়টাতেও লেখা ও ব্যায়ামের পরে তর্ক-বিতর্ক আলোচনায় সে পড়ার পরীক্ষা দিতে হইয়াছে। সত্যই তাহাদের পক্ষে গুরুগৃহ-বাসই বলা যায়।

রবিশঙ্কর শুনিয়া আরও আনন্দিত হইলেন: এসো, এসো। এবার সংসারাশ্রমে প্রবেশ করো তোমরা। গৃহে পরিবারে এই জগৎ-জোড়া বিপুল খেলায় তোমাদের আর-এক খেলার ডাক পড়েছে। অন্য দিন আজ, অন্য খেলা তোমাদের।

একটা রহস্য-মাখা দৃষ্টি তাঁহার চোখে-মুখে। এ কোন মানুষ? অমিত তাকাইয়া রহিল। এ কি সেই শাণিত বুদ্ধি ইতিহাসের অধ্যাপকের পরাজয় অমিত দেখিতেছে, না, দেখিতেছে তাঁহার পরিণতি?

রবিশঙ্কর দাঁড়াইয়া উঠিয়াছেন: তাই তো বলি এ লীলারহস্য কে বুঝবে বলো? এর যে আদি-অন্ত নেই। যত তাঁর এক একটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করি,—ইতিহাসের এ-পর্ব আর ও-পর্ব,—তত মনে হয়—অপরূপ, অপরূপ।

..'অপরূপকে দেখে এলাম দুটি নয়ন ভরে'...অমিতের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল...শুধু একটি খণ্ডে নয়, প্রেসিডেন্সি জেলের গরাদের ফাঁকে ফাঁকে নয়। বিশ্বের সমস্ত ঐতিহাসিক যাত্রার মধ্যেই বুঝি বিজ্ঞাননিষ্ঠ রবিশঙ্কর তাহা দেখিতেছেন। একি তাঁহার ঐতিহাসিক বুদ্ধির পরাজয়, না পরিণতি?

আজ চলি, অমিত। কাল আমার ওখানে আসবে? বাড়ির ওঁরা আজই সন্ধ্যায় তোমাকে দেখতে আসবেন। সন্ধ্যায় তুমি থাকবে না? কিন্তু কাল তা হলে এসো আমাদের বাড়ি। দু-একজন বন্ধুকেও ডাকব। আর শোনো তো ব্যবস্থা করব ভাগবত-পাঠের। আপত্তি নেই তো? না হয় থাকুক

একদিন ভাগবত পাঠ। তোমার মুখেই আমরা শুনব—তোমাদের কথা। সেও তো ভাগবত—কংসপর্ব, কিন্তু 'ভাগবত'।

রবিশঙ্কর চলিয়া গিয়াছেন। অমিতের বিস্ময় আবার কৌতুকে পরিণত হইয়াছিল। সে শুনিল, কোন এক সন্ন্যাসিনী মাকে কেন্দ্র করিয়া এক ভক্তমণ্ডলী গড়িয়া উঠিয়াছে। রবিশঙ্কর ক্রমে ক্রমে তাঁহারই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার গৃহে সপ্তাহে একদিন করিয়া ভক্তদের ভাগবত পাঠের, ব্যাখ্যায় ও কীর্তনের মণ্ডলী বসে।

মন্থু বলিল : কিছু বলো না, দাদা। সবিতাদির কিন্তু ভারতী মাতার উপর ভয়ানক ভক্তি।

সবিতার চক্ষেব দৃষ্টিতে শাসন ও বিরক্তি প্রকাশিত হইল : তোমার আপত্তির কথাই বরং বলো না, মন্থু। ভারতী মায়ের সঙ্গে উপনিষৎ নিয়ে তর্ক করতে গিয়েছিলে। এঁটে উঠতে না পেরে চটে গেলে। কিন্তু চলো, চলো এখন। বাবা বাড়িতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

বড় দেরি হইয়া গিয়াছে। অমিত কাপড় বদলাইয়া লইল। সামান্য সেই চিরদিনকার বেশভূষা। মন্থুও তৈয়ারি হইয়াছে। কিন্তু অন্থুর বাবাকে দেখিতে হইবে, বাড়িতে থাকা দরকার। একা থাকিবে সে ?

মৈত্রেয়ী আসবে না ? শ্যামল ?—মন্থু জিজ্ঞাসা করে।

খবর পাঠাতে পারি নি। খবর পেলে এতক্ষণে এসে যেত।

পথে চলিতে চলিতে অমিত শুনিল—কে মৈত্রেয়ী. কে শ্যামল। অন্য পরিচয়ও আছে—কাহাব মেয়ে, কাহার ছেলে ; কিন্তু সে পরিচয়ে বিশেষ জানিবার কিছু নাই। আসল পরিচয়—মৈত্রেয়ী অন্থুব সহপাঠিনী ; আর শ্যামল সহযোগী—শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়। এ কালের ছাত্র আন্দোলনের সে এক প্রধান কর্মী, সেদিনকার প্রতিবাদ মিছিলের প্রধান একজন উদ্যোক্তা। সেই ছাত্র-সমিতির কাজেই অন্থুও তাহার সহযোগী। কমিউনিস্ট ছাত্রেরাই মিছিলের সেদিন ব্যবস্থাপনা কবিয়াছিল।

অন্যমনস্ক অমিত সচকিত হইল, 'কমিউনিস্ট ছাত্রও' আছে নাকি ?

অল্প কয়টি কথার মাধ্যে একই সময়ে অনেকগুলি নতুন কথা সে শুনিল :—

'শ্যামল' মনুর 'সহযোগী' বন্ধু,—আশ্চর্য নয় কি কথাগুলি? তোমাদের দিনে এ সম্ভব হইত, অমিত? অথচ কেমন সহজে মনু মানিয়া লইল—বাড়িতে সারাদিন দুপুরে সে একা থাকে না, শ্যামল প্রায়ই আসে, শ্যামল তাহার বন্ধু। পৃথিবী কত দূর চলিয়া গিয়াছে! অমিত, তুমি কি তোমার সহজ পদচারণার মধ্য দিয়া তাহার কোনো উদ্দেশ পাইতেছ? জানিয়াছ কি তোমার একটি পদক্ষেপের মধ্যে এই সসাগরা বসুন্ধরা,—অনন্ত গতিময়ী, অনন্ত তেজোময়ী, অনন্ত বীর্যবতী এই ধরিত্রী,—লক্ষ লক্ষ ক্রোশ শূন্যলোকে পরিক্রমণ করিল; আপনার কক্ষেও, কত পার্শ্ব পরিবর্তন করিল; আর কত দূর দুরান্তরের অনাগত নক্ষত্রলোকের আলোক রশ্মির উদ্দেশে হাত বাড়াইয়া দিল! তুমি শুধু জানো—স্থির নিশ্চল মৃতদেহের মতো ধরণী; আর তাহার উপর পায়ের পর পা ফেলিয়া তুমি আর তোমার মত প্রাণীরাই চলিয়াছে। কিন্তু পৃথিবী মরিয়া নাই, মরিয়া নাই, অমিত, নিশ্চল পড়িয়া নাই, ধ্যানে বসিয়া নাই। আপনার অক্ষেও সে শুধু পাক খাইতেছে না—কোনো সন্ন্যাসিনী মায়ের মতো।

হঠাৎ এই চিন্তাসূত্র ছিঁড়িয়া গেল একটি শব্দে—'কমিউনিস্ট।'

'ছাত্র-কমিউনিস্টও' আছে নাকি? অমিত জিজ্ঞাসা করিল।

দুইজনা বাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মনু দাদাকে জানাইল—ছাত্ররা সবাই কমিউনিস্ট। তারা ছাত্র সমিতি গড়ে, পাড়ায় পাড়ায় 'স্টাডি ক্লাস' করে, সম্মেলন ডাকে।

তা বলে কমিউনিস্ট হল কি করে?

কি হলে তবে কমিউনিস্ট হয় আবার?—মনু অন্তত তাহা বুঝিতে পাবে না। উহারা 'বন্দেমাতরম' বলে না; বলে ইন্‌কেলাব জিন্দাবাদ। আর বলে কৃষক আন্দোলন করিবে, মজুর আন্দোলন করিবে। দুই একজন বিলাত ফেরতা ব্যারিস্টার উহাদের নেতা—মনু তাহাদের নাম করিল। প্রাচীন ভারতের সাহিত্য সভ্যতা সংস্কৃতি সব তাঁদের মতে ভুঁয়া ফিউডাল প্রিন্‌স্ ও বুর্জোয়াদের বজ্জাতি। অমিত তাহাদের নাম জেলে শুনিয়াছে—শুনিয়াছে তাহারা কমিউনিস্ট। অমিতের পূর্বেকার চেনা কমিউনিস্ট লীডার ডাক্তার দাস অনেকদিন পূর্বেই মরিয়া পড়িয়াছে; দীনু জেল ও আত্মীয়-ঘরের মধ্য

দিয়া আর বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। মীরাট মামলায় জড়িত বা মুক্ত কর্মীরা এখনো কর্মক্ষেত্রে স্থান লাভ করিতে অক্ষম। এই অবসরে উদিত হইয়াছে মীরাটের মারকাটা কোনো কোনো অ-কমিউনিস্ট কর্মী, কংগ্রেসের নামকাটা দুই-একজন সদ্যোজাত 'সোশ্যালিস্ট'; আর অমিতদের অপরিচিত দুই-একটি ব্যারিস্টার বৈজ্ঞানিক, ধূমকেতুর মতো বক্রিমান—পুচ্ছবানও। অমিত খবরের কাগজ মারফতে তাঁহাদের নাম পড়িয়াছে, মনে মনে ইহাদের প্রতি সম্ভ্রমও পোষণ করিয়াছে। বন্দিশালার বন্দি-পরিমণ্ডলে ব্যর্থতায় বিক্ষোভে ইহারা জন্মে নাই, কর্মক্ষেত্রের নিয়মে পোড় খাইয়া খাইয়া ইহারা পাকা সোনা হইবে—পুড়িয়া খাক হইবে না—সুনীল দত্তের মতো।

মন্থু বলিল : অন্থুর বিশ্বাস তুমিও কমিউনিস্ট।

…লম্বমান দড়িটা দেখে নাই, অমিত, পুকুরের জলে জলে সেই অনুজ দেহের বিলয়ও দেখে নাই কিন্তু মন্থুর কথায় সেই বাঙালী অনুজ শুনিতে পাইতেছে কি তাহার প্রশ্নের উত্তর…'তুমিও আমাদের সঙ্গে নাই অমি'দা' ?…

ধ্যানোত্থিত অমিত জিজ্ঞাসা করিল : আমি ? আমি কমিউনিস্ট ? কেন, এ কথা কিসে অন্থুর মনে হল ?

…দি ইণ্টারন্যাশাল ইউনাইটস্ দি হিউম্যান রেস্—এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে—অমিতও চায় মানুষের মহামিলন। কিন্তু অমিত কর্মক্ষেত্রে পরীক্ষা না করিয়া কোনো মতবাদ মানিবে না। ·

মন্থু বলিল : তোমাব আগেকার বইপত্র এখানে যা ছিল তা পড়ে নাকি অন্থুর এই বিশ্বাস হয়েছে।

অমিত এবার একটু উচ্চ কণ্ঠেই হাসিল।—খুব পাকা হয়েছে তো অন্থুটা। তারপর আবার অমিত জানায় : তাতে পার্টির নাম গন্ধও নেই ; ঠিক সায়েন্টিফিক্ সোশ্যালিজমও তা নয়।

মন্থু আশ্বস্ত বোধ করিল, বলিল : অন্থুর মাথায় ওর বন্ধুরাই কেউ এ ধারণা ঢুকিয়ে থাকবে। আর মাথায় একবার কিছু ঢুকলে অন্থু তা ছাড়ে না। আবার, এমন গর্ব ওর যে, একটু তর্ক করবার পর সে বিষয় নিয়ে পরে আর কারও সঙ্গে তর্কও করবে না। এমন একগুঁয়ে।

'পাকা হইয়াছে' অনু। সেদিনের বাড়ির সেই আদরিণী কনিষ্ঠা বোন—তখনও ফ্রক ছাড়িয়া নবে শাড়ি ধরিয়াছে, তথাপি মাকে কথায় কথায় জ্বালাতন করে, অন্ত দিকে মা না হইলে একা ঘরে ভয়ে ভয়ে শুইতেও পারে না। সেই বোন এমন করিয়া একটা ভগ্ন, অভাবগ্রস্ত সংসারের ভার কেমন অনায়াসে গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছে—মনুর তাহা চোখে পড়ে না। চোখে পড়ে তাহা অমিতের ;—মাতৃহীন গৃহে হঠাৎ পদার্পণ করিতেই আজ এই সত্যটা তাহার চক্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিণতবুদ্ধি বালিকাকে মুখে 'পাকা' বলিয়াই অমিত আপনার স্নেহভরা শ্রদ্ধা তাহাকে জানাইতে চায়! আরও বেশি করিয়া তাহা জানাইতে চায়—অনুর বুদ্ধিমার্জিত দৃষ্টির সংবাদে। এই তো এ যুগের দৃষ্টি। ভাবিতে অদ্ভুত লাগে—সেই তাহার আদরিণী বোন অনু, কেমন অনায়াসে সে এ যুগেব জীবনপথকেও গ্রহণ করিতে পারিয়াছে। অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিল কোন এক তরুণ যুবক শ্যামলের সঙ্গে তাহার সৌহার্দ্য, সংযোগ, কর্মের যোগ,—আর হয়তো বা তাই হৃদয়েরও যোগ। অনুর কোথাও দ্বিধা নাই, ব্রীড়াসঙ্কুচিত কুণ্ঠা নাই, আত্মগোপন নাই, আত্ম-অস্বীকৃতিও নাই···নিশ্চয়ই পৃথিবী চলিয়াছে, অমিত তাহার গতিচ্ছন্দ শুনিতে পাইতেছে। শুনিতে পাইতেছে মহাকাশের সেই অনাহত সঙ্গীত।···

বাস আসিল। সেই বাস—সেই ভাঙ্গা, নীতিনিয়মশূন্য কলিকাতার বাস ; আর তাহার নিয়ম-শৃংখলা-বিমুখ কলিকাতার যাত্রী। অথচ দূরে কত সন্ধ্যায় বসিয়া এই অভিজ্ঞতাবও অমিত কল্পনা করিয়া পুলকিত হইয়াছে। পথ বাহিয়া বাস ছুটিবে, আর অমিতের চুল হাওয়ায় উড়িবে, চোখে মুখে ধুলা লাগিবে, নাকে কানে ধোঁয়া ঢুকিবে ; কিন্তু ছুটিবে তবু মানুষের সেই সহজ যাত্রারথ ,—ছুটিবে। উহাব নানা অনিয়মে অমিত ব্যাহত হইবে, বিরক্ত হইবে, তাহার সময় নষ্ট হইবে , কিন্তু বাস তবু ছুটিবে। কবে আসিবে আবার সেই ছুটির দিন !

টাল সামলাইতে সামলাইতে মনু দোতলায় আগাইয়া গেল, দাদাকে বসিবার জায়গা করিয়া দিল। অমিত চোখে ইসারা করিল—সবিতাকে বসিতে বলুক প্রথম। অমনি মনু বলিল : ওঃ, লেডিজ ফার্স্ট।

সংকোচে লজ্জায় সবিতা মনুকে ভ্রূভঙ্গি করিয়া শাসন করিল, পিছনের একটা সীটে সে বসিয়া পড়িল।

অমিত বুঝিল সবিতা লজ্জায় দ্বিধায়—হয়তো ভয়ে, ভক্তিতেও,—তাহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিতা। মনু কিন্তু দাদার পার্শ্বের স্থান দেখাইয়া তথাপি তাহাকে বলিতেছে: একটা সীট রয়েছে এখনো; এখানে এসো না, সবিতাদি?

তুমি ওখানে বসো, মনু।

দুই জনার চোখে একটু কথা কাটাকাটিও হইল। অমিত তাহা থামাইয়া দিয়া বলিল: তুমি ওর পার্শ্বের জায়গায় বসো মনু,—নইলে আবার কে বসে পড়বে সেখানে।

মনুর আপত্তি ছিল, কিন্তু তাহাব পূর্বে ধাক্কা দিয়া বাস আগাইয়া চলিল। কোনোরূপে মনু সবিতার পার্শ্বে বসিয়া পডিল, প্রায় তাহাব গায়েই পড়িতেছিল বাসের ধাক্কায়। অপ্রস্তুত হইতে হইতে দুইজনা তাই হাসিয়া পরস্পরকে পরিহাস কবিতে গেল। আবার অমনি সবিতা থামিয়া পড়িল—অমিতের সম্মুখে এই চাপল্য প্রকাশ বড অন্যায়। অমিত মনে মনে হাসিতে লাগিল। দ্বিধা, সলজ্জ শ্রী, আনন্দবোধ সবই সবিতাব আছে।—সবই থাকিবার কথা। চরিত্রে শ্রী আছে,—তাই অমিতের সহিত কেমন একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত দূরত্ব সে সহজে রাখিয়া চলিয়াছে। অথচ সামীপ্য-স্বীকারেরও ইচ্ছা আছে, প্রয়াসও আছে,—মনুর সহিত অভ্যস্ত আচবণে তাহা ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশিত হইতেছে। সবিতা জীবনের পোড়-খাওয়া মানুষ, খাঁটি সোনা।

মুখ ফিরাইয়া মনুর সহিত অমিতের কথা বলিতে অসুবিধা। মনু কিন্তু উৎসাহ চাপিয়া বাখিতে পারে না—দাদাকে কত কথা বলা চাই। কিন্তু আবার সে থামিয়া যায়—দাদা বুঝি কথা বলিতে চান না, দুই চোখ ভরিয়া তিনি কলিকাতা দেখিতে চান। অগত্যা সবিতাকেই মনুর সে সব কথা বলিতে হয়। আর সবিতাও উত্তর দেয় নিম্নস্বরে, দাদা শুনিবেন না?

'মেট্রোতে' এখন পাবি না। 'মুক্তি' দেখছি দ্বিতীয়বার—কাননের গান।' ···কবিতার কণ্ঠ নয়, অপরিচিত সহযাত্রীদের উচ্চ বাক্যালাপ। 'সোনার সংসারও খুব ভালো বই হয়েছে,।

কানন·· বড়ুয়া কানন···কানন···

বহুদূরে দেখা একটা নীহারিকা-পুঞ্জ। ইতিমধ্যে নক্ষত্রলোকে পরিণত হইয়াছে কি? দূর হইতে অস্পষ্ট দেখা একটা উপকূলের মধ্য হইতে কি এবার আপন আপন পরিচয় লইয়া বহির্গত হইয়াছে রমণীয় বন-উপবন-উদ্যান প্রাসাদ-বিলাসগৃহ?···অমিতের মন কৌতূহলে ভরিয়া উঠিতেছে। এই পৃথিবীতে যে ইহা ছিল তাহা তো কল্পনাও তাহারা করিতে পারে নাই! যখন 'ফ্রাঙ্কো, না, ইনটারন্যাশনাল ব্রিগেড?' লইয়া তাহারা রক্তপাত করিয়াছে, ইতিহাসের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আবিষ্কার করিবার আর অস্বীকার করিবার সংগ্রামে আপনাদের হৃদপিণ্ড উপড়াইয়া ফেলিয়াছে—কে জানিত—পৃথিবীতে—এই বাঙলায় গৃহে গৃহে—তখন 'কাননবালা শাড়ি' ও 'মুক্তি ব্লাউজ' হইয়া গিয়াছে প্রধান সাধনা;—'পাহাড়ী' আর 'লীলা দেশাইতে' তখন বাঙালী শিল্পের নতুন পাতা খুলিয়া দিতেছে।

'এ যুগের দৃষ্টি, এ যুগের সৃষ্টি'—ইহাও তো, ইহাও তাহারই একটা খণ্ড। ···'তুর্কসিব' আর 'পোটেমকিন্' যেমন পৃথিবীর আগামী দিনেব স্বপ্ন। শুধু তত্ত্ব, শুধু তর্ক, শুধু রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির তথ্য ঘাঁটিয়াই কি বন্দিশালায় জীবনের এই অজস্রতার সন্ধান পাওয়া যায়। ইতিহাসের গতিপথ হয়তো তাহাতে বুঝা যায়, সাম্রাজ্যের রূপ আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু জীবনের রূপ আরও জটিল, তাহা শত পাকে জড়ানো, অজস্র তুচ্ছতায় আশ্চর্যজনক।

সেই হালকা-হাওয়ায় উড়িয়া যাইতেছে, কত কথা আর কত মানুষ—

বাসের এই কোণটা জমাইয়া ফেলিয়াছে গুটিকয় যুবক। একটু অশোভন অবশ্য তাহাদের উচ্চকণ্ঠ আর অকুণ্ঠিত ইয়ার্কি। সঙ্গে চলিয়াছে হয়তো তাহাদেরই কাহারো জীবন-সঙ্গিনী কিংবা লীলা-সঙ্গিনী—দুইটি নাতিমৌন তরুণী। 'কেমন ভাল্‌গার ইহারা'—চোখেমুখে গাম্ভীর্য ও অসম্মতি ফুটিয়া উঠিতেছে নিকটস্থ সীটের সমাসীন এই স্বামী-স্ত্রীর—ভাবী, বা বর্তমান, দম্পতি

তাহারা। মোটর-পর্যন্ত-আয় তাহাদের নয়, কিন্তু তাহাদের স্বচ্ছলতার স্তর সাধারণ বাসের যাত্রী-স্তরের নয়, এই কথাটা সকলকে বুঝাইয়া দিতে না পারিলে স্বস্তিবোধ করিতেছে না সেই সোনার বোতাম, ধপধপে আদ্দি, কোঁচানো ধুতি ও বাঙ্গালোর-শাড়ি-ব্লাউজের সুসজ্জিত আভিজাত্য। অমিত ইহাদের দেখিয়াও কৌতুক বোধ করিতেছে। মন্থু ও সবিতার সঙ্গেও চোখোচোখি হইল। দাদার সম্মুখে সেই ছোঁড়াদের এই চাপল্য যেন তাহাদেরই পীড়িত ও অপরাধী করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের আশ্বস্ত করিবার জন্যই উৎফুল্ল মুখে অমিত বলিল: সব নতুন লাগছে।

মন্থু জানাইল: আরও দেখবে কত নতুন!

হাল্‌কা-হাসির গুচ্ছটি চাঁদনির মোড়ে নামিয়া পড়িল—সিঁড়ি দিয়া যেন রাখিয়া গেল তাহাদের হাসির গুঁড়া-গুড়া ঝিকিমিকি। দূরত্ব রাখিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে নামিল আদ্দির পাঞ্জাবি ও বাঙ্গালোরের শাড়ি। আপিস-শ্রান্ত মানুষের দল উঠিয়া পড়িল। বাস ভরিয়া গেল। দণ্ডায়মান মানুষের বেড়ায় মন্থুদের মুখ দেখা যায় না, আর কথার সুযোগ নাই। আলাপের ইচ্ছাও নাই। বাসে শুধু সংক্ষিপ্ত মন্তব্য শোনা যায়, আর চিন্তাভারাক্রান্ত বিরক্ত দৃষ্টি ও উক্তি। নিচে বোধ হয় যাত্রীদের সঙ্গে কন্‌ডাক্‌টারের তর্ক বাধিয়া গিয়াছে; উপরেও তাহার দুই-একটা ঝাপ্‌টা আসিয়া লাগিতেছে।···আশ্চর্য মনে হয় অমিতের আবার সব। সেই পুরানো পৃথিবী তেমনি মানুষ, তেমনি মুখ—আর তেমনি বুঝি শরৎ অপরাহ্নের চৌরঙ্গী রসা রোডের মাঠ ঘাস গাছ, বাড়িঘর। তথাপি অমিতের ভালো লাগে—অপরিচিত এতগুলো মুখ—যাহারা খাটে, কলম পিষে; না জানিয়া বাঁচে, আর বাঁচিয়া মরে, মরিয়া বাঁচে ··

ওঠো! নামতে হবে,—পিছন হইতে মন্থু জানায়।

একটা স্টপ্‌ বাকি তখনো। কিন্তু সীট্‌ ধরিয়া ধরিয়া টাল সামলাইতে সামলাইতে এখন হইতে চেষ্টা না করিলে ঠিক জায়গায় নামা অসম্ভব হইবে। বাস ছাড়িবার বেলা যে দেরি হয়, নামিবার বেলা তাহা সংক্ষেপ না করিলে 'পাইলটদের' আত্মার শান্তি নাই।

ফুটপাতে হাঁক ছাড়িয়া মহু বলিল : দেখলে তো ? আরও দেখবে।

অমিত বলিল : তাই তো, আশা। দেখবার মতো নতুন কিছু নেই জানলে তো জেলেই থাকতে পারতাম।

তবু তো শোনো নি, বলিও নি কিছুই—

৪

কালিঘাট-বালিগঞ্জের মধ্যস্থলে একটা নতুন পাড়ার নতুন রাস্তায় ব্রজেন্দ্র রায়ের এই নতুন বাড়ি 'সবিতা-সদন'। ছোট্ট বাড়ি, গুছানো, বাহুল্যহীন। উপরতলায় অনেকটা খোলা ছাদ, আর বাড়ির পিছনে খানিকটা খোলা আঙিনা—সবুজ ঘাস ও ফুলের গাছের একটু শ্যামলতা। কিন্তু সে সব অমিতের দেখিবার সুযোগ হইল না। একটি তরুণ বালক 'পিসির' আগে আগে সংবাদ দিল দাদুকে। বাদল বড় দাদার ছেলে—যাদবপুরে পড়িতেছে, পরে বিলাত যাইবে। এই তথ্যটা সকৌতূহল অমিত গ্রহণ করিতে না করিতেই আহ্বান শুনিল—

কোথায় অমিত ? এদিকে—

দোতালার খোলা বারান্দায় অনেকক্ষণই ব্রজেন্দ্র রায় অপেক্ষা করিতে-ছিলেন। অমিত আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বেতের আসনে দেহ টান করিয়া বসিয়া আছেন ব্রজেন্দ্র রায়। বুদ্ধিদীপ্ত মুখ স্নেহমাখা। দীর্ঘ দেহে শীর্ণতা আসিয়াছে, মাংসপেশী শিথিল হইয়াছে, দেহকান্তি একটু চিক্কণতা হারাইয়াছে—কিন্তু সেই ব্রজেন্দ্র রায় যে তাহাতে ভুল নাই, সে আলোক-শিখা নিবিয়া যায় নাই।

কোথায় ?—অমিতের উদ্দেশ্যে হাত বাড়াইয়া দিলেন ব্রজেন্দ্র রায়।—কাছে এসো, অমিত।

টানিয়া অমিতকে ব্রজেন্দ্র রায় বুকের কাছে লইলেন! কোনো দিন তো এমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতেন না ব্রজেন্দ্র রায়। সেই

ক্লাসিক্স-গঠিত মানুষের বাক্য-আচরণে বাহুল্য, আবেগ-প্রবণতা কোনো দিন অমিত শত পরিচয়, শত সান্নিধ্য, স্নেহ প্রীতির শত নিদর্শন সত্ত্বেও চক্ষে দেখে নাই। পরিমিত প্রকাশের মধ্যেই তাঁহার অপরিমিত অনুভূতির ও উপলব্ধির ইঙ্গিত থাকিত। আজও অমিত তাহাই আশা করিয়াছে। সেই চিরাগত সংস্কারকে ভাঙিয়া দিয়া ব্রজেন্দ্রবাবু অমিতকে বুকের কাছে টানিয়া লইলেন!—যেন রবিশঙ্কর দত্তের মতো হইয়া উঠিলেন ব্রজেন্দ্র রায়। জীবনের নিয়মে, প্রাণের কবোষ্ণ প্রেমপ্রীতি স্নেহমমতার তাপে ইতিহাসের ছাত্র ও ক্লাসিক্স-গঠিত বুদ্ধিবাদী একইরূপে মানুষ হইয়া পড়িতেছেন!

কিন্তু অমিতকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া, অমিতের মুখ নিজের চোখের সামনে ধরিয়া, সেই বৃদ্ধ ব্রজেন্দ্র রায় এমন হাস্যহীন ঔজ্জ্বল্যহীন চোখে তাকাইয়া রহিলেন কেন?

ব্রজেন্দ্র রায় বলিতেছেন: কোথা অমিত? তোমার মুখ দেখতে চাই, কিন্তু ভাল করে দেখতে পাই না আর। চোখ বড় বাদ সাধল যে অমিত।—

বিষাদমাখা হাসি বৃদ্ধের সেই সুন্দর পাতলা ঠোঁটে।

এইবার অমিতের মনে পড়িয়া গেল—যাহা শুনিয়াছিল, জানিত, অথচ চেতনায় যাহা জাগ্রত হইয়া থাকে নাই তাহা এইবার বিদ্যুৎ-লেখার মতো দাগ কাটিয়া তাহার মস্তিষ্কে বসিতে পারিল। একটি বারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও তাই শত পরোক্ষ জ্ঞানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গ্লোকুমায় আজ প্রায় দৃষ্টিহীন ব্রজেন্দ্র রায়। অমিতকেও স্পষ্ট দেখিতে পান না, তাই বুকের কাছে টানিয়া আনেন অমিতের মুখ। আবার পুরাতন শিক্ষাদীক্ষা সংযম-সভ্যতার বাধায় তাহাকে একেবারে বুকের মধ্যেও গ্রহণ করিতে পারেন না। ক্লাসিক্সের বুদ্ধিবাদী মানুষ হইলেও তিনি আত্মহারা মানুষ নন। বার্ধক্যশীর্ণ দুইটি জীর্ণ বাহু দুইটি যৌবনপ্রান্তিক শক্ত বাহুর স্পর্শে তথাপি শিহরণে কাঁপিতেছে। অমিতের দেহেও সেই স্পর্শ বহিয়া আনিতেছে পূর্বসঞ্চিত আবেগ মমতার ইতিহাস—প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশা।

সবিতা বলিল: উনি আরও রোগা হয়ে গিয়েছেন, বাবা। আরও ম্লান হয়েছেন কড়া রৌদ্রে, আরও চুল উঠে গিয়েছে কপালের খানিকটা—

অমিত ব্রজেন্দ্র রায়ের পার্শ্বে বসিতে বসিতে বলিল : অর্থাৎ বয়স বেড়েছে এই ছ-বৎসরে।—যেমন করিয়া হউক অবস্থাটাকে অমিত আপনার কাছে ও সকলের কাছে সহজ করিয়া লইতে চায়। দৃষ্টিহীন ব্রজেন্দ্র রায়ের চক্ষু দেখিতে চায় তাঁহার পুত্রপ্রতিম বন্ধু অমিতের মুখ আর তাহা দেখিতে পায় না। বেদনায় অমিতের মন ভরিয়া উঠিতেছে। সেই মুখের দিকে অমিত তাকাইতেছে…

সেই পুরাতন ঈজি চেয়ারের উপর বর্ষীয়ান মূর্তি,—দুই হাত দুই দিকের হাতলে; ভাঙিয়া-পড়া আনত দেহ; জিজ্ঞাসা-ভরা বিভ্রান্ত দৃষ্টি যেন কি বুঝিতে চাহিতেছে, বুঝিতে পারে না…'অমি?—অমি…এলে?—এলে কখন?'

অমিত আবার দেখিতেছিল আজ তাহার প্রথম-দেখা পিতৃমূর্তি।

কিন্তু এই মুখে পিতার বিভ্রান্ত দৃষ্টি নাই। স্নেহপ্রীতির ভাবাবেগ ও দৃষ্টিহীনতার বেদনা, এই দুইয়ের সমাবেশে ব্রজেন্দ্রনাথের মুখের মাংসপেশী ক্ষীণভাবে একটু কাঁপিতেছে। দেহ ইহারও ভাঙিতেছে—আর মন?

ভাঙা-দেউলের দেবতা, তোমার বিদায়ের নিশানা কি সেদিনের মন্দিরে মন্দিরে, সকল তোরণেই দেখা যাইতেছে?

সেই ব্রজেন্দ্র রায়। তাঁহার দেহে জরা আসে নাই, মনেও জড়তা লাগে নাই। তবু সেই চিরদিনকার অধ্যয়ন-নিরত জিজ্ঞাসা-নিরত চক্ষু আজ যখন চিরসন্ধ্যার ছায়ায় আচ্ছন্ন, মনও কি তখন আপনার পরাজয় মানিয়া না লইয়া পারে? অবসন্ন আয়ুর কাছে ইহাও কি মানব-শক্তির আত্মসমর্পণ নয়?… What a piece of work is man! · তবু শেষ পর্যন্ত মাত্র quintessence of dust! · তথাপি মানবশক্তির আরও শোচনীয় পরাজয় কিন্তু সেই ঈজি চেয়ারের বোধবিলুপ্ত জীবন!

কেমন আছ অমিত? চোখে না দেখি, কানেই শুনি—তাতেও খানিকটা বুঝতে পারব।—সবিষাদ হাস্যে ব্রজেন্দ্র রায় বলিতেছিলেন।

যথাসম্ভব আনন্দ-সজীব কণ্ঠে অমিত বলিল : ভালো আছি। ছ বৎসরে পৃথিবী যত বদলেছে, এরা যত বদলেছে, আমি তত বদলাই নি, প্রায় একই আছি।

খুব ভুগেছো তো ?

বাবলের সঙ্গে কি কাজে সবিতা নিচে চলিল, মন্টুকে একটু নিম্নকণ্ঠে বলিল : তোমরা গল্প করো মন্টু ; আমি চা করছি। অমিত বুঝিল—সবিতা আতিথেয়তার অবকাশ খুঁজিয়া লইতেছে। একটু পরেই আবার মন্টুরও নিচে ডাক পড়িল ; হয়তো সবিতা একেবারে একাও থাকিবে না। কিংবা, ইচ্ছা করিয়াই বুঝি দুই জনাতে অমিতকে ব্রজেন্দ্র রায়ের নিকট একা রাখিয়া গেল —সমকর্মের দুই সুহৃদ চিরদিনের মতো তেমনি গল্প করিবার যেন অবকাশ পায়। ওদিকে নিচের ঘরে ক্ষণে ক্ষণে শুনিতে পাওয়া যায় মন্টুর হাসির সহিত আর একটি সংযত অনুচ্চ হাসির ক্ষুদ্র শুভ্র তরঙ্গ।

ব্রজেন্দ্র রায় বলিতেছিলেন : খুব ভুগেছ অমিত, না ?

অমিত হাসিয়া উত্তর দিতেছিল : বাইরেই কি আপনারা কম ভুগেছেন ?

সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়···দেবেন ঘোষ নিরঞ্জন শশাঙ্কনাথ · বারীন নন্দী··· সুনীল দত্ত '—পীড়ায় দেহক্ষয়, অবহেলায় মৃত্যু, অসুস্থতায় অবসাদ, ব্যর্থতায় বিমূঢ়তা, ব্যাহত যৌবনের উন্মত্ততা, রুদ্ধাবেগ যন্ত্রণার আত্মনাশ :—এসবকে তুমি তুচ্ছ করিও না ; ইহাদের প্রতি অন্যায় করিও না, অমিত। অন্যায় করিও না···

"আমি যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে ॥"

অমিত বলিল : আর জেলখানা তো জেলখানাই জ্যেঠামশায়।

অমিতের মুখে এই আত্মীয়সম্ভাষণও এই প্রথম ফুটিল। ব্রজেন্দ্র রায় ইহার অর্থ বুঝিলেন ; দৃষ্টিহীন চোখ একবার নিমীলিত হইল। মুখের পেশি স্বল্প একটু কাঁপিল। তারপর তিনি বলিলেন, যাক, তবু এসেছ। আমরা যে তোমাদের প্রতীক্ষায় বেঁচে আছি। তোমাদের প্রত্যাশায় এখনো বাঁচি—

শুনিলে, অমিত ? 'প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশা'—সেই শব্দ দুইটি। ব্রজেন্দ্র রায়েরই কথা তাহা, তাঁহার নিজের কথা—এবং তাঁহার ব্যক্তিসত্তায় আলোকিত এই ঘর-দুয়ার সকলেরও কথা।

অমিত শান্ত বিস্ময়ে বলিল, আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করেন, আমাদের কাছে প্রত্যাশা করেন ?

ব্রজেন্দ্র রায় বলিতেছেন : হাঁ, প্রতীক্ষা করি, প্রত্যাশা করি ;—তোমার কাছে হয়তো তা অদ্ভুত শোনায় ; কিন্তু হয়তো এরূপই জীবনের নিয়ম। পরজীবনকে খুব বড় করে না মানতে পারলে মন হয়তো এ জীবনকে এমনি আঁকড়ে থাকতে চায়। আর, পরজীবনের উপর তেমন করে নির্ভর করতে ভুলে গিয়েছি আমরা—ইংরেজি শিক্ষিতরা।

সেই ব্রজেন্দ্র রায়, অমিত, সেই ব্রজেন্দ্র রায়! তাঁহার চোখ তোমাকে দেখিতে না পাক, তাঁহার মনের চক্ষু তেমনি দৃষ্টিমান, বুদ্ধি-উজ্জ্বল! সেই ব্রজেন্দ্র রায়—আর তুমিও সম্মুখে সেই অমিতই —ছয় বৎসরের পূর্বেকার সেই পুত্র-প্রতিম বন্ধু। কিন্তু তুমি অন্য দিনের অন্য মানুষও।

ব্রজেন্দ্র রায় বলিতেছেন : অনেক গেল অনেক গিয়েছে। তবু ভাবতে পারি না সেই ছেদগুলিই প্রধান কথা। ভাবি—যাঁরা আসছে তারা এই ছেদ-গুলি ভরে দিতে পারবে। তাই প্রতীক্ষা করি, প্রত্যাশাও ছাড়ি না।…হয়তো এও ছলনা। কিন্তু নইলে থাকি কি নিয়ে—

'And so from hour to hour we ripe
And from the hour to hour we rot and rot···

We rot and rot'—আবার সবিষাদ আবৃত্তি করিলেন ব্রজেন্দ্র রায়।

অপূর্ব বেদনায় ও খেদে শব্দ কয়টি অমিতের কানে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। একবার অমিত প্রতিবাদ করিতে চাহিল : 'rot and rot' ? কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়।

কিন্তু·· পুরাতন ঈজি চেয়ারে আসীন সেই এক ভাঙিয়া-পড়া জরাগ্রস্ত দেহ ; দীর্ঘ ভগ্ন মেঘাচ্ছন্ন চেতনা-ব্যাকুল দৃষ্টির মধ্যে · 'অমি' ? 'অমি' ? ·· 'এলে, এলে ?'···আর দৃষ্টিহীন এই এক জোড়া নয়নের মধ্যে মানব-জিজ্ঞাসার অবসন্ন স্বীকৃতি···'we rot and rot' ··

একই কালে পিতার স্মৃতি ও ব্রজেন্দ্র রায়ের কণ্ঠস্বর অমিতের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে ঝাঁকিয়া দিয়া বলিতে লাগিল : কে বলিল মিথ্যা ইহা, অমিত, কে বলিল মিথ্যা—we rot and rot.

অমিত গায়ে না মাখিয়াই কথাটা বলিতে গেল : তা হলে পৃথিবীতেই পচ ধরে যেত, জ্যেঠামশায়।

প্রসন্নভাবে অমনি ব্রজেন্দ্রনাথ হাসিলেন : পৃথিবী অত মিথ্যা নয়, অমিত। একদল যায়, আরদল আসে। আমাদের পালা অনেক দিন শেষ হয়েছে ; তবু আঁকড়ে আছি, তাই পচ ধরছে। আর তাই আরও বেশি করে তোমাদের প্রত্যাশা করি—আমাদের প্রতিশ্রুতিকে তোমরা পরিণতিতে রূপ দেবে...

সেই 'বুড়োদের কাজ হাতে তুলে নাও, অমিত'।—কিন্তু সেই শক্তি অমিতের কই ? সে অবসর কোথায়, অমিত ? পৃথিবী এই ভাঙা-গড়ার মুহূর্তে তুমি শত-সহস্রের সঙ্গে মিলিয়া সেই মহাযজ্ঞে যোগ দিবে, না, বসিয়া বসিয়া এই মিছিলের মুখের ছবি আঁকিবে ? ··

অমিত বলিল : আমাদের পালা, জ্যেঠামশায়, ছিল কর্ম-কোলাহলের পালা, চিন্তা-ভাবনার দাবি আমরা মানি নি। কাজের মধ্য দিয়েই আমরা বেঁচেছি, আয়ুক্ষয় করেছি। ইতিহাস যা নেবার, নিংড়ে ফেলে সঞ্চয় করে নিচ্ছে। এবার বাতিল হয়ে যাব,—ইতিমধ্যেই বাতিল হয়ে যাচ্ছি ভদ্রশ্রেণী থেকে।

···'তুমিও আমাদের সঙ্গে নেই, অমিদা ?'···কিন্তু, সুনীল, ভদ্রলোকের সেই জীবনছন্দ অমিতও বহন করে নাই। আর তাহা অমিত বহনও করিতে পারিবে না।···ব্রজেন্দ্র রায়েব যুগের সেই প্রশস্তকাল ফিরিয়া পাইবে না, বাঙালী ভদ্রলোকের অনুদ্বিগ্ন সেই জীবনযাত্রাও ফিরিয়া চাহিবে না ; তাহার দৃষ্টি আগামী দিনের আকাশে।

ব্রজেন্দ্র রায় বলিতেছিলেন : ভদ্রশ্রেণী থেকেও ভদ্রতা বাতিল হচ্ছে, অমিত। আসলে ভদ্রসমাজই আজ বাতিলের দিকে। আগেও তুমি এ কথা বলতে, অমিত। তখনো তা বুঝতাম, কিন্তু মানতে চাইতাম না। এখনি কি সব মানি ?—তবে মানি না আর ভদ্রলোকের মোহ। খাওয়া-পরা, ওঠা-বসা, আচার-ব্যবহার, দেনা-পাওনা—এ সব নিয়েই তো ভদ্রলোক ভদ্রলোক। কিন্তু কতদিনের এসব ? কতটুকুই বা তা সব সুদ্ধ ?—সবিতাকে তাই বলি, 'এসব কিছুই টেকে না ; দেখছো তো ইতিহাসের সাক্ষ্য।' ওর সঙ্গে বসে

আমাদের প্রাচীন ইতিহাস পড়ি। আমার চোখ গিয়েছে, মোহও গিয়েছে। ওর চোখ আছে, মোহও তাই আছে। সে চোখে সবিতা দেখে—উপনিষদ, বৌদ্ধযুগের সুন্দর স্বপ্ন, অশোকের ধর্ম-বিজয়, গুপ্ত যুগের বিরাট মহিমা; দেখে অজন্তা, ইলোরা, দেখে প্রাম্বনন, বরোবুদোর, আঙ্করভাট। আর দেখে আবার র্ঁলার আলোকে বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী। এসব দেখে আর সে বিশ্বাস করে ভারতের সাধনা সত্যের একটা সনাতন প্রকাশ। আমিও এ কথা একেবারে না মেনে পারি না, অমিত। কুমারস্বামী পড়ি—সবিতাই পড়ে—রবীন্দ্রনাথ পড়ি—সবিতাই শোনায়,—দেখি তাঁর মনের জিজ্ঞাসা; জওহরলালের 'আত্মজীবনী' পড়ি—সবিতাই পড়ে,—আর দেখি তোমাদের মুখ—

অমিত নিবিষ্টচিত্তে শুনিতেছিল। ব্রজেন্দ্র রায়ও অনেককাল পরে মনের মতো শ্রোতা পাইয়াছেন। একটা যুগের আত্মবিচার অমিত শুনিতেছে, সবিতার নাম, সবিতার মন ও সবিতার জীবনদৃষ্টির একটা আভাস পাইয়া সে আরও উৎসুক হইয়াছিল।…ঠিক ইহাই স্বাভাবিক, ইহাই প্রত্যাশিত। জীবনকে মানিয়া-না-মানার প্রয়াসে সবিতা এই ভাবেই আপনাকে খর্বিত করিতে বাধ্য হইয়াছে। সে খর্বিত করিয়া চলিবে। তাহার পক্ষে এইটাই হয়তো আত্মরক্ষার পথ—এই আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া লওয়া। তাই সমস্ত দিন কেমন পালাইয়া আপনাকে বাঁচাইতেছে।…নিচের তলায় একটা সংক্ষিপ্ত স্বচ্ছ হাসি অর্ধপথে থামিয়া গিয়াছে, অমিতের তাহা কানে গিয়াছে⋯ মন্টুর সান্নিধ্যেই সে হাসি ফুটিয়াছিল, কিন্তু আবার অমিতের কথা মনে পড়িতেই বুঝি তাহা আত্মসম্বরণ করিল⋯মন্টু শুধু সবিতার পক্ষে বাঁচিবার মত আড়াল নয়, সবিতার পক্ষে বাঁচিবার মতো আশ্রয়ও⋯বাঁচিবার মতো বন্ধুও।⋯

কি ভাবিতেছ অমিত? ব্রজেন্দ্র রায় কি বলিতেছেন শুনিতেছ কি?⋯ অমিতের মুখ ব্রজেন্দ্র রায় চোখে দেখেন না, তাই বলিয়া চলিয়াছেন: 'জওহরলালের আত্মজীবনী পড়ি—সবিতাই পড়ে, আর দেখি তোমাদের মুখ'—অমিত এবার চমকিত হইল।

আমাদের মুখ?

হাঁ,—অমিত তোমাদের মুখ—তোমারা যারা আমাদের পরে এসেছ, আমাদের বংশধর—অথচ ভাগ্যচক্রে হ্যাম্‌লেটস্ অব্‌ দি এজ.

অমিত কিছুতেই ইহা মানিবে না। তাহারা হ্যামলেটের মতো জীবন-সংগ্রামে ভীত ব্যাহত নয়, তাহারা আত্ম-সংগ্রামে ছিন্ন-ভিন্ন মানবাত্মা নয়; তাহারা ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনায় উদ্বুদ্ধ; কর্মের মধ্য দিয়া আপনাদের সার্থকতার পথ তাহারা আবিষ্কার করিয়াছে। ইহা শুধু সত্য নয়—What piece of work is man! সত্য বরং Ah, how man makes himself! ··কিন্তু শুধু তাহাই কি সত্য? সর্বাংশে সত্য? ··সৃষ্টি-মথিত সেই মানবাত্মার দ্বন্দ্ব-বেদনা কি তাই বলিয়া অমিতের বক্ষতলে কান পাতিলে শোনা যাইবে না?

অমিত আবার সচকিত হয়—ব্রজেন্দ্র রায় কি বলিতেছেন শোনে নাই। সে শুনিতে লাগিল: আমরা কেউ বড় হইনি, কিন্তু আমরা মোতিলালের কালের মানুষ। না, তাঁকে আমরা চিনতামও না, জানতামও না। কিন্তু তেমন মানুষ আমরা অনেক দেখেছি। আশ্চর্য হয়ো না—ওসব প্রদেশে মোতিলাল বা সাপ্রু ছিলেন এক আধ জন। আমাদের বাঙলা দেশে তখন দশ-বিশ জন অমন ব্যক্তিত্ববান সাপ্রু-মোতিলালের অসদ্ভাব হত না। আর পেতে মানসিকতায় তাঁদের সহধর্মী মানুষ শত শত। তুমি যাকে 'বিলিতী বুর্জোয়া' বলো তাদের শিক্ষাদীক্ষা আমরা গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম। তাদের সাহিত্য, তাদের ইতিহাস, তাদের রাষ্ট্রচিন্তা, তাদের আইন-বোধ, তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদ, তাদের জাতীয় মুক্তিবাদ, তাদের গণতান্ত্রিক বিশ্বাস—এসব সুদ্ধ আমরা গড়ে উঠেছি। দ্যাখো না, এখনো রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ওদের আইন-কানুনে নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি যে সম্মান আছে এতদিন সেই নীতিকে আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখেছি। এই সভ্যনীতি আমরা পেয়েছি ইংরেজের কাছ থেকে।'—এ কথা বললে, সবিতা ও মনু তর্ক করবে, 'আমাদের বনিয়াদ ছিল, আত্মার বল ছিল, ইতিহাসে তার প্রমাণ রয়েছে,—আর তাই আমরা সভ্যতার এই নীতি বিদেশীয়দের কাছ থেকেও গ্রহণ করতে পেরেছি।' এ কথাটাও মিথ্যা নয়। প্রদীপ ছিল, সলতে ছিল, কিন্তু তৈল বোধ হয়

ফুরিয়ে এসেছিল, অন্তত আগুন ছিল না। এই বিলিতী বুর্জোয়া নিয়ে এল সেই আগুন, একটু তৈলও মিলল। ওদের প্রদীপেই আমাদের মনের প্রদীপ জলল। কিন্তু তৈল তাতে বেশি মিলে নি। আর আজ ওদের প্রদীপও নিভছে, তার কদর্য ধোঁয়ার গন্ধ আমার নাকেও আসছে। আমাদের প্রদীপও সঙ্গে সঙ্গে জলতে না জলতেই ধোঁয়াতে শুরু করেছে। তাই তাকাই তোমাদের দিকে—তৈল আহরণ করতে পেরেছ কি তোমরা? কি জানি, বুঝি না। বড় অসহিষ্ণুতার যুগ আজ, বড় অশান্ত, বড় আলোড়িত জটিল কাল। অনেক দেশের সভ্যতায় আগুন লেগেছে। আমরা বুঝতেই পারি না তোমাদের এ কালের মুসোলিনি-হিটলারদের কাণ্ড। রবীন্দ্রনাথের পীড়ার কথা শুনে তাই চক্ষে ঘুম ছিল না। হঠাৎ এমনি সময়ে পেলাম জওহরলালের 'আত্মজীবনী।' মনে হল যেন আমাদের আত্মজীবনীরই পরার্ধ,—তাতে দেখলাম তোমাদের রূপ, তোমাদের যুগ, তোমাদের মন—আর আমাদের প্রতিশ্রুতির পরিণতি।

অমিত শুনিতেছিল, কিন্তু বুঝিতে পারিতেছিল না—ইহাই কি সত্য?··· তাহারা কি ব্রিটিশ বুর্জোয়ার একটা ঔপনিবেশিক সংস্করণ মাত্র,—আর তাই তাহারাও পণ্ডিত জওহরলালের মতো একটা অর্ধেক হ্যাম্‌লেট-এর-ভূমিকা-বিলাসী অভিনেতামাত্র? এই কারণেই কি ব্রজেন্দ্র রায়রা অমিতদের মনে করেন হ্যাম্‌লেটস্ অব দি এজ? এই কারণেই কি অমিতেরও বারে বারে মনে পড়ে হ্যাম্‌লেটের উক্তি? না, তাহারা র‍্যাল্‌ফ ফক্স, কর্নফোর্ডের মতো একালের শ্রেষ্ঠ প্রেরণার বীর্যময়, বুদ্ধিময় প্রকাশ? 'ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের' স্বয়ং-সৈনিক? হয়তো দুই-ই। আর তাই অমিত জওহরলালের কথায় লেখায় তাঁহার কাব্যবিলাসিতায় বিমুগ্ধ হয়,—আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে অবিশ্বাস করে; অবিশ্বাস করে তেমনি নিজেকেও যেমন সুনীল দত্ত যে তাহাকে অবিশ্বাস করিল—একেবারে তাহা অকারণে নয়।··

অমিত ব্রজেন্দ্র রায়কে বুঝাইয়া বলিতে গেল—না, তাহারা শুধু জওহরলাল নয়। আশ্চর্য বটেন পণ্ডিত জওহরলাল। কিন্তু ওইখানে তাঁহার থামিয়া গেলে চলিবে না। আরও এক ধাপ নামিয়া, আরও এক পদ অগ্রসর হইয়া

তাঁহাকে স্বাধীনতার পথে সকলের সঙ্গে একত্র হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। কিন্তু দাঁড়াইতে হইবে ক্ষেতের কৃষকের পার্শ্বে, কারখানার মজুরের সঙ্গে, বঞ্চিত মানুষের সহিত একাত্ম হইয়া—যাহাদের ক্লান্ত দেহ আর শ্রান্ত দৃষ্টি দেখিয়া তাঁহার লেখায় কাব্যরস জমে, আর যাহাদের কালো দেহের, ময়লা কাপড়ের, গায়ের ঘামের গন্ধে পণ্ডিত জওহরলালের 'হ্যারোভিয়ান্' নাসারন্ধ্র কুঞ্চিত হইয়া যায়…

তোমরা কমিউনিস্ট অমিত, না?—কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্রজেন্দ্র রায় ধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন।

অমিত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। ..কি বলিবে অমিত? হাঁ? তাহা তো সত্য নয়। বলিবে কি, না?…কিন্তু তাহাই কি সত্য? সে কি জানে না—শোষণই মানব-সমাজের প্রধান অভিশাপ। · অমিত সত্য কথাই বলিল: ঠিক জানি না। তারপর বলিল, কাজের মধ্যে পরীক্ষা হলে বুঝব—কি সত্য, কি মিথ্যা, আমিই বা কি, আর কি-নয়।

ব্রজেন্দ্র রায়ের মনে পড়িল: কাজ ছাড়া আর কিছুকে তুমি প্রামাণ্য বলে মানো না, না অমিত? কিন্তু কাজ কি শুধু বাহ্য কাজই? চিন্তায় কাজ, বুদ্ধির কাজ, ভাবনার মুক্তি, রস-পরিবেশন,—এসব কি কাজ নয়, অমিত?

এবার অমিত বলিবার মতো কথা পাইল: কেন নয়? বরং একদিন জানতাম—এসব অবসর-স্বপ্ন। আজ জানি—এসব সৃষ্টির সংগ্রাম। আর সৃষ্টিতেই—জীবন ও জগতের নিগূঢ় সত্যের প্রকাশ। তা ছাড়া যা স্বপ্ন, যে কলা-কৌশল,—আর্ট ফর্ আর্টস্ সেক্,—তা তো অ্যাবস্ট্রাকশান্!—বড় জোর খেলা,—ভাব নিয়ে, ভাষা নিয়ে একটা ক্রস্ওয়ার্ড ক্রীড়া!

ব্রজেন্দ্র রায় অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন, হয়তো নিজের মনে কথাটা বিচার করিতেছিলেন। কিন্তু তারপর বলিলেন: আমিও তাই বলেছি—তুমি সোশ্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট হবে। কিন্তু সবিতা-মনু মনে করে—তুমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপ্নে পাগল। ভারতবর্ষের বাণীমূর্তি তোমাকে পাগল করেছে, এই শিল্প, এই দর্শন, এই সাধনায় তোমার মনপ্রাণ অভিষিক্ত।

…নিতান্ত কি তাহারা ভুল বুঝিয়াছে? ভারতবর্ষ কি এখনো তোমার

থাকে না ?...অমিত হাসিয়া বলিল : হয়তো সে কথা অতটা ঠিক নয়। তবে একেবারে মিথ্যা বলি কি করে।

সবিতা চা ও খাবার লইয়া আসিল। আগুনের তাপে সবিতার মুখ লাল হইয়া গিয়াছে; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম; একটু অগোছাল দুই এক গুচ্ছ চুল কপালের পাশে। আপনার অনুপস্থিতির উত্তর যেন তাহার সমস্ত রূপে, আয়োজনে স্পষ্ট। ইহারও মধ্যে তবু মনুর সঙ্গে হাসিবার পরিহাস করিবার সময় পাইয়াছিল।

দেরি হল। কিন্তু সন্ধ্যা হয়েছে, হিম লাগবে বাইরে, বাবা। ঘরে বসবে এবার ?

ব্রজেন্দ্র রায় আপত্তি করিতে চাহিলেন, কিন্তু অমিত শুনিল না। চাকরকে লইয়া ঢাকা বারান্দায় সবিতা বেতের কেদারা-টীপয় সাজাইতে লাগিল।

ব্রজেন্দ্র রায় বলিলেন, কিন্তু মনু কোথায় ?

সবিতা জানাইল : বসবার ঘরে। ডাক্তার দেব এসেছেন। বাদল নেই, তাই মনুকে বললাম, 'তুমি ডাক্তার দেবের সঙ্গে একটু গল্প করো।'

এখানে ডাকবে না ডাক্তার দেবকে ?

ওখানেই ওদের চা দিয়েছি। ডাক্তার দেব আসতে চাইছেন না—তোমরাই কথা বলো, তোমাদের অনেক দিন পরে দেখা হল এই প্রথম।

ব্রজেন্দ্র রায় পরিচয় জানাইলেন—ডাক্তার দেব তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহকারী ছিলেন। পূর্বে বিলাতে ছিলেন, এখন এখানে ট্রপিকাল মেডিসিন্-এ না কোথায় বড় কাজ লইয়া আসিয়াছেন। গবর্নমেণ্ট সার্ভেণ্ট। অমিত বুঝিল চাকরের মহলে তাহার সহিত সম্পর্ক ইতিমধ্যে বিপজ্জনক বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। অনিল দত্ত চাকরি হারায় সুনীলের দাদা বলিয়া। তাই জানিয়া যাহারা ব্রজেন্দ্র রায় বা রবিশঙ্কর দত্তের মতো অমিতের পরিচয় স্বীকার করিতে পারেন, তাঁহাদের ছাড়া আর কাহারও সহিত অমিতও পরিচয় স্বীকার করিবে না। ডাক্তার দেবের কথা তাই অমিত আর উল্লেখও করিতে চাহিল না। চা ও খাবার খাইতে উদ্যোগী হইল।

ব্রজেন্দ্র রায় চা পান করিতে করিতে বলিলেন : বলছিলাম না অমিত, we

rot and rot ? মানুষের চিন্তা এগিয়ে কোথায় চলেছে, আর আমরা কোথায় ? হয়তো সব বুঝব না, কিন্তু শুনতে চাই সব। কি কাণ্ড করেছে রুশিয়া জানি না। কিন্তু এ কালের মানুষ তার জনশ্রুতি শুনেই পাগল হয়ে গিয়েছে।

একটা বলিবার মতো কথা পাইয়াছে অমিত। সে উৎসাহ বোধ করিল। বলিল : তা শুধু জনশ্রুতি তো নেই আর, এখন যে প্রতিশ্রুতিরও বেশি—সৃষ্টি ! দ্বিতীয় 'পঞ্চবার্ষিক সংকল্পও' এগিয়ে চলেছে।

অমিতের চক্ষু হইতে আপনাকে এক কোণে সবিতা কখন সরাইয়া লইল। অমিতের তাহা একবারমাত্র চোখে পড়িল, কিন্তু উৎসাহে তাহা সে তখনি বিস্মৃত হইল—কোথায়, সবিতা, কে জানে ? এ যুগের মহাপরীক্ষার কথা ব্রজেন্দ্র রায়ের সঙ্গে আলোচনা করিতে কত আনন্দ।

পৃথিবী জুড়িয়া নানা-তর্ক আজ এই সোভিয়েট ব্যবস্থা সম্পর্কে। কিন্তু সে তর্ক অনেকটা নিরসনও হইয়া যাইতেছে। আসল কথা ইতিহাসে আবার সৃষ্টির যুগ আসিয়াছে ; আর তাহা আনিয়াছে সোভিয়েটস্‌। 'পঞ্চ বার্ষিক সংকল্পকে' পরিহাস করা তো দূরের কথা, এখন মার্কিন ও জার্মান শাসকেরা পর্যন্ত উহার বিকৃতি অনুকরণ করিতে ব্যস্ত। অর্থনীতিক বিচার আজ আর সোভিয়েট ইকোনমির পথ ছাড়া বাঁচিবার অন্য পথ খুঁজিয়া পায় না। সমাজ-বিজ্ঞানের একটা নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যও পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক বিয়েট্রিস্‌ ও সিড্‌নিওয়েবের গবেষণায় নিশ্চয়ই প্রামান্য জিনিস। তাঁহাদের কথা ব্রজেন্দ্রবাবু কি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন ?

ব্রজেন্দ্র রায় বলিলেন : তাই তো বলি—কিছু বুঝতে পারি না আমরা। ওয়েবদের মতো বৈজ্ঞানিককে প্রতারণা করা সহজ নয়। আবার এদিকে দেখি—লেনিনের সহকারী রথী-মহারথী সকলকে স্টালিন সরালেন। কেমন এ বিচার, কেমন ওদের স্বীকারোক্তি ! সব গুলিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মনে পড়ে Revolution eats up its children.

অমিত তাহা মানিবে না। কোথায় কি সে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছে, কি তফাত এই রুশ-বিপ্লবে আর অন্য বিপ্লবে, ব্রজেন্দ্র রায়কে তাহা বুঝাইতে সে মাতিয়া যায়। জানেও না—সবিতা কোথায়, কোথায় মন্ত, কখন বাজল

আসিয়া দাঁড়ায়, সবিতাকে কি ইঙ্গিত করে, তারপরে নিচেকার ঘরে একবার চাপা হাসি শোনা যায় মহু ও বাদলের, আর সবিতার অস্ফুট শাসনের বাধা তাহারা মানে না। তারপর বারান্দায় একে একে ফিরিয়া আসে সবিতা, মহু আর বাদল।

অমিত একবার থামিতেই মহু বলে: আমি এখন যাই, দাদা। মেহতাদের ওখানে ঘুরে আসি। তুমি বাড়ি যেয়ো, আটটার আগেই বরং যেয়ো—সন্ধ্যায় অধ্যাপক দত্তের স্ত্রী আসতেও পারেন, আর অহুও একা রয়েছে।

ওঃ!—ব্রজেন্দ্র রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—না, বড় অন্যায়, বড় অন্যায়। আজ বাড়িতে অহু রয়েছে একা বসে—এতদিন তো তুমি ছিলে না, অমিত, অহু একাই থাকত। কিন্তু আজও তোমার সঙ্গে কথা বলতে না পারলে অহুর চলবে কেন? আচ্ছা কবে আসবে আবার তুমি? কাল? পরশু? বলতে ইচ্ছা করে 'প্রতিদিন'। বুঝি তা অন্যায়। অনেক কাজ নয়, শোনার কাজ, তোমাকে পাবার কাজ। আরও শুনতে চাই, আরও জানতে চাই, আরও বুঝতে চাই—

সবিতা একটু হাসিয়া বলিল: তা হলে আর বিকালের রেডিও খোলাও দরকার হবে না, না বাবা?

ব্রজেন্দ্র রায় হাসিয়া বলিলেন: মানুষ পেলে আর যন্ত্র দিয়ে কি হবে? ছাখো, আজ খুলি নি। তবে পৃথিবীর সংবাদ আর সঙ্গীতকে যত পাই ততই পেতে চাই। জানি লাভ নেই, তবু বুঝতে চাই, অমিত, বুঝে যেতে চাই তোমাদের পৃথিবীকে।

For we must endure our going hence e'en
as our coming hither,
Ripeness is all.

All All…তবু কি জানো অমিত?—তোমার বাবারই কথা – তোমার মা যখন মারা গেলেন তখন আমাদের কথা হয়েছিল। বড় সত্য কথা বললেন তোমার বাবা, 'আমরা এ জাতি সংসারের পোকা। মায়া-মমতা-ভরা মানুষ। পুত্র-কন্যা-আত্মীয়-স্বজন সকলকে নিয়ে জড়িয়ে না থাকলে আমরা স্বস্তি পাই

না—এমনি পরিবার-তন্ত্রী জাতি। মরবার সময়েও কানে শুনতে চাই ডাক 'বাবা'! 'দাদু'! কেউ বলুক 'যেতে নাহি দিব।'—আর এ শুধু তোমার বাবার কথা বা তোমার মায়ের আকাঙ্ক্ষা নয়, সকল বাবার সকল মায়ের। তাই তোমার জন্য এত প্রতীক্ষা, এত প্রত্যাশা—

বিদায় লইবার জন্য অমিত দাঁড়াইয়াছিল। অন্যেরা নিচে নামিয়া গিয়াছে, তাহাদের এক-আধটি হাসির টুকরাও আবার এখানে পৌঁছিতেছে। কিন্তু অমিতের পা যেন আর উঠিতে চায় না। এ শুধু ব্রজেন্দ্র রায় নয়, শুধু সেই জীবন-জিজ্ঞাসু পরম সুহৃদ নয়, শুধু একটা পরিবারতন্ত্রী একান্নবর্তী জাতির সুপরিচিত আকাঙ্ক্ষাও নয়, ইহার মধ্য দিয়া এই পিতৃ-সুহৃদ অমিতের স্বর্গীয় জননীর ব্যর্থ সাধ, তাহার জীবন্মৃত পিতার জীবনের শেষ অকাঙ্ক্ষা, আর তাঁহার আপনার বার্ধক্য-বিজয়ী জীবনের সাক্ষ্যও অমিতের সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছেন। অমিতের নির্বাসিত যৌবনের আশা-সংশয়-মাখা স্বপ্নস্রোত আরও সংশয়ে-সমস্যায় আলোড়িত লইয়া উঠিল। · কী 'প্রতীক্ষা', কী 'প্রত্যাশা', অমিত ?…

অমিত দাঁড়াইয়াই ছিল। আবার হাসি শোনা গেল নিচে। ··আর অমিত দেরি করিল না।

সিঁড়ির গোড়ায় মন্নু দাঁড়াইয়া সকৌতুকে কি বলিতেছে, আর তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করিবার চেষ্টা সত্ত্বেও সবিতা হাসি গোপন করিতে পারিতেছে না। অমিতকে দেখিবামাত্র সে হাসি এক মুহূর্তে সংকোচে ভয়ে ঝরিয়া গেল। মন্নুও একটু সংযত হইল। অমিতকেও বুঝি বড় গম্ভীর দেখাইতেছে—তাহাকে দেখিয়া সবিতার হাসি নিবিয়া যায়, যে সবিতা মন্নুর সম্মুখে সহজে হাসিতে পারে, নিজেকে যে নিজের গৃহেও অমিতের চক্ষু হইতে দূরে দূরে রাখিয়া পালাইয়া ফিরে। তাহার শান্ত অনাবিল অস্তিত্ব তবু মন্নুর চপল হাস্যের আঘাতে ঘোষিত হইয়া পড়ে—এমনি অনুচ্চ মধুর হাস্যে।

অমিত বড় গম্ভীর হইয়া গিয়াছে বুঝি। না, না হাসিয়া অমিত সবিতাকে বলিল : কি নিয়ে এত হাসি, শুনতে পাই না ?

সবিতা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাহার দুই চক্ষু যেন অসহায়। মন্নু আরও কৌতুক বোধ করিল। বলিল : বলব ?

শাসন ও মিনতি দুই-ই সবিতার চক্ষে। নীরবে বলিল : মন্টু, ভৎসনায় দৃষ্টি যেন বলিল—বাজে ইয়ার্কি অমিতের সম্মুখে!

মন্টুর ঠোঁটে হাসি। অর্থসূচকভাবে ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল : চলো দাদা, ভেবে দেখি। তোমরা ভয়ানক সীরিয়াস্ মানুষ—'স্বদেশী'। তোমাকে তো বাজে কথা বলা যায় না।

সবিতা ফটকে দাঁড়াইল। অমিত নমস্কার করিয়া বলিল : চলি।

সবিতা প্রতি-নমস্কার করিল। একটু পরে বলিল : কাল আসছেন তো? বাবা বলছিলেন না?

অমিত কথা দিতে পারে না। এখনো অন্য কাহারও সহিত দেখা করা হয় নাই।

মন্টু বলিল : তুমিই কাল এসো না, সবিতাদি।

আমি!—বিস্ময় কাটিয়া হিসাব আরম্ভ হইল মনে মনে।—সম্ভব হবে কি? কখন?

মন্টু বলিল : যখন পার। দুপুরে? দাদার সঙ্গে আমাদেরও কিছু কথা হয় নি। তুমিও তা হলে কাল দুপুরে এসো। না-ই বা পড়লে কাল দুপুরে অশ্বঘোষের অশ্বডিম্ব।

সবিতা বলিল : তোমার ইন্‌সিওরেন্স-দালালের অশ্বমেধ আর অশ্ব-শিকারের কাহিনীও কিন্তু তুমি বলতে পারবে না।

হাসিল দুই জনেতে। একটু কথা কাটাকাটি করিল। অমিত সস্মিত মুখে সচেতন চক্ষে দাঁড়াইয়া তাহা উপভোগ করিতে লাগিল, উপলব্ধিও করিতে চাহিল। অমিতের সম্মুখেই সবিতার কুণ্ঠা ভয়ে-ভক্তিতে; না হইলে সবিতাও কৌতুক করিতে পারে, স্বচ্ছন্দ হইতে পারে, কৌতুক করে স্বচ্ছন্দ হয়।

সবিতা অবশ্য স্বীকার করিল না, কিন্তু বুঝা গেল কাল দুপুরে সে নিশ্চয়ই আসিবে।

অমিত ও মন্টু পাশাপাশি ফুটপাতে চলিল। এ দিকের ফুটপাত হইতে মন্টু বালিগঞ্জের বাস ধরিবে; ওদিকের ফুটপাত হইতে অমিত বাস ধরিয়া বাড়ি যাইতে পারিবে তো? চলিতে চলিতে মন্টু আর পারিল না, আরম্ভ করিল :

মজার ব্যাপার, দাদা, শুনবে? বাদল থাকলে ভালো হত। কিন্তু সবিতাকে বোলো না। তুমি বললে বেচারীর আর লজ্জার সীমা থাকবে না। তোমরা উপরে গল্প করছিলে, বাদলকে বাইরে পাঠিয়েছেন সবিতাদি কি কাজে। আমাকে বললেন ডাক্তার দেবকে ঠেকাতে।

ঠেকাতে?—

হাঁ, তাই। শোনো মজাটা।

মজাটা দাদাকে না বলিলে মন্টুর চলে না—যতই সবিতা নিষেধ করুক।

'ডক্টর দেভ্, বৎসর দেড়েক পূর্বে কলিকাতা আসিয়াছেন। এই পাড়াতেই বাড়ি ভাড়া করিয়াছেন। বয়স বেশি নয়। পঁয়তাল্লিশ ছাড়াইতেছেন, কিন্তু মনে করেন পঁয়ত্রিশ ছাড়ান নাই। অন্তত ছাড়ানো যায় না—যখন বৎসর দুই পূর্বে তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। দুটি ছেলে তাহাদের মাতামহীর কাছে আছে, শ্যামবাজারে, বৎসর দশ-বারো তাহাদের বয়স,—পনেরও হইতে পারে। সেণ্টজেভিয়ার্সে পড়ে। ব্রজেন্দ্র রায়ের সঙ্গে পুত্রের বন্ধু হিসাবে, আর দাদার বন্ধু হিসাবে সবিতার সঙ্গে, ডাক্তার দেব মাঝে মাঝে,—অর্থাৎ প্রায়ই, দেখা করিতে আসেন। মিস্টার রায় প্রাচীন হইতেছেন; সবিতা একা তাঁহাকে দেখে; এইরূপ স্থলে ডাক্তার হিসাবেও ডাক্তার দেবের কর্তব্য ব্রজেন্দ্র রায়েব খোঁজ-খবর করা। অন্যেরা অবশ্য আরও বেশি জানে, সবিতাও বোঝে। বোঝে বলিয়াই সবিতা আপনার গাম্ভীর্য, আপনার দূরত্ব আরও একটু বেশি করিয়াই ঘোষণা করে। কিন্তু ডাক্তার দেবকে কর্তব্য পালন করিতে আসিতেই হয়। আজও ডাক্তার দেব সেই কর্তব্যবশেই আসিয়াছিলেন। এদিকে বাদল বাড়ি নাই; সবিতাও অতিথিদের চায়ের আয়োজনে ব্যস্ত। পিতার সহিত অমিতের আলাপে আজ অন্য কেহ বাধা দেয়, তাহাও সবিতা সহ্য করিবে না। অগত্যা মন্টুর উপরই বসিবার ঘরে ডাক্তার দেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলিবার ভার পড়িল। সবিতারই এই ব্যবস্থা। পরের বাড়িতে মন্টু কি করিয়া ডাক্তার দেবের আপ্যায়নের ভার গ্রহণ করে? সবিতা কিন্তু এই আপত্তি শুনিবে না। বলিল—আমি ডাক্তার দেবকে বলে আসছি—মন্টুকে নিচে লইয়া গেল।

এক কথাতেই সবিতা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। ডাক্তার দেব বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তৎক্ষণাৎ বলিলেন: নিশ্চয়, নিশ্চয়, সবিতা! আমি বসছি। না, না, মিস্টার রায় তাঁর বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করুন—ডোন্‌ট ডিস্টার্ব দি ওল্ড ম্যান। তাঁকে বিরক্ত করো না। হি রিকোয়ারস রেস্ট—এ্যাট্ হিজ্ এজ, ইউ নো। মনুকে রাখিয়া সবিতা মৃদু হাসিয়া পালাইল।

মনু ডাক্তার দেবের একেবারে অপরিচিত নয়—সবিতার সহপাঠী সেই 'ছোঁড়াটা'। এই বাড়িতে মনুকে আরও তিনি দেখিয়াছেন। কি করে ছোঁড়াটা এখন? ডাক্তার দেব মনুর সহিত আলাপ শুরু করিলেন।

মনু জানাইল: ইন্‌শিওরেন্সের দালালি।

ইন্‌শিওরেন্সের দালালি! - ডাক্তার দেবের কেমন অবজ্ঞা-মিশ্রিত ঔদাসীন্য জন্মিল। শেয়ার মার্কেটের দালাল হইলেও বা আগ্রহ জন্মিত, শ্রদ্ধা জন্মিত, বার্মা কর্পোরেশনের অবস্থাটা খোঁজ করা যাইত। কিন্তু ইন্‌শিওরেন্সের দালালি! অর্থাৎ ছোঁড়াটা আসলে 'লোফার'। আগেই তিনি তাহা বুঝিয়াছিলেন। এই বাড়িতে জুটিয়াছে।—হুঁ, ভালো কথা নয়। তবে ভয়ের কারণও নাই।

ডাক্তার দেব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, মনু কি কাজকর্ম করে; কোন্ কোম্পানির কি হাল; মার্কেটের 'ভাও' কিরূপ। মনুও সকৌতুকে দেখিতে লাগিল—কোঁকড়ানো কালো চুল সত্ত্বেও ডাক্তার দেবের মাথার পিছন দিকটায় একটা কলপহীন ধূসরতা রহিয়া গিয়াছে, অপরাহ্ণের শেষ আলো ঠিক সেই-খানটাতেই যেন চক্রান্ত করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। কালো দোহারা চেহারায় সযত্নে আঁটা স্যুট, তাহার বটন হোলে সযত্নে একটি ফুল গোঁজা; স্তিমিত চক্ষে মনুর প্রতি অবজ্ঞা, কালো ঠোঁটে তাচ্ছিল্য—পায়ের উপর পা দোলাইতেছেন ডাক্তার দেব। রূপ-যৌবনে না হউক, পরিচ্ছদে, অর্থগৌরবে, যথেষ্ট আত্ম-বিশ্বাসবান মানুষ 'ডক্টর ডেভ্'। হয়তো উপরের ছাদের অমিতের কণ্ঠও তাঁহার কানে যাইতেছিল। তাই খানিক পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, মিস্টার রায়ের নিকট কে আসিয়াছেন?

মনু জানাইল: দাদা।

তোমার দাদা? মিস্টার রায়ের বন্ধুরা কেউ নন? সবিতা যে বললে 'বাবার একজন বন্ধু এসেছেন অনেক দিন পরে।' কত বয়স তোমার দাদার? বয়স্ক লোক বুঝি? মিস্টার রায়ের বন্ধু তিনি? কি করেন তোমার দাদা?

এখনো কিছু না।

কেন?

আজই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন তো।

'জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে'—চমকিয়া সিধা হইয়া বসিলেন 'ডক্টর ডেভ' গদি-মোড়া আরাম-আসনে। মন্নুর চোখে পড়িল তাহার ব্যস্ততা ও উদ্বেগ। মন্নু মজা পাইল। ডাক্তার দেব আগ্রহে উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর সে নিস্পৃহ ভাবে উত্তর দিতে লাগিল।

ডাক্তার দেব বলিলেন: জেলে ছিল।—তার মানে? কি করেছিল? ডেটিন্যু ছিল?—কি তার নাম?

উদ্বেগ ও ত্রাস এক সঙ্গে ডাক্তার দেবের চক্ষে ফুটিল ··তার মানে যার কথা এরা এই বাড়িতে বলে সেই 'অমিত'?

এরা বলেন নাকি? তা হবে।—মন্নু উত্তর দেয়, যেন কিছুই জানে না।

হুঁ।—একবার পিছনে হেলান দিয়া বসিলেন ডাক্তার দেব। গম্ভীর হইলেন। খানিক পরে বলিলেন: তোমার দাদা, বললে না?

আজ্ঞে।

কত বয়স বললে যেন?

ইতিপূর্বে মন্নু বয়সের প্রশ্নটার উত্তর দেয় নাই। এবার বলিল—অমিতের বয়স নয়, ডাক্তার দেবের কামনানুযায়ী অমিতের বয়স।

তা, পঞ্চাশ হবে বোধ হয়।

এ বয়সে তোমার দাদার এ ছেলেমানুষি কেন? ছেলে-পিলে—সে কি, বিয়ে করেন নি! কেন, বিয়ে করেন নি কেন?

·· রায় সাহেব অম্বিকাচরণ সরকারের প্রশ্ন।

ডাক্তার দেব মন্নুকেও ছাড়িলেন না: তুমিও বিয়ে করো নি—না?

উত্তর পাইয়া আবার বলিলেন : তোমারও থানা-পুলিশ আছে নাকি ?

কিছু তো থাকতেই পারে দাদার পরিচয়ে।

কেন ?

তাই থাকে যে। ওঁদের সঙ্গে যাদের একটুমাত্র চেনাশুনা তাদেরও পুলিশ বাদ দেয় না ; আমি তো ভাই।

'ডক্টর ডেভ্' টান হইয়া উঠিয়া বসিলেন : চেনাশুনা থাকলেই পুলিশ পিছনে লাগে ?

লাগবে না ?

এখনো লাগছে ?

নিশ্চয়ই। সেই সকাল থেকেই-তো আজ বাড়ির কাছে স্পাই ঘুরছে। তাতেই তো আমরা বুঝলাম—দাদা আসবেন।

স্পাই ঘুরছে! কোথায় ?

যেখানে দাদা যাবেন—সেখানে।

একেবারে পাংশু হইয়া গেল ডাক্তার দেবের মুখ—আর সেই 'ডক্টর ডেভ্' নাই।

এখানেও এসেছে ?

আসবার কথা।—নির্বিকার ভাবে মন্টু জানাইল।

ডাক্তার দেব দেয়ালের এদিকে ওদিকে তাকাইতে লাগিলেন। কি বলিবেন, তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে চা আসিল। আসিল বাদলও।

চা ? এখন ?—না ; আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে আজ।

বাদল বলিল : চা-টা খেয়ে নিন। দাদুর সঙ্গে দেখা করে যাবেন।

নিজের চা আনিবার নামে মন্টু একবার ছুটিয়া সবিতাকে গল্পটা বলিয়া আসিতে গেল।

ডাক্তার দেব চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া দাঁড়াইলেন। মুখ রাস্তার দিকে—কি যেন খুঁজিয়া দেখিতেছেন।

বাদল বলিল : গাড়ি দেখছেন ? চাবি দিয়েছেন তো ?

খাচ্ছি? না, খাচ্ছি না। কিন্তু ও লোকটা দাঁড়িয়ে কেন?

তার ঠিক কি?

ডাক্তার দেব বিরক্ত হইলেন: তোমরা কিছু বোঝো না, বাদল। আচ্ছা, ছাখো তো,—ছাখো তো,—কি নাম সেই ছোঁড়াটার?—কোথায় গেল?—

মনু কাকা?—মনুয়া! ডেকে দিচ্ছি।

মনু আসিয়া গিয়াছিল। বসিয়া পড়িল। ডাক্তার দেব বলিলেন: হাঁ, মনু,—তুমি ছাখো তো—ওই লোকটা, ওই যে দাঁড়িয়ে—দেখছো? কি করছে বলো তো?

মনু বসিয়া বসিয়াই দেখিল, একবার বাদলের সঙ্গে চোখাচোখি করিল; বলিল: হাঁ, হবেও বা স্পাই।

হবেও বা?—তুমি দেখতে পেয়েছ? ছাখো নি। না, না, উঠে এসো। এখান থেকে ছাখো—দেখছো?

মনুর উঠিয়া গিয়া তাকাইতে হইল। তারপর সে বলিল:

হুঁ—লোকটাকে ভালো মনে হচ্ছে না।

চায়ের পেয়ালা লইয়া মনু আবার আসনে বসিল। বাদল ততক্ষণ ব্যাপার বুঝিয়া লইয়াছে। সে এবার পুরাপুরি তামাসা উপভোগ করিতে লাগিল। বলিল: চা জুড়িয়ে যাচ্ছে, ডক্টর ডেভ্।

এ্যাঁ। চা? হাঁ—ফিরিয়া আসনে বসিলেন ডাক্তার দেব। চায়ের পেয়ালা ঠোঁটে তুলিলেন। তাঁহার দৃষ্টি বিভ্রান্ত।

বাদল বলিল: ওটা দেখুন—মাছের চপ্। এইমাত্র ছোট পিসি ভাজলেন।

ওঃ, চপ। বেশ, চমৎকার হয়েছে।—তোমার দাদা যেখানে যাবে, মনু, সেখানেই ও লোকটা যাবে?

মনু জানাইল: শুধু ও লোকটা কেন? লোক বদল হয়। আবার যেই দাদা এ বাড়ি থেকে চলে যাবেন, তখন অন্যলোক হয়তো স্পাইং করবে—এ বাড়িতে অন্য কে কে আসে-যায় দেখবে। আবার, ফিরে তাদেরও উপর স্পাই বসাবে।

গড্! আমাদেরও দেখবে?

আপনাদের ব্যাপারে তো অসুবিধা বেশি নেই। গাড়ির নম্বর নেবে, স্পাইদের রিপোর্ট মেলাবে। তারপর গবর্নমেণ্ট আপনাদের ডিপার্টমেণ্টে ইন্‌কোয়ারি করবে—

বলো কি?—আপিসেও ইন্‌কোয়ারি হবে?

তা আর হবে না? তবে আপনি তা জানতেও পারবেন না। তেমন খারাপ কিছু হলে অবশ্য চাকরি নিয়ে গোলমাল হবে। তখন তো জানবেনই।

বলো কি?—ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেলেন ডাক্তার দেব। একটু পরে সাহস সঞ্চয় করিতে চাহিলেন: তা অত সহজ নয়,—গবর্নমেণ্ট সার্বিসে গোলমাল করা।

গবর্নমেণ্ট সার্বিস বলেই তো সহজ।

শেষ ভরসাও নিবিয়া গেল। ডাক্তার দেব আবার দাঁড়াইয়া উঠিলেন, কি দেখিতে চাহিলেন। বলিলেন: এখন তো নেই। ছাখো তো, সে লোকটাকে দেখতে পাচ্ছ কি?

বাদল বলিল: এদিকে সেদিকে ঘুরছে হয়তো।

মন্থু বলিল: তা ছাড়া লোকটা স্পাই নাও হতে পারে। স্পাইরা তো গা ঢাকা দিয়ে চলে,—কে স্পাই আপনি জানতে পারবেন না, চিনতেও পারবেন না।

ডাক্তার দেব বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার অসহায় বিভ্রান্ত দৃষ্টি একবার মন্থুর একবার বাদলের দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বাদল বলিল: চা জুড়িয়ে গিয়েছে? আর এক কাপ নিয়ে আসছি।

না। ডাক্তার দেব তাড়াতাড়ি আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আর তো তিনি দেরি করিতে পারেন না। একটা জরুরী কেস্ আছে। আচ্ছা। নিশ্চয়ই মিস্টার রায় ভালোই আছেন। আর একদিন ডাক্তার দেব তাঁহাকে দেখিবেন—

পিসিমা আসবেন এখনি, কাকাবাবু।

আসবেন?—একটু থামিলেন ডাক্তার দেব।—থাক, হয়তো কাজ করছে, দেরি হবে। আমার তাড়া আছে আজ—

কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে, আমি তাঁকে ডেকে দিচ্ছি—বাদল ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ডাক্তার দেব বিপন্ন বোধ করিতে লাগিলেন,—দেরি হয়ে যাবে···থাকতো না হয় আজ।—টুপি হাতে লইয়া তিনি দাঁড়াইলেন। কিন্তু সবিতার সঙ্গে দেখা না করিয়া যাওয়াটা কি ঠিক?

সবিতা নামিয়া আসিল। বলিল: আর বসবেন না?

না। বড় তাড়া আছে—জরুরী একটা কেস্। তা, ভালোই তো আছেন মিস্টার রায়? বেশ, আর একদিন দেখবখন। আজ চলি তবে? না, না, আজ আর উপরে যাব না ··

বিদায় লইতে গিয়া আজ আর দেরি হইল না ডাক্তার দেবের। বাদল তাহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেল—নিচেকার ঘরে মন্নু ও সবিতা তখন হাসি চাপিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছেন। আবার জানালা দিয়া গোপনে গোপনে দেখিতেছে ডাক্তার দেবের কাণ্ড। ডাক্তার দেব গাড়ির দিকে ভয়ে ভয়ে পা বাড়াইতেছেন—এদিকে-ওদিক তাকাইতেছেন। তারপর গাড়ির সামনে গিয়া তাহার আড়ালে দাঁড়াইলেন, হাঁফ ছাড়িয়া একবার চারিদিকে তাকাইলেন, বাদলকে আবার বলিলেন:

ও লোকটাকে দেখছ—সন্দেহজনক মনে হয় না?

বাদল চিন্তিত ভাবেই বলিল: হাঁ, কেমন একটু ঠেকছে।

ডাক্তার দেব তাড়াতাড়ি গাড়ি খুলিয়া গাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া বসিলেন—আর তাঁহাকে লোকটা দেখিতে পাইবে না। একবার তাড়াতাড়ি গাড়ি ছাড়িয়া দিতে পারিলেই হয়। স্টার্ট দিতে দিতে তিনি বাদলকে বলিলেন:

তোমাদেরও কিন্তু সাবধান হওয়া দরকার। আর, এইসব লোকের সঙ্গে অত খাতিরে কাজ কি? বাড়িতে ডাকতে হবে, গল্প করতে হবে—কেন?

ছোট পিসি তা শুনবেন না। দাদুও শুনবেন না।

শোনা দরকার। তুমি বলো,—আমার নাম করেই বলো—

গাড়ি স্টার্ট লইয়াছে, একবার মুখ বাড়াইয়া ডাক্তার দেব এদিকে সেদিকে দেখিলেন,—বলিলেন, কোথাও কেউ আছে নাকি ছাখো তো?

দেখা যায় না। গা-ঢাকা দিয়ে আছে হয়তো।

গাড়ি অকস্মাৎ লাফাইয়া ছুটিল।

কিন্তু বাদলের হাসি আর থামে না। হাসি কি সবিতারই কম পাইয়াছিল? কিন্তু করে কি? অমিতের সম্মুখে কোনোরূপ চাপল্য প্রকাশ পাইলে যে ভয়ানক অন্যায় হইবে। বারে বারে তাই সে মনুকে বাদলকে শাসন করিতেছিল।

··সেই পৃথিবী তেমনি আছে, অমিত,—ওখানেও এখানেও। আছে যেমন খাঁ সাহেব ফতে মহম্মদ্ তেমনি আছে 'ডক্টর ভি-ভি ডেভ্'।···

মনু বলিল: দেখলে তুমি আসতে তাই সবিতাদি কেমন আরও ভয় পেয়ে গেলেন পাছে তুমি এসব বাজে কথায় রাগ করো।

কেন, আমি কী?

ওর ধারণা—তুমি কী নও! বেয়াদবি হয়ে যাবে তোমার সামনে হাসলেও। ···আমি এখান থেকে বাস ধরি তবে। তুমি ওপার থেকে বাস নিয়ো,—চলি।

মনু বাস ধরিল। অমিত একটু দাঁড়াইয়া দেখিল—কেমন সহজ গতিতে মনু চলিয়া গেল। আর কেমন সরস এখনো রঙ্গ পরিহাসে সে। মনুর কৌতুক-বোধ আছে, হয়তো সবিতারও তাহা আছে। অন্তত মনুর মতো বন্ধু-সাহচর্যে সবিতাও একেবারে আত্মগোপন করিতে পারে না। কিন্তু অমিত? · অনেক বড় সে সবিতার চক্ষে, অনেক উঁচু সে; অনেক মহৎ আদর্শের আসনে সে অধিষ্ঠিত। সেখানে সবিতার হাসিবার সাধ্য নাই। সাধ্য কি সে সেখানে স্বচ্ছন্দে চলে, স্বচ্ছন্দে কথা বলে,—স্বচ্ছন্দে বাঁচে? তবু মনুর সাহচর্যে তাহারও হাসি বারে বারে ঝলকিয়া উঠে,—বাঁচিবার তাগিদেই সে বাঁচিয়া উঠিতে পারে,—এ গৃহে, ও গৃহে, হয়তো কলেজে, লাইব্রেরিতে, সর্বত্র। মনুজ বুঝি ওর জীবন-মুখিতার অবশিষ্ট আশ্রয়।···

রাস্তা পার হইয়া অমিত ওপারের বাস স্টপের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

'অমিত'!

অমিত চমকিয়া উঠিল—কাহার কণ্ঠ!

'অমিত!'

অমিত, তোমার নিয়তি কি তোমার সম্মুখে!

পথচারী

১

'অমিত !'

নিয়তি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল : ইন্দ্রাণী !

ইন্দ্রাণীই। আর কেহ নয়, আর কেহ হইতে পারে না, আর কেহ হইতে পারিত না। এই ছয় বৎসরের সমস্ত সচেতন চিন্তা, সুপরিজ্ঞাত আবেগ-কল্পনা, স্বপ্ন-সাধনা—মানস-লোকের আলো-ছায়া বিচিত্রিত মায়া-মধুর রঙ্গমঞ্চের সমস্ত সেই পটাবরণ—সব বিদীর্ণ করিয়া, প্রেক্ষাগৃহের নির্বাসিত অবলুপ্ত কোণ হইতে,—নটনটী প্রহরী কথাকার সকলের সমস্ত সযত্ন পরিকল্পনা এক নিমেষে উলটাইয়া দিয়া,—এমন করিয়া কে আবির্ভূত হইতে পারিত আর নিয়তি ছাড়া ? অমিতের জীবনের কে আর এইরূপে আবির্ভূত হইতে পারিত ইন্দ্রাণী ভিন্ন ?

শ্যামশষ্পাচ্ছাদিতা সুপরিচিতা পৃথিবী পায়ের তলা হইতে ঘোষণা করিল—জীবনের বহ্নিমান, কম্পমান, ঘূর্ণ্যমান আন্তর্দাহে ভূগর্ভ ফাটিয়া যাইতেছে। চোখের সম্মুখে সেই অগ্নিগর্ভা ধরণীর কণ্ঠস্বর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে : 'অমিত !'

'ইন্দ্রাণী !'—'ইন্দ্রাণী বউদি নয়, 'ইন্দ্রা' বউদি নয়, শুধু ইন্দ্রাণী।' অমিতের চক্ষু হইতে, মুখ হইতে পৃথিবীর অনন্ত বিস্ময়, অনন্ত সুখ ও অনন্ত ভীতি ঝরিয়া পড়িল—স্বতস্ফূর্ত এই শব্দটিতে। আজ অমিত নিয়তির মুখমুখি দাঁড়াইয়াছে। সাধ্য কি নিজেকে আর জানে ? সাধ্য কি না জানিয়া পারে নিজেকে ? মন্ত্রচালিতের মতোই অমিত হাত বাড়াইয়া দিল, আর বলিল, 'ইন্দ্রাণী !'

অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত বাহু যেন অগ্রসর হইয়াই ছিল। দীর্ঘ সুকোমল করাঙ্গুলি অমিতের শীর্ণ কঠিন হাতকে একমুহূর্তে নিজের করমধ্যে সাগ্রহে গ্রহণ করিল···

কে বলে সত্য স্থির অনির্বাণ জ্যোতির্লেখা? অমিত বুঝিতেছে সত্য একটা তীব্র অপূর্ব শিহরণ—বাহুতে, বক্ষে, দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, মস্তিকের প্রকোষ্টে, চৈতন্যের তটে তটে, আত্মার শিখরে শিখরে বিদ্যুৎচ্ছটা।

তোমার আশায় দাঁড়িয়ে আছি, অমিত—

'তোমার আশায়'।—'প্রত্যাশায় আর প্রতীক্ষায়' নয়, শুধু 'আশায়।' এই কলিকাতা শহরে সন্ধ্যার পথ-প্রদীপের ছায়ায়, 'বাস্‌ স্টপের' তলায়, বাসযাত্রী ও পথচারীর ভিড়ের মধ্যে এমন একটা সামান্য কথায় এতখানি অসামান্যতা আছে—অমিত কি তাহা জানিত? ··

অমিত তখনো শুনিতেছে: তুমি আসোই না আর, অমিত।

কোনো প্রতীক্ষার মধ্যে কি এমন সত্য থাকে? প্রত্যাশার মধ্যে থাকে এমন আশা-নিরাশার কলস্বর?

অমিত বলিল—স্থির কণ্ঠে বলিতে পারিল না, তাই কৌতুকের কণ্ঠেই বলিল। আর যাহা বলিতে চাহিত না তাহাই বলিয়া ফেলিল: যেখানেই বাঘের ভয় সেখানেই বাত্রি হয়।

অমিত ইহা ইন্দ্রাণীকে বলে নাই, বলিত না। কিন্তু এ তো ইন্দ্রাণী নয়, এ যে তাহার নিয়তি। ছয় বৎসর দেহ-মন চেতনার প্রচেষ্টায় যে নিয়তিকে অমিত জানিত সে পরাস্ত করিয়াছে, অবলুপ্ত করিয়াছে, যাহার সক্রিয় অস্তিত্ব আর তাহার জীবনে নাই বলিয়াই সে জানিত,—সেই নিয়তি।

ইন্দ্রাণী চমকিত হইল, হয়তো আহতও হইল। বলিল: বাঘ আমি অমিত?—তুমি তাই পালিয়ে বেড়াচ্ছ বুঝি?

·· ···When me they fly, I am the wings'···কাহার নিকট হইতে পালাইতেছ, অমিত, তোমার নিজের নিকট হইতে ছাড়া? সাধ্য কি, অমিত, সাধ্য কি নিজের নিকট হইতে পালাইবে?

কৌতুকের কণ্ঠে অমিত বলিল: বাঘ তুমি, না, আমি?···কিন্তু তুমি এখানে, কলকাতায়?

কেন, তাও জানতে না?—প্রশ্ন ও একটা গভীর অব্যক্ত অভিমান ইন্দ্রাণীর চক্ষে।

কি করে জানব ?—অমিতের কণ্ঠে সহজ নিরুপায়তার স্বীকৃতি। ইন্দ্রাণীও তাহা সহজেই মানিয়া লইল। বলিল : চলো।

কোথায় ?—ইন্দ্রাণী পা বাড়াইতেছে, অমিতও সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়াইল।

জানার দরকার আছে ?

নেই ?—অমিত চলিতে লাগিল।

আমার তো দরকার হয় নি তোমার সঙ্গে চলতে। তোমার দরকার হল ?

হবে না ? রাত্রি নটার পূর্বে বাড়ি না পৌছলে আমার জন্ম ভারতেশ্বরের রাত্রিতে ঘুম হবে না।

তা জানি। আমার মনে আছে।

কি করে জানলে ?

বাড়িতে শুনলাম সব।

আমাদের বাড়ি গেছলে না কি তুমি ? কখন ?—আগ্রহ অমিতের স্বরে।—কেন ?

ইন্দ্রাণী হাসিল। বলিল : কেন ? আমার দায় বলে। নইলে তুমি ছাড়া পেয়েছ, সে খবর পেতে আমার বিকাল চারটা। আর পেতে হল অন্যের মুখে।

কার থেকে পেলে—আশ্চর্য ! আমি জানি তুমি এখানে নেই।

পৃথিবীতে আছি বলেই কি আশ্চর্য হচ্ছ না ?

না। সে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু তুমি আমার খবর পেলে কার থেকে ?

বেশ, শুনবে এসো।

কিন্তু যাচ্ছি কোথায় ?

পি ৩৭।২।২ জি, লেক নিউ ভিয়্যু।—একটু রঙ্গ করিয়া সংখ্যাগুলি বলিল ইন্দ্রাণী।

অমিতও হাসিয়া বলিল, মোটে জি' ? হিজি-বিজি নয় ? কিংবা একস্ বাই ওয়াই বাই জেড ? ··

গেলেই তা দেখবে। বরং ততক্ষণ পথ দেখে চলো। পালিয়ে আসতে হলে যেন পথ চিনে পালিয়ে আসতে পার।

ভস্মদিন-

পথ হারাবারই কথা। এ কোন পাড়া কলকাতার।—অমিত সত্যই বুঝিতে পারিতেছে না।

চিন্‌তে পারছ না? যেখানে তোমাদের বড়লোকেরা তখন জমি কিনছিলেন, এখন সস্তার দিন বাড়ি করছেন।

কিছুই চিনিবার উপায় নাই। একদিন এই অঞ্চলে অমিতও ঘুরিয়াছে, নানা কারণে আসিয়াছে। ছিল ডোবা, ছিল নারিকেল বাগান, ঝোপ ঝাড়, এঁ্যাদো স্যাঁতসেঁতে নিচু জমি, মাঝে মাঝে হোগলা পাতার ঘর,—তখনো এখানে দরিদ্র পরিবার ও নিম্ন-বিত্ত বাঙালীরা ছেলেমেয়ে পরিবার পরিজন লইয়া বাস করিত। রাসবিহারী এভিন্যুর বাহু বিস্তারে ও লেক্ রোডের সর্পিল প্রসারে তখনি তাহারা অস্বস্তিবোধ করিতেছিল। আজ তাহারা নাই, সেই বাড়িঘরের চিহ্নও নাই। একটা আনকোরা নতুন শহর, নতুন পালিশ, নতুন ঐশ্বর্য ও নতুন শ্রীহীনতা অমিতের চোখকে একই কালে কৌতূহলে শাণিত ও চিন্তায় উন্মনা করিয়া তুলিল। কুঁড়ে ভাঙিয়া প্রাসাদ মাথা তুলিতেই 'ট্যারেসের', 'প্লেসের' পার্শ্বে পুরাণের 'মহর্ষিরা' ও নবাবিষ্কৃত 'সর্দার-সেনাপতিরা' পুনর্জীবন লাভ করিয়াছেন। জাতীয়তা ও ইতরতা একই সঙ্গে জাঁকিয়া বসিতেছে,—যেমন জাগে বুর্জোয়ার জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গে। ইহাও অমিতের পক্ষে জানা কথা। কিন্তু কদিনকার সযত্ন সঞ্চিত স্বপ্ন অন্য দিন যখন ধূলিসাৎ হয়, তখন তাহার বাস্তব আঘাতে মন চমকিত হয়—যাহা সত্য তাহা কি এমনি স্থূলভাবেই সত্য হইল? নিয়তির এই দুর্নিবার্য ব্যবস্থা হইতে অমিত কোথায় পালাইবে? পালাইয়া কাহাকে সে ফাঁকি দিবে? ··When me they fly, I am the wings···

এসো—চলিতে চলিতে একটি নতুন বাড়ির আঙিনায় পা দিয়া ইন্দ্রাণী ডাকিল।

এই সেই '৩২।২।২জি?' অমিত আপনাকে গুছাইয়া লইতে চায়।

নম্বর মিলিয়ে ছাখো—বিশ্বাস না হলে।

মেনেই নিলাম।

দোতলা, তেতলা,—আরও? না, আর নয়। ইন্দ্রাণী দুয়ারে করাঘাত করিল। বলিল: নাম লেখা দেখছ। এই আমার 'ফ্ল্যাট'।

ফ্ল্যাট!—এক মুহূর্তে অমিত যেন ভাবিবার মতো একটা কথা পাইল। ফ্ল্যাট। তাহা হইলে বাঙালীর জীবনে নতুন হাওয়া লাগিয়াছে। আগেই লাগিয়াছিল। আর 'বাড়ি' থাকিবে না, থাকিবে ফ্ল্যাট, হোটেল। অর্থাৎ 'বারোয়ারিতলা';—তখন দুঃখ করিয়া অমিতের পিতা ও ব্রজেন্দ্রবাবু বলিতেন! এখন তাহা বলিবে হয়তো সবিতা। কিন্তু ইন্দ্রাণী? ইতিমধ্যেই সে করিয়াছে গ্রহণ এই নতুন সত্যকে; হয়তো অভিনন্দনই করিয়াছে। ইন্দ্রাণী নতুনকে চায়, গ্রহণ করে। মনের বলে দুর্বার শক্তিতে গ্রহণ করে সে নতুনকে।···দুয়ারে আঘাত করিতে হইল—কলিং বেল নাই কলিকাতার ফ্ল্যাটে। হয়তো গ্যাসও থাকিবে না।—সেই পঞ্চাশটি পরিবারের পঞ্চাশবারে ধরানো পঞ্চাশটি কয়লার উনুন সকাল হইতে রাত্রি দুপুর পর্যন্ত প্রত্যেক বাসিন্দাকে বারে বারে অতিষ্ঠ করিবে। না, 'বারোয়ারীতলার' পুরাতন কর্তব্যবোধও এক্ষেত্রে আর পাওয়া যাইবে না। পরস্পরের পরিত্যক্ত আবর্জনায় এখানে ইহারা পরস্পরকে মারিবে। কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েডের বারোয়ারিতলা হইয়া উঠিবে এই বাড়িগুলি।···অমিত আপনাকে আত্মস্থ করিয়া লইতে লাগিল—এই বেতালা প্ল্যানহীন বিশৃঙ্খল জীবনযাত্রার ইহাই নিয়ম, ইহাই দণ্ড। ইহাই কলিকাতার নিয়তি।···

দ্বার খুলিতেই কাঠের-পার্টিশানে ঘেরা ছোট একটি ঘরে ইন্দ্রাণী দাঁড়াইল। বাহিরের লোকের বসিবার ঘর হয়তো। ছোট একটি টেবিল, খানকয় কেদারা রহিয়াছে, আর কিছু ছবির বই, সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র। পার্শ্বের ঘষা কাঁচের দুয়ারের হাতল ঘুরাইয়া ইন্দ্রাণী বলিল: এসো।

অমিত দেখিল, সামনে ছাদে-ঢাকা ছোট আঙিনা। সেখানকার টেবিল-চেয়ারে একটি এগারো-বারো বৎসরের ছেলেকে মাস্টার পড়াইতেছেন বুঝি।

'মা'—ছেলেটি ছুটিয়া আসিল। দুই হাতে ইন্দ্রাণীকে জড়াইয়া ধরিল।

এতক্ষণেও আসছ না—অভিমান অভিযোগ বালকের কণ্ঠে মায়ের বিরুদ্ধে।

ইন্দ্রাণী কপোল চুম্বন করিল! বলিল: দ্যাখো, কাকে নিয়ে এসেছি। বলো তো কে?

ছেলেটি একটু দূরে দাঁড়াইয়া অমিতকে ভালো করিয়া দেখিতে লাগিল। পরে ইন্দ্রাণীর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল, বলিল, বলব ?

আশ্চর্য সুন্দর মুখ! যে কোনো শিশুর, যে কোনো বালকের মুখই অমিত আজ তৃষিত নেত্রে না দেখিয়া পারে না। আজ কতদিন এত কাছে এমন করিয়া কোনো বালকের মুখ সে দেখে নাই। তাহার দুই চোখে আপনা হইতেই মাধুর্য জমিয়া উঠিতেছে—এই ইন্দ্রাণীর সেই শিশুপুত্র।

ইন্দ্রাণী বলিল: বলো তো কে ?

নিম্নস্বরে ছেলেটি বলিল: জেল থেকে এলেন না ?—বলিয়া অনভ্যস্ত হস্তে অমিতকে প্রণাম করিল। অমিত বারণ করিতে পারে নাই, কিন্তু দুই হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া তাহার ললাট চুম্বন করিল। এক নিমেষের মধ্যে অমিতের মনে হইল, সে পাইয়াছে—একটা সুদৃঢ় আশ্রয় ইন্দ্রাণী পাইয়াছে। পৃথিবীতে তাহার পা আর পিছলাইয়া যাইবে না, ভূমিকম্পে ধসিয়া যাইবে না তাহার জীবন, অমিতকে আর গ্রাস করিবে না নিয়তি।...

নিয়তি, অলঙ্ঘ্য নিয়তি, আপনার নিয়মে তুমিও আবদ্ধ!

চিনলে ?—প্রশ্ন করিল ইন্দ্রাণী।

অমিত বলিল: চেনাই অসম্ভব।

ইন্দ্রাণী বুঝিল। ছেলেকে বলিল, আরও একটু পড়োগে, মানু। তারপর ছুটি। এখনই চলে যেতে হবে কিনা অমিতের।

একপ্রান্তে একটি ঘরের দিকে চলিল ইন্দ্রাণী—একখানি ঘর ছাড়াইয়া। প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, কি নাম রেখেছি ওর, জানো ?—নিজেই সগর্বে বলিল, মানব।

অমিত বুঝিল, কিন্তু সকৌতুকে বলিল: নামের কিন্তু অর্থ থাকে না।

থাকে—যে রাখে তার কাছে। আর তাই নিজের কাছে। বিশ্বাস না করলে জিজ্ঞাসা করো অমিতকে।—সুন্দর কটাক্ষে পিছনে তাকাইয়া ইন্দ্রাণী বলিল।

নামের অর্থ তো দূরের কথা, নিজেরই কোনো অর্থ সে পায় না।—দুষ্টু হাসি হাসিয়া অমিত বলে।

পায়। পায় বলেই সে 'অমিত'—এবং 'অমিতাভ'। তাই সে 'মিতা' নয়—রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রণাসত্ত্বেও।—ইন্দ্রাণীর কণ্ঠে এবার প্রচ্ছন্ন বিবাদের সুর।

সে শুধুই 'অমি'। কবির প্ররোচনা সত্ত্বেও কেউ তাকে বলবে না 'মিতা'।—অমিতের কণ্ঠ পরিহাস-স্বচ্ছ।

তাই? তাই বুঝি কখন থেকে দাঁড়িয়ে ছিলাম 'বাস স্টপে'?—আসোই না আর।

অমিতের মনে পড়িল, বলিল: আচ্ছা, কি করে বুঝলে ওই বাস স্টপে আমাকে এখন পাবে?

না বুঝলে চলে না বলে।—বিষণ্ণ মধুর হাস্য ইন্দ্রাণীর। কিন্তু উত্তরের অবকাশ না দিয়াই আবার বলিল,—বসো, আসছি।

আঙিনার অন্য দিকে ইন্দ্রাণী সম্ভবত চায়ের জল চাপাইয়া দিতে গেল।... না, গ্যাস নাই। ঘরবাড়ি গিয়াছে, ফ্ল্যাটের জীবন আসিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের যেটুকু দান, হতভাগ্য 'ঔপনিবেশিক' দেশের চাপা-পড়া সমাজ তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না।· ঘরের বিলাস-বাহুল্যহীন পরিচ্ছন্ন উপকরণের দিকে তাকাইয়াও যেন অমিত তাহা এই পর্যন্ত দেখিতে পায় নাই। ইন্দ্রাণী নতুনকে চায়। নতুন কালকে সম্বর্ধনা করিতে চাহিলেই কি সম্বর্ধনা করিতে পারিবে তুমি, ইন্দ্রাণী?···গ্যাস নাই, সেই কয়লার উনুন ও ঝুল লইয়াই তোমাকে চলিতে হইবে।

ইন্দ্রাণী ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল: বিকালে মিনতি এসে বললে প্রথম।··

অমিত শুনিল, মিনতির ছাত্রী এক জেল-কর্মচারীর কন্যা। সেই তাহার মিনতিদিকে জানাইয়াছে, অমিত বাবু আজ ছাড়া পাইবেন। স্কুল সারিয়া মিনতি আজ আর বিকালের 'টিউশনি'তে যায় নাই। বিকালের আগে ইন্দ্রাণীদিকেও পাইত না। স্কুল হইতেই মিনতি ইন্দ্রাণীর কর্মস্থলে ছুটিল। সরাসরি তাহারা দুই জনে অমিতের বাড়ি যায়। জানিত সে বাড়িতে কেহই তাহাদের স্বাগত করিবে না। কিন্তু সেই অনাদর ইন্দ্রাণী গায়ে মাখিবে নাকি? আর, ইন্দ্রাণীদি যদি সঙ্গে থাকে তবে তাহা স্পর্শ করিবে কি মিনতিকে?

অনাদর কিন্তু তাহারা লাভ করে নাই। অবশ্য আপ্যায়নও বেশি হয় নাই। দাদার পর্বত-প্রমাণ বইপত্র লইয়া অমু ব্যস্ত ছিল। সে-ই জানায়, ব্রজেন্দ্র রায় অমিতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন; এবং 'সবিতাদি' আসিয়া দাদাকে তাঁহাদের বাড়িতে লইয়া গিয়াছেন। সবিতার সঙ্গে যে ইন্দ্রাণীর পরিচয় না আছে তাহা নয়। অনাহূত যাইবার মতো সাহসও ইন্দ্রাণীর আছে। সেই শিক্ষিত শান্ত-শিষ্ট মেয়ের ভদ্রতার কঠিন অস্বীকৃতিও ঠেকাইতে পারিত না। ইন্দ্রাণী তবু ব্রজেন্দ্র রায়ের গৃহে গেল না—অমিতের চায়ের আলাপে বাধা দিবে না বলিয়া মিনতি স্বগৃহে চলিয়া গেল। কাল সকাল সকাল বাহির হইয়া 'অমিতদার' সঙ্গে প্রথমেই সে দেখা করিবে, না করিলে চলিবে কি করিয়া মিনতির? মিনতির চলিবে না, কিন্তু ইন্দ্রাণীর চলিবে। কারণ, তাহার দেখা করিতে হইবে আজই, এই সন্ধ্যায়, নটার পূর্বে—এই 'বাস স্টপে'—না পাইলে অমিতের বাড়ির রাস্তার মোড়ে। সেখানে না পাইলে অমিতের বাড়িতে।—নিশীথ রাত্রির দেয়াল টপ্‌কাইয়া, দুয়ার ভাঙিয়া অমিতের আজিকার এমন রাত্রির স্বচ্ছন্দ নিদ্রা কাড়িয়া লইয়া—

স্ফুরিত অধরের হাসির সঙ্গে আয়তদীর্ঘচক্ষের সেই দীপ্তি।—এই হাসি, এই দীপ্তি অমিত কতবার দেখিয়াছে জানিয়াছে তাহার অর্থ—আপনার গৌরবে গর্বে সাহসে সত্যে অপরাজেয়, অপরাজেয় সেই ইন্দ্রাণী। প্রশস্ত ললাটে সেই ঔজ্জ্বল্য, জোড়া ভ্রূ তেমনি সুকৃষ্ণ, নাসিকাগ্র তেমনি স্পন্দমান। যৌবনের মধ্যাহ্ন আর নাই; কিন্তু জীবনের মধ্যাহ্ন বুঝি ইন্দ্রাণীর চিরন্তন,—আর চক্ষুর এই অপূর্ব কমনীয়তা।

তবু দেখা করতে, না?—অমিত সকৌতুকে বলিল।

নিশ্চয়। একদিন দেখা না করে ভুল করেছি, আবার সে ভুল করি আমি?

ছয় বৎসর পূর্বে সেদিন ইন্দ্রাণী বারে বারে অমিতকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছিল শঙ্কিত, ব্যাকুল, উৎকণ্ঠিত প্রাণ লইয়া। কেমন করিয়া সে বুঝিয়াছিল?—যেমন করিয়া বুঝে—মানুষের বুদ্ধি নয়—মানুষের প্রাণ, তেমন করিয়াই বুঝিয়াছিল,—সেদিন অপরাহ্ণে যে ঘটনা ঘটিয়াছে অমিত তাহার পরে আর

নিরাপদ নয়। অমিতকে কোথাও না পাইয়া রাত্রিতে ইন্দ্রাণী সেদিন আপন গৃহে ক্লান্ত দেহে ফিরিয়া যায়। ভাবিয়াছিল—অমিত হয়তো সে ঘটনার পরে সাময়িকভাবে আত্ম-গোপন করিতেছে; ইন্দ্রাণীই তাহাকে অন্বেষণ করিয়া বিপন্ন করিয়া ফেলিবে। আর সে বসিয়া থাকিবে না অমিতের গৃহে অমিতের অপেক্ষায়—তাহার পিতার উদ্বিগ্ন দৃষ্টি ও মাতার ব্যাকুল জিজ্ঞাসার সম্মুখে মুখামুখি। এক-একটি পলকই যে তাহাতে মনে হয় এক-এক যুগ! তারপর—ভোরের আলো দিনের আকাশে জাগিল, প্রভাত মধ্যাহ্নে পৌছিল। কর্মচঞ্চল জীবনের মধ্যেও ইন্দ্রাণী তবু যেন এক অস্থিরতায় ব্যাকুল। অপরাহ্নে কিন্তু ইন্দ্রাণী আর পারিল না, অমিতের কর্মস্থলে সংবাদপত্র আপিসে ফোন্ করিল—অমিতের খোঁজ পাওয়া যাইবে নাকি? খোঁজ মিলিল: অমিত তাহাদের দৃষ্টি-সীমানার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। রাত্রি-শেষেই পুলিশ তাহার গৃহে হানা দিয়াছিল আর ভোরের আলো না জাগিতেই অমিত পৌছিয়া গিয়াছে তাহাদের দৈত্যপুরীতে। তবু ইন্দ্রাণী এই দুর্বার সত্য মানিয়া লয় নাই - অমিত তাহার দৃষ্টিরও বাহিরে।

মানি নি, এ কথা চূড়ান্ত---বলিতে বলিতে ঘোষণা করিল সেই এক জোড়া চক্ষু। জোড়া ভ্রূর নিচে সেই চক্ষু দুইটি বড় হইয়া উঠিল এখনো বলিতে বলিতে—থানায় গিয়েছিলাম তথ্খুনি। গোয়েন্দা অপিসে ধরণা দিয়েছিলাম—তোমার মায়ের নাম করে। কোনো খোঁজই পেলাম না। কিন্তু মেনে নোব না তা, যখন সংকল্প করেছি তখন আমিই কি পরাজয় মানব?

ইন্দ্রাণী খুঁজিয়া লইল অমিতের বন্ধুদের—খুঁজিলে খোঁজ পাওয়া যায়ই। আর তারপর?—

এই তোমাকে নিয়ে এলাম তোমার অনিচ্ছায়ও পথে গ্রেপ্তার করে।

আমার অনিচ্ছায়?—প্রশ্ন করিল অমিত হাসিয়া।

ইচ্ছায়?—হাসি উত্তর দিল হাসির।—ছ-বছর এক ছত্র চিঠিও লিখতে পারতে না, অমিত,—ইচ্ছা থাকলে?—ভ্রূভঙ্গে কথাটা সমাপ্ত করিয়া আবার ইন্দ্রাণী উঠিয়া পড়িল।—এখনি আসছি, জল হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ।

অমিত জানে, অনেকের মতোই ইন্দ্রাণীও পরে একদিন চলিয়া যায়

কারাভ্যন্তরে। আবার বৎসর দুই তিন পরে একদিন বাহির হইয়াও সে আসিল—হয়তো মিনতির সঙ্গে, কিংবা তাহার একটু পূর্বে বা পরে। এই সব সংবাদ যে ইন্দ্রাণী অমিতকে না দিতে চাহিয়াছে তাহা নয়; অবশ্য সেন্সরের হাত ছাড়াইয়া তাহা অমিতের নিকট পৌঁছিবে না। তাহা অমিত জানে। গোয়েন্দা-চক্রের প্রশ্ন সূত্রেই অমিত বুঝিয়া লইয়াছে—কোথায়, কে তাহাকে এখনো ভুলিতে পারে নাই, আর গোয়েন্দা-দৃষ্টিও তাই তাহাদের ভুলিতে চাহে না। এই দৃষ্টির ফলে সুরকে থামিতে হইল—স্বামী ও শ্বশুরের শঙ্কিত পীড়াপীড়িতে। কিন্তু ইন্দ্রাণী থামিল না—কারাগৃহের অন্তরালেও সে চাপা পড়িবে না। সেই খবরের নানা টুকরা নানা সূত্রে নানা মুখে ঘুরিয়া অমিতের নিকটে আসিত। নিরাসক্ত মনে অমিত ইন্দ্রাণীর খবর শুনিত। খবর সে ভুলিত না, কারণ সে ভুলিবে ইন্দ্রাণীকেই। নির্জন কারা-কক্ষের অর্ধচেতন দিনরাত্রির শেষে অমিত ইন্দ্রাণীকে ভুলিবেই স্থির করিয়াছিল। আর স্থির যখন করিয়াছে অমিত, তখন সাধ্য কি নড়চড় হয়? অমিত ইন্দ্রাণীকে ভুলিয়া গেল—সত্যই ভুলিয়া গেল। ইহাতে ভুল নাই, অমিত ভুলিয়া গেল ইন্দ্রাণীকে। জানিত শুধু ইন্দ্রাণীর সংবাদ—জেলখানায় অনেকের মতো ইন্দ্রাণীও লেখাপড়া করিয়াছে, এই বয়সে পরীক্ষা দিয়াছে, পাশ করিয়াছে—কথাটা সকলেরই জানিবার মতো, মনে রাখিবার অমিতের। তারপর ইন্দ্রাণী মুক্তি পাইল—তাহার পুত্র তখন সংকটাপন্ন রোগে পীড়িত, শ্বশুর শেষ শয্যায়, দেশত্যাগী স্বামীও ফিরিয়া আসিয়াছে এই কারণে,—ইন্দ্রাণীও সেই কারণেই শর্তাধীনে—পাইল মুক্তি,—অমিত সব শুনিয়াছে। তারপর?—শ্বশুর যথানিয়মে মারা গিয়াছেন; স্বামী যথাপূর্ব ফিরিয়া গিয়াছেন রেঙ্গুনে কিংবা সিঙ্গাপুরে; ইন্দ্রাণী সপুত্র কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে; আপনার সংকল্প, না, সম্পত্তির জোরে দিল্লী না লাহোরে ইন্দ্রাণী চলিয়া গেল—আর তাহা অমিত জানে না। ইন্দ্রাণীকে অমিত ভুলিয়া গিয়াছে, আর এই দুই বৎসর তাহার সংবাদ শোনে নাই। শুনিতে চাহে নাই; শুনিলেও চমকিত হইত না।

দিল্লী গিয়েছিলাম নার্সিং পড়তে। সার্টিফিকেট পেয়েছিও।

নার্সিং?—সচকিত হয় অমিত।

হাঁ। কি, অমিত নাক সিঁটকাতে ইচ্ছা করছে? করবেই তো। আশ্চর্য আর কি? তুমি তো দেখো নি, আমাকে যে দেখতে হয়েছে। সইতে হয়েছে এই অবজ্ঞা ও অপমান—তোমাদের পদস্থ ভদ্রলোকের চক্ষু থেকে, আর বাক্য থেকে :—'নার্স'। কিন্তু কেন নার্স হলাম? মুক্তি যখন পেলাম তখন খোকা প্রায় মৃত্যুমুখে টাইফয়েডে। তখন যা করবার ছিল তা নার্সিং। তারও প্রধান পর্ব তখন শেষ হয়ে গিয়েছে,—সংকটের সুদীর্ঘ মাসাধিক পর্ব। ভাগ্যক্রমে চলছে তখন সংকট-শেষের আরোগ্য-পর্ব। সেবা-শুশ্রূষা চিরদিনই জানতাম, অমিত। কিন্তু সে-জানা দেখলাম প্রয়োজনের তুলনায় অসম্পূর্ণ। আর খোকার রোগশীর্ণ চক্ষুর সেই নীরব মিনতির দিকে তাকিয়ে বুঝলাম—আমি অসম্পূর্ণ, বড় অসম্পূর্ণ আমি, অমিত। তাই একটি প্রতিজ্ঞাও গ্রহণ করলাম মনে মনে। আর যার কাছে বসে আমি এই শেষ পর্বের সংকল্প নিলাম, আর নিতে নিতে শুনলাম তার জীবন—হয়তো সে জানলও না, অমিত, সে তোমার মতোই আমাকে তোমার মতোই পথ দেখাল তোমার থেকেও আমাকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দিল বেশি। তোমার মতোই সত্য সে আমার জীবনে। অথচ সে আর তুমি পৃথক জগতের মানুষ দুজনা। সাধারণ সামান্য মানুষ সে—অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে। তার স্বামী ছিল, এখনো আছে—কাকে না কাকে নিয়ে। আর সে আছে তার পুত্রকে নিয়ে। খুব সতী সাধ্বী সেও নয় তা বলে। কিন্তু এও সে জানে—সে মা, আর জানে নিজের নারীত্বের মর্যাদা। আত্মনির্ভরশীল নির্ভীক মানুষ সে, লেখাপড়া শিখিয়ে ছেলেকে মানুষ করবে। এই স্বাধীন মানুষের রূপ কি ইতিপূর্বে আমি দেখেছি?—স্বাধীনতার জন্য তো মাথা খুঁড়েছি আমরা—ভাবতে পেরেছি কি স্বাধীন মেয়ে-মানুষের রূপ? জেলে বসে বসে পড়েছিলাম 'দি সোল এন্চ্যান্টেড'। ভাষাজ্ঞান বেশি নেই, কিন্তু ভাব বোধ করতে পারি, তা জানি। পড়েছিলাম 'এ্যানেৎ সিল্ভি' থেকে 'মাতা পুত্র' পর্যন্ত। আর নিজেকে ভুল করবার পথ রইল না। হাঁ, অমিত আমি নিজেকে দেখলাম বই-এর মধ্যে। আর বেরিয়ে এসে দেখলাম আমার সেই পড়া-সত্যের আরও স্বাক্ষর—সামান্য এক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান নার্স, সম্ভবত সে নিজেকে নিজেও চিনে না। জেলে দেখেছি—আমার মতো অতি-সচেতন

শিক্ষিতা রাজনৈতিক 'মহিলাদের' দেশোদ্ধারিণী নাম কীর্তি নিয়ে আমরা কত যত্নে 'অর্ডিনারিদের' ছোঁয়া বাঁচিয়ে আপনাদের 'পোলিটিক্যাল' পবিত্রতা বাঁচাতাম। সেই 'মহিলাদের' মধ্যে তো অকুণ্ঠ মেয়ে-জীবনের এমন সহজ সমস্যা-বোধ দেখিনি। আর এমন স্বাধীনতারও জীবন্ত উপলব্ধি দেখিনি। পদস্থ পরিবারের কন্যা-বধূ আমরা—হয়তো বা পদবীস্থ পরিবারের। জীবিকার্জন আমাদের নিকট একটা অবান্তর প্রশ্ন, অথবা লজ্জাকর দুর্ভাগ্য। তাই তোমাদের নতুন শাস্ত্র বুঝলাম যা জেলেও বুঝি নি—জীবিকার স্বাধীনতা না পেলে জীবনেও স্বাধীনতা রূপ গ্রহণ করতে পারে না। এই অর্থশাস্ত্র মানলাম, বুঝলাম এই আমার জীবন-শাস্ত্র। তারপর দিল্লীতে ছুটলাম নার্সের ট্রেনিং নিতে।

ডাক্তারিও পড়তে পারতে—তুমি তো আই-এ পাশ করেছ।

পারতাম। তোমরাও তা হলে আমার জন্য কম লজ্জা বোধ করতে। অবশ্য 'লেডি ডাক্তার'ও তোমাদের চক্ষে কতটা শ্রদ্ধার, তাও আমি জানি। তবু 'নার্স'—না, সে প্রায়···হাত তুল্‌ছ? তোমাব শালীনতা বোধ নষ্ট হবে আমার মুখের স্থূল শব্দটায়। হাসছ? যেন মিথ্যা কথা। কিন্তু নার্সিংই পড়লাম। কেন জানো? আমার বয়স হয়েছে চোখ মেলে দেখছ কি? হাঁ, আমার বয়স হয়েছে। এদেশের কোনো মেডিকেল স্কুলে কলেজে এমন ধাড়ী ছাত্রীর স্থান নেই। আমারও অত টাকা নেই—নিজের পড়ার খরচ করি যা ছেলের পড়ার জন্য তার বাপ দিয়েছে। তাই নার্স হলাম। এখানে এসেছি দুমাস আগে—একটা হাসপাতালের কাজ নিয়ে। চাকরিই নিয়েছি, খোকাকে ফেলে। বাইরে 'কলে' বেশি যেতে চাই না।

আবার ইন্দ্রাণী উঠিল। তাহার অপ্রচুর গৃহশয্যার দিকে এবার অমিত ভালো করিয়া তাকাইল। ইন্দ্রাণী আজন্ম স্বাচ্ছন্দ্যে অভ্যস্তা। স্বাচ্ছন্দ্য কেন, ঐশ্বর্য না হইলে তাহার চলে না। সকলের পক্ষে যাহা বাহুল্য ইন্দ্রাণীর পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক। অপরিমেয়তার মধ্যে ছাড়া সে আপনাকে প্রকাশ করিতেই পারে না। সকলকে দিয়া-থুইয়া, খাওয়াইয়া-পরাইয়া দুই হাতে বিলাইয়া দিয়া আপন হৃদয়-প্রাবল্যের প্রকাশ করিতে না পারিলে সে শান্তি পায় না। সেই

ঐশ্বর্যের পথে আপনাকে মেলিয়া দিতে না পারিলে ইন্দ্রাণী শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যাইবে। সম্পদ তাহার চাই—আপনার ভোগতৃপ্তির জন্ম নয়; সম্পদই ইন্দ্রাণীর সত্তার স্বাভাবিক দেহ, তাহার আত্মার আশ্রয় বলিয়া। কি করিয়া সেই ইন্দ্রাণী এই সাধারণ, বাহুল্যহীন কঠিন জীবনে আপনাকে পোষণ করিবে? কি প্রয়োজন ছিল তাহার—স্বামী ও শ্বশুরকুলের সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিত্যাগ করিবার? শুধু উন্মাদ আত্মঘোষণা—আত্মস্বাতন্ত্র্যকামীর? বক্র বিদ্রোহ সমাজ নিষ্পিষ্ট বিদ্রোহিণীর?—না, দৃপ্ত দারিদ্র্য-গর্ব-দর্পিতা নারীর?—হয়তো সবই। কিন্তু যাহাই হউক—ইন্দ্রাণী সেই সুস্থ, জীবনছন্দ আর ফিরিয়া পাইবে কি?

ডিশে আসিল ডিমের তপ্ত পোচ, আর পেয়ালায় চা। এমন সামান্য আয়োজন লইয়া আসিতে হইলে ইন্দ্রাণী আগেকার দিনে লজ্জায়, ক্ষোভে আত্মধিক্কারে মরিয়া যাইত।—শুধু ডিমের পোচ, আর চা-অমিতের জন্য! কিন্তু আগেকার মতোই সেবা-সুন্দর হাতে তাহা অমিতের সম্মুখে ছোট টিপয়ে রাখিয়া ইন্দ্রাণী বলিল: পরের হাতের খাবার তোমাকে আজ খাওয়াতে পারব না অমিত। তোমার জন্য তৈরি করব কিছু আপন হাতে তাও হল না—সাধ ছিল, কিন্তু সাধ্য কি? তোমার সময় নেই যে। কিন্তু অমিত তোমার এই আসা তুমিও মঞ্জুর করো না,—আমি তো মঞ্জুর করিই না। কারণ তুমি আসলে আসো নি—দায়ে পড়ে এসেছ।

দায়ে পড়ে এসেছি?—এক পেয়ালা চা খাইয়া অমিত বলিল: দায়ে পড়ে বরং আসতাম না, বউদি।—অমিতের চোখে রঙ্গময় কৌতুক।

ইন্দ্রাণী ঈষৎ গম্ভীর হইল সম্বোধনে। অমিতের চোখের হাসিতে সাড়া না দিয়া বলিল: সম্বোধনটা সংশোধন করে নিলে, না?

অমিত বুঝিল। হাসিয়া সহজ করিবার জন্য বলিল: দায়ে পড়ে।

ইন্দ্রাণী হাসিল না। বলিল: দায়ে পড়ে মিথ্যার শরণ নিলে—না?

একটু একটু করিয়া অমিতও পরিহাস-আবরণ ছাড়িয়া ফেলিতে লাগিল: না, বউদি, মিথ্যা বলে মিথ্যার শরণ নিতে চাই না। কিন্তু মিথ্যাকে মিথ্যা হয়ে যেতে দোব না, সত্য করে তুলব, এই ঠিক করেছিলাম।

তারপর ?

শুনতে চাও ? প্রয়োজন আছে ?—আজ এক মুহূর্তে এই কলকাতা শহরের পথের উপর—সহস্র লোকের ভ্রূক্ষেপহীন ভিড়ের মধ্যে—দেখলাম —আমার নিয়তি।

নিয়তি ?—দীপ্তি নাই, কৌতুক নাই, কৌতূহলও নাই—ইন্দ্রাণীর দুই আয়তনেত্রের মধ্যে অতলস্পর্শী গভীরতা। হয়তো আত্ম-জিজ্ঞাসা।

অমিত আপনার স্থির দৃষ্টি সেই দুই চক্ষের উপরে স্থাপিত করিয়া শান্ত স্থির বিষাদে কহিল : হাঁ, দেখলাম আমার নিয়তি। একটি শব্দ হয়ে, একটি আহ্বান হয়ে প্রথম সে জেগে উঠল—যেন আমার বুকের তলা থেকে জেগে উঠল ঘুমন্ত স্মৃতি। তারপর সে সম্মুখে দাঁড়াল—মথিত সমুদ্রের উপরে সেই অতলশায়িনী দেবীর মতো। একদিন যে কণ্ঠ শুনে, যে মূর্তি দেখে মানুষ আমি শিহরিত হয়ে উঠেছিলাম পুরীর ঢেউ-ভাঙা সমুদ্র-সীমান্তে ;—আপনার উচ্ছ্বাসে আপনি ডেকে উঠে, আপনার আকুলনয়নে আপনাকে সঁপে দিতে দিতে আবার ফিরে গিয়েছিলে তুমি দুর্বার প্রয়াসে নিজেকে সংহত করে, সংবৃত করে তোমার সমুদ্র-সিক্ত, বেশবাস.—আজ মুখোমুখি দেখলাম আবার সেই মূর্তি। তাকে আমার নিয়তি ছাড়া আর কি নাম দোব, বলো ?

ইন্দ্রাণী অবনতশিরে বসিয়া আছে, দৃষ্টি মেঝেয় নিবদ্ধ, চোখ দেখা যায় না। দেখা যায় অর্ধাবগুণ্ঠিত সীমন্ত-চিহ্নিত ঘন কেশরাশি, একটি আনত মস্তকের রেখা, নারীদেহের বঙ্কিম বিন্যাস। হয়তো ছাদের বাতাসে তাহার বসন কাঁপিতেছে ;' হয়তো বা বুকের ভিতরেও বহিতেছে কোনো ঝড় ; কাঁপিতেছে সেই ছন্দিত নারী দেহ। · চুলে পাক ধরিয়াছে তাহারও তোমারও, অমিত। মাথার চুলও পাতলা হইয়া আসিতেছে—তোমারও তাহারও। এই প্রাণোজ্জ্বল দেহেও আসিতেছে যৌবন অপরাহ্নের প্রথম শ্রান্তি-রেখা ; অধরের কোণে প্রথম স্বাক্ষর-লেখা বয়সের ; সুচিক্কণ গৌরবর্ণে প্রথম তাম্রাভাস ; সুডৌল চিবুকের তলায়, কণ্ঠের নিকটে প্রথম শিথিলতা চর্মের ; আর সেই সুন্দর দীর্ঘবাহুতে, চাঁপার কলির মতো সুদীর্ঘ অঙ্গুলিতেও একটি ম্লান মন্থরতা।...এই দেহের প্রত্যেকটি ছন্দকে, প্রত্যেকটি ভঙ্গিমাকে,

প্রত্যেকটি আবেগ-সুন্দর সুষমাকে অমিত মনে মনে চিনে, ভালোবাসে। আর তার সেই প্রাণপ্রাচুর্যময় অঙ্গের কোথাও কোনো নিষ্প্রভতার ছায়া কোনো কালে লাগিতে পারে তাহা যেন অমিত ভাবিতেই পারে না। আপনা হইতেই তাহার মন সেই চিন্তাতে ফিরিয়া যায়—জীবন নিঙড়াইয়া লইতেছে—শুধু তোমার পিতাকে নয়, অমিত, শুধু ব্রজেন্দ্র রায়কে নয়,—তোমাদেরও, তোমাকেও, ইন্দ্রাণীকেও। এই তো নিবিয়া আসিতেছে তাহার প্রাণোচ্ছ্বাস, হারাইতেছে এ দেহ তাহার ছন্দ-সুষমা, চক্ষু তাহার অফুরন্ত বিস্ময়ের আনন্দ; মসৃণ সুচিক্কণ মুখ, নাক, ওষ্ঠ, চিবুক, কপোল—তাহায় সুচিক্কণ মসৃণতা।

হঠাৎ ইন্দ্রাণী মুখ তুলিল। জিজ্ঞাসা করিল: কি দেখছিলে অমিত?

অমিত সবিষাদ হাস্যে কহিল: তোমাকে।

ইন্দ্রাণী হাসিল, বলিল: কি বুঝলে?

বুঝলাম?—না, বুঝলাম না—তুমি কি দেহময়ী, না প্রাণময়ী?

কাকে তোমার বেশি ভয়, অমিত—দেহকে, না, প্রাণকে?

'ভয়'?—না, ভালোবাসা? জানি না কাকে।

ইন্দ্রাণী আবার নীরব হইল। একটু পরে কহিল: দূরে রাখতে চাও আমাকে তুমি অমিত?

কি উত্তর দোব, বউদি'?—হাঁ এবং না। বুঝেছ নিশ্চয়।

বুঝলাম। কিন্তু কি উত্তর দিতে 'ইন্দ্রাণীকে'?

'ইন্দ্রাণী' তা জানে। জানে না কি বউদি'?

জানে। জানে বলেই সে তোমাকে জানাচ্ছে—মিথ্যা নিয়ে মুক্তি পাবে না অমিত। আমি পাই নি, তুমিও পাবে না। আমি জানি—আমি ইন্দ্রাণী, কারও ভার্যা নই, বউদিও নই। আমি ইন্দ্রাণী—তোমার অন্তরাত্মাও তা স্বীকার করেছে স্বতোচ্ছ্বাসে সেই প্রথম মুহূর্তেই আজ পথের উপরে।

তা পথের স্বীকৃতি। সে আহ্বান পথের, সে স্বীকৃতিও পথের। আর তোমার গৃহে স্বীকৃতি এই,—এ আহ্বান তোমার স্বরচিত সৃষ্টির, মাতা-পুত্রের সংসারের—

কথা শেষ হইতে পারিল না। স্পষ্ট দৃঢ় কণ্ঠ ইন্দ্রাণীর: আমার 'স্বরচিত' নয়—অন্যের নির্ধারিত। তবে তার যেটুকু আমার স্বকীয় তাকে আমি স্বকীয় করে তুলব, আর সৃষ্টি করব নিজের হাতে আমার নিজ পরিচয়।

বলিতে বলিতে সোজা হইয়া বসিল ইন্দ্রাণী। চোখে আলো ফুটিল, স্বপ্ন ফুটিল, ফুটিল বুঝি জ্বালাও। ইন্দ্রাণী আপনার ভাগ্য জয় করিবার অধিকার পায় নাই। আপনার সাধনায় পায় নাই সে স্বামী, গৃহ, সংসার। পাইয়াছে পিতামাতার ইচ্ছায়, সমাজের গতানুগতিক বিধানে। এই ইচ্ছা, এই বিধান তাহাকে জীবনে বন্ধন দিয়াছে, মুক্তি দেয় নাই। তবু ইহারও মধ্যে তাহার আপনার অন্তরের কামনা অজ্ঞাতেই রূপ লইয়াছে তাহার সন্তানের আকারে, এবার সেই প্রার্থিত দানকে ইন্দ্রাণী সজ্ঞানে অর্জন করিবে আপন শক্তি দিয়া। তাহার মাতৃত্বকে করিবে স্বকীয়, আর তাহার পুত্রকে করিবে স্বাধীন। তবেই না ইন্দ্রাণী বলিতে পারিবে—সে সৃষ্টি করিয়াছে আপন সংসার। সেই সৃষ্টির স্বচ্ছন্দ প্রকাশে তাহার পুত্রও জানিবে—সে মানুষ, এই পরিচয়ই তাহার পরম পরিচয়। তাহার মা মানবী ছিলেন, এই পরিচয়ই পরম গৌরবের। আর এই শিক্ষা, এই সত্যই সে জানিবে,—জীবনে এই মানুষের দাবীকে নির্ভয়ে মানিয়া লইত তাহার মাতা। তাই ইন্দ্রাণী এই মাতা-পুত্রের সংসার মানিয়া লইয়াছে—এই কণ্টকাকীর্ণ মুক্তির পথ, পৃথিবীর সত্যকারের দাবী। ইন্দ্রাণী বঞ্চনা করিবে না—নিজেকেও না, পরকেও না।…

আপনাকে ফাঁকি দেওয়া যায় নাকি অমিত?—বলিতে বলিতে আবার ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করিল।

অমিত চমকিত হইল। সেই একই প্রশ্ন এই কোন কণ্ঠ হইতে আবার তাহাকে আক্রমণ করিল—ঘিরিয়া ফেলিল, গ্রাস করিল? সত্য এক; কিন্তু কত বিচিত্র আবরণ, কত দেহ দেহান্তরের মধ্য দিয়া তাহা রূপলাভ করে।… বিস্ফারিত দুই চক্ষু অমিতের মুখের উপর স্থাপিত। অমিত ভালো করিয়া কথা বলিতে পারে না। কি করিয়া বুঝাইবে? কোনটা ফাঁকি কোনটা সত্য, তাহাই যে বলিবার উপায় নাই! এই তো, কত দিন-মাস ধরিয়া অমিত আপনার মনে আপনি একটি মায়া-প্রাসাদ সযত্নে গাঁথিয়া তুলিতেছিল,—মাত্র

দুইটি শব্দ ও তাহার পিছনকার একটি অস্পষ্ট আবেগের আবেদন লক্ষ্য করিয়া : 'প্রতীক্ষা' ও 'প্রত্যাশা'। অমিত কি করিয়াছিল ? নিশ্চয়ই ভুল করিয়াছিল। এই মাত্র একটি দিনেই আজ এই সন্ধ্যায় সে বুদ্বুদ ফাটিয়া গেল। কিন্তু ভুল করিয়াছিল সবিতাই বেশি। আর তাহার ভুল এখনো ভাঙে নাই, ইহাই আশ্চর্য। অমিত তো ভুল করিতেই পারে। কারণ, সে ভুলিতে চাহিয়াছিল আরো গভীরতর সত্যকে, চৈতন্যের অতলবাসী সত্যকে—আপনার নিয়তিকে। —অমিত চাহিয়াছিল তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে। তাই, সবিতা কেন, যে কোনো বালিকা বৃদ্ধা প্রৌঢ়ার সামান্যতম স্নেহ সহায়তাকেও অমিত সে দিন —সেই কঠোর কারাবাসের বিক্ষিপ্ত চেতনার মধ্যে—আঁকড়াইয়া ধরিত, আত্মরক্ষার বর্ম হিসাবে তাহা গ্রহণ কবিতে চাহিত। ইহাই তাহার শিক্ষা-দীক্ষা; আজন্ম সাধনারও সমর্থিত, আপনারও অজ্ঞাত আপনার ছলনা। অমিত ফাঁকি দিয়াছিল তাই সেদিন নিজেকে, আর 'নিজেকে ফাঁকি দেওয়া যায় নাকি, অমিত ?' সমাজকে যায়, বিধাতাকে যায়; ফাঁকি দেওয়া যায় না তবু নিজেকে। কারণ, সে-ই তো আসল নিয়তি। "Our character is Fate. Fate is our own selves." কিন্তু তাই বলিয়া অমিত কি ফাঁকি দিবে না নিজেকে—'ইন্দ্রাণী'কেই স্বীকার করিলে এখন ? এরূপে অস্বীকার করিলে ইন্দ্রাণীর সংসার, তাহাব সামাজিক পরিচয়, তাহার এই মাতৃ-মর্যাদা ? ইন্দ্রাণীও সমাজের ফাঁকি মিটাইয়া দিতে গিয়া আপন জীবনের মাঝখানে বিদ্রোহের ঔদ্ধত্যের দুর্জয় আত্মাভিমানের ফাঁকি সৃষ্টি করিয়া বসিবে না, কে বলিবে ? এক বিভ্রান্তির জাল ছিঁড়িয়া তাহারই দায়ে আর এক জটিলতর বিভ্রান্তির জাল যে অমিতও এইখানে এই সন্ধ্যায়ই বুনিতে বসিতেছে না তাহার ঠিকানা কি ?—বস্তুর বনিয়াদ হারাইলে কল্পনা কতখানি ছলনাকে গড়িয়া তুলিতে পারে, আর ছলনা কত ছলনা হইয়া যায় জীবনের সহজ সত্যের সঙ্গে মুখামুখি হইবা মাত্র, কাহাকে বুঝাইয়া বলিতে পারে অমিত এই জটিল তত্ত্ব ? এই সত্য-মিথ্যার, আত্ম-ছলনার ও আত্মান্বেষণের দুর্বোধ্য তথ্য ?—কে আছে এমন যাহাকে বলিতে পারা যায় অমিতের, সবিতার, মন্থর কথা—যাহাকে সব কথা বলা যায় ?—

'যাহাকে সব কথা বলা যায়',—সেই পলাতকাশ্বের আকুতি। এই কি,—অমিত নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল, এই কি সেই লোক?—ইন্দ্রাণী? সেই বন্ধু, নারীপ্রাণ, সে অন্তরের অন্তরবাসিনী? অমিত অনুভব করিল—এই শশাঙ্ককে জড়ানো তাহার সমস্যার কথা। ইন্দ্রাণীকে বলিতেই হইবে। অনুভব করিতেছে —ইন্দ্রাণীকেই তাহা বলা যায়, ইন্দ্রাণী ছাড়া আর কে বুঝিবে?

অমিত বলিতে লাগিল, ইন্দ্রাণী শুনিল।

নির্জন কারাকক্ষের সেই দিন রাত্রিগুলি অমিতের নিকট চেতন-অচেতন নানা বেদনা-অনুভূতির প্রবল তাড়নায় প্রমত্ত, বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছিল। স্থৈর্য ও উন্মত্ততার কত সূক্ষ্ম ও কত স্বাভাবিক ক্রীড়াক্ষেত্রই না মানুষের মন। কত সামান্যই না প্রভেদ সুস্থ চেতনার সঙ্গে উন্মত্ত চেতনার! এখনো অমিত শপথ করিয়া বলিতে পারে না—সেদিন সে এই প্রকৃতিস্থ অমিত ছিল না, হইয়া গিয়াছিল বিক্ষিপ্ত-চিত্ত, বিচ্ছিন্ন-সত্ত, উন্মাদ অমিত। কিন্তু সে জানে—অমিতের সেদিনের দিনরাত্রির স্বপ্ন-স্মৃতি কল্পনার সহায়ে, অসংখ্য বার অসংখ্য রূপে—অসংখ্য সূত্রে—এক মায়া-ইন্দ্রাণী তাহার লীলায় লীলায়, রূপে, মাধুর্যে, নির্মম ছলনায় অমিতকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল। বিশৃঙ্খল চেতনার সেই নিষ্ঠুর বিকৃতি হইতে অমিত রক্ষা পাইল হয়তো কঠিন দৈহিক পীড়ায়। দেহের অতি বাস্তব ব্যাধি তাহাকে উদ্ধার করিল মনের অতি-কাল্পনিক বিশৃঙ্খলা হইতে। তারপর বহুজনের সাহচর্যে অমিত যখন আপনাকে ফিরিয়া পাইল সেদিন তাহার স্থির শুভবুদ্ধি আপনার প্রয়োজনেই বুঝিল—ইন্দ্রাণী মায়া নয়, অমিতের জটিলতম সত্য; এবং সেই জটিলতা হইতে আত্মরক্ষা না করিলে অমিত খান-খান হইয়া যাইবে। দায়ে পড়িয়া,—সত্যই 'দায়ে পড়িয়া'—অমিতের মন আপনাকে বাঁধিয়া লইল; প্রাণের দায়ে, সুস্থ চেতনার দায়ে, ইন্দ্রাণীরও সুস্থির জীবনের দায়ে। মন স্থির করিল—ইন্দ্রাণী, অমিতের জীবনের দূর অতীতেই ইন্দ্রাণী একদা ছিল। সেখানকারই স্বপ্ন সে, এখন আর সে সত্য নয় অমিতের পক্ষে, অমিতের জীবনে। সত্য সে কোনো দিন অমিতের জীবনে হয় নাই, কোনো দিন সত্য হইতে পারিবে না। অমিতও কোনো দিন সত্য হইতে পারে না ইন্দ্রাণীর

জীবনে। আত্মরক্ষার বুদ্ধিই এই নিশ্চিত বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া তুলিল। সত্যই তারপর একটা অলীক স্থিরতা, ভঙ্গুর সান্ত্বনা আসিয়াছিল অমিতের নির্বাসিত দিনরাত্রিতে। ইন্দ্রাণীও নির্বাসিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অবরুদ্ধ জীবনের জন্য বুঝি কল্পনার এক ফালি আকাশের প্রয়োজন হইল। তাহা সবিতা। আজ গৃহে ফিরিয়া দ্বিপ্রহরে আর সন্ধ্যায় একটু সেই আকাশের তলাকার বাস্তব ভিত্তিভূমিখানিকে একটু করিয়া অমিত দেখিল। দেখিল আর কেবলই বুঝিল—সেই আকাশও ছলনারই বাষ্পে ছাওয়া। তারপর এইমাত্র পথের উপর এক দমকা হাওয়ায়, এক জোড়া চক্ষুর আলোকে সেই কুহেলিকার শেষ সংশয়ও অমিতের দৃষ্টি হইতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। অমিত জানে এখনো তাহা সবিতার মন ও মন্টুর বুদ্ধি ছাইয়া আছে। একদিন অমিতের সঙ্গে সবিতার জীবন-বন্ধন সম্ভব ছিল, শুধু এই তথ্যটুকুকে আশ্রয় করিয়াই হয়তো অমিতের মাতা-পিতা ও হয়তো ব্রজেন্দ্র রায় এই কুয়াসা ঘনতর করিয়াছেন। হয়তো তাই আরও সন্তর্পণে, সঙ্গোপনে, সবিতার কল্পনা ইহার পোষকতা পাইয়াছে। আর সবিতার মন দূরান্তরে চক্ষের অগোচরে অমিতকে গঠন করিবার সুযোগ পাইয়াছে আপন কল্পনা মতো, আপন আদর্শ মতো, আপন সাধনা মতো। অমিত তাহার কাছে অমিত নয়, ভারতীয় আদর্শ; জাতীয় আত্মবিকাশের একটি প্রতীক। মন্টুর সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস পড়িতে পড়িতে মন্টুর সৌহার্দ্য হইতে সবিতা সেই দেবমূর্তির পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে। এক সঙ্গে পড়িতে পড়িতে, এই আদরের ও আদর্শের মূর্তিকে দুজনার মধ্যখানে রাখিয়া ভ্রাতৃগর্বিত মন্টু ও আদর্শ-তৃষিতা সবিতা দুইজনায় পরস্পরের স্বচ্ছন্দ সুহৃদ হইয়া উঠিয়াছে, হইয়া উঠিয়াছে প্রীতিপ্রেমভরা বন্ধু। তাহারা জানেও না তাহাদের জীবনে অমিত একটা উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য তাহারাই পরস্পরের। আনন্দ, প্রেম, পরিহাস, জীবনের সহজ বিনিময় সম্ভব শুধু তাহাদের পরস্পরের মধ্যে, 'দাদার' সঙ্গে নয়—সে অনেক উচ্চ বেদির উপরকার দেবতা, মনের স্পর্শাতীত আদর্শ —সেখানে পা ফেলিতে পা কাঁপে, স্বচ্ছন্দ হইবার সাধ্য কি সেখানে সবিতার? অথচ মন্টুও জানে না 'সবিতাদি' তাহার কে, আর সবিতাও জানে না 'মন্টু'

তাহার কতখানি। তাহা ছাড়া আরও যাহা জটিলতা আছে তাহা কাটাইয়া উঠিতে না পারা অবশ্য মূঢ়তা।

কিন্তু বুঝি না—এ জটিলতার সমাধান হবে কি করে 'বউদি'।

ইন্দ্রাণী শুনিতে শুনিতে শান্ত স্থির হইয়া বসিয়া ছিল। হয়তো এই শেষ সম্ভাষণেই তাহার দেহে একটা কাঠিন্যের সাড়া জাগিল। স্থির দৃঢ়কণ্ঠে সে বলিল: মিথ্যার জালকে ছিঁড়ে ফেলে।

কে ছিঁড়ে ফেলবে তা?

সবিতা, মন্টু,—আর তুমিও, অমিত। হাঁ, তোমাকেই দিতে হবে প্রথম টান; কারণ তুমিই সচেতন। কি বলো, সত্য নয়?

অমিত নীরব ছিল। বলিল: সত্য। এ সত্য নিজের মনেও বুঝেছি। কিন্তু জীবন বড় জটিল, ইন্দ্রাণী।

তাই ফাঁকির জাল রচনা করতে হয়, অমিত,—না? কিন্তু ফাঁকি কাকে দেবে, অমিত? নিজেকে ফাঁকি দেওয়া যায়?

যায়। কতজনা জীবনকে আজন্ম ফাঁকি দিয়ে যায়। মসৃণ নিরুদ্বেগ। সহজ তাদের দিনরাত্রি।

আর অতি কৃপার পাত্র তারা। তাই না, বলো?

সম্ভবত।

নীরবে বসিয়া রহিল দুই জনা। পান শেষ চায়ের পেয়ালার পানবিশিষ্ট চায়ের দিকে ইন্দ্রাণীর চিন্তাচ্ছন্ন দৃষ্টি। সেই আনত মুখের চিন্তা-সুস্থির রেখার দিকে অমিতের চিন্তাচ্ছন্ন চক্ষু।

হঠাৎ ইন্দ্রাণী চোখ তুলিয়া বলিল: ওঠো, অমিত, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। রাত্রি আটটার বেশি খোকাও পড়বে না।

অমিত চমক ভাঙিয়া দাঁড়াইল। বলিল: তাও মনে আছে?

নিশ্চয়। নইলে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে ইন্দ্রাণী—যাকে কেউ নোয়াতে পারে নি,—স্বামী নয়, পিতৃকুল-শ্বশুরকুল নয়, লোকের বক্রকটাক্ষ তো নয়ই তোমার সযত্ন-রক্ষিত দূরত্বও নয়। কিন্তু এই আমাব শেষ পরীক্ষা—খোকার আর

আত্মার মধ্যে বন্ধুত্ব-রচনা।—বসো একবার তুমি পাঁচ মিনিটের মতো, ওর সঙ্গেও একবার পরিচয় করো।

ইন্দ্রাণী বাহিরে গেল। সকুতূহলে অমিত বসিয়া রহিল। সে কি কথা এই বালকের সঙ্গে বলিবে?—যে বালকও নাই, কৈশোরের তীরে আসিয়া পড়িতেছে। জীবনের এই পুলক-শিহরিত প্রথম পাদে অনুভূতি-প্রবণ তাহার নমনীয় নতুন চেতনায় কেমন করিয়া অমিত কোনো ঔজ্জ্বল্যের, সৌন্দর্যের রেখাপাত করিবে? কেমন করিয়া? এমন পরীক্ষায় যে অমিত পড়িবে সে কি তাহা জানিত? এই তাহার প্রথম পরীক্ষা—আর পরীক্ষার প্রারম্ভ মাত্র এখনো।

তোমরা কথা বলো, আমি ততক্ষণ ওর খাবার সাজাই। তারপরে তোমারও ছুটি, অমিত। নইলে দেবি হবে।

ছেলেকে অমিতেব সম্মুখে পৌঁছাইয়া দিয়া ইন্দ্রাণী বিদায় হইল প্রাঙ্গণের অন্য প্রান্তে।

কি বলিবে অমিত? এত বৎসর যে শিশুমুখ দেখে নাই, বালকের সঙ্গে কৌতুক-ক্রীড়ায় যোগ দেয় নাই, কোনো তরুণ কিশোরেব হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভরা মাধুয আস্বাদন করে নাই। তাহার বঞ্চিত হৃদয়ের এই সুদীর্ঘ তৃষ্ণা এই অভাবনীয় মুহূর্তে অমিতকে যেন আরও বিমূঢ় করিয়া তুলিতে চাহিল। কি বলিবে, অমিত? কি বলিবে? কিন্তু কিছু না বলিলে এক-একটি নিমেষের নিস্তব্ধতায় যে ভারাক্রান্ত হইবে ভবিষ্যৎ—তোমাব, ইন্দ্রাণীর, এই কিশোর বালকের।

কোথায় পড়ছ তুমি?—এক নিমেষও দেরি না করিয়া অমিত জিজ্ঞাসা করিল মামুলী প্রশ্নটাই।

একটি বিলাতি স্কুলের নাম করিল মানু। মামুলী কথার পথ বাহিয়া চলিল পরিচয়। দিল্লীতে এইরূপ স্কুলেই পড়িতে হইয়াছে। পরে পড়িবে বাঙালী স্কুলে। কারণ, এইসব বিলাতী স্কুলে বাঙলা পড়ায় না। তবে মানু মায়ের কাছেই বাঙলা পড়ে—মায়ের সঙ্গে। পড়ে বাঙলা সংবাদপত্র, পড়ে গল্পের বই। কত বই ঠিক আছে? না, মা রাক্ষস, রাজা-রাজড়া, ভূত-পরীর গল্প পড়তে দেন

না। 'মায়ের স্মৃতি', 'বৈজ্ঞানিকী', এসব পড়েন মা; পড়েন আরও কত কি? এখন তাহারা কি পড়িতেছে? আজ রাত্রিতে পড়িবে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমাইবার আগে—'গোরা'।

হাঁ, মা বলেন সে 'গোরা' বুঝিবে—নিজের মতো করিয়াই মান্থু বুঝিবে।—কিন্তু আজ অমিতবাবু এখানে থাকিলে মান্থু শুনিত তাঁহার জেলের গল্প। থাকিতে পারিবেন না তিনি? বেশ, কবে আসিবেন আবার? কাল? কালও না? কবে তবে? অমিতের যে মান্থুকে শুনাইতেই হইবে তাঁহার কথা! এত শুনিয়াছে মান্থু অমিতের কথা মায়ের মুখে! হাঁ, কতবার শুনিয়াছে।—মা বলেন—আপনি নাকি তাঁদের কমিউনিজম্-এর মাস্টার।

আমি! মাস্টার কমিউনিজমের!

হাঁ, মা বলেছেন।

ইন্দ্রাণী ফিরিয়া আসিয়াছিল। অমিতের বিস্ময়-বিমূঢ়তা এবার রূপান্তরিত হইল রঙ্গ-পরিহাসে। মান্থুকে অমিত বলিল, তোমার মা একটি বদ্ধ পাগল।

সম্পর্কটা সহজ হইয়া উঠিয়াছে, ইন্দ্রাণী তাহা বুঝিল। সহজ সুরে সেও উত্তর দিল: ভ্যাখো, মায়ের নামে যা-তা বলো না ছেলের কাছে। খোকা ভাববে অমন দুর্ধর্ষ 'স্বদেশী' তুমি, তুমি কি আর বাজে কথা বলবে! চলো, খোকা, খেতে বসবে। এসব আর শুনতে হবে না।—বলিয়া ইন্দ্রাণী যাইতে যাইতে অমিতকে বলিল, পালিয়ো না যেন অমিত। এনেছি যখন,—তুমি পথও চিনবে না,—পৌঁছে দিয়ে আসব আমিই তখন বড় রাস্তার মোড়ে।

ঘরের মেজের দিকে তাকাইয়া অকারণে আপনার মনে হাসিতে লাগিল অমিত। তাহা হইলে জীবনের একটা পরীক্ষায় সেও উত্তীর্ণ হইয়া গেল। অবশ্য মাত্র প্রথম দিনের পরীক্ষা। কিন্তু প্রথম দিনই প্রধান দিনও। হয়তো পরীক্ষাও ক্রমে আর পরীক্ষা থাকিবে না। কিন্তু অমিতেরই কি পরীক্ষায় বসিতে হইবে—বার বার? এই তাহার ভবিষ্যৎ?

ইন্দ্রাণীর দেহচ্ছায়া ঘরে পড়িল, অমিত মুখ তুলিল। ইন্দ্রাণী বলিল: হাসছিলে যে, কি ভাবছিলে?

* অমিত দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, ভাবছিলাম ভবিষ্যৎ।

কি ঠিক করেছ ?

জানি না।

ইন্দ্রাণী স্থিরভাবে দাঁড়াইল : এত দিনেও জানতে পার নি—তবে জেনেছ কী ?

যা জানতাম তাও অসামান্য—আমি ইতিহাসের হাতিয়ার। আর যা জানতাম না তাও জানলাম পথের উপরে আজ এক মুহূর্তে এই সন্ধ্যায়—দেখলাম তা আরও অসামান্য—আমি শুধু হাতিয়ার নই, আমি মানুষ—

এর বেশি কী জানতে চাও ?

অমিত স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল ইন্দ্রাণীর চক্ষের দিকে।

চলো,—বলিয়া সুইচ টিপিয়া আলো নিবাইয়া দিল ইন্দ্রাণী। বাহিরের আলোর কোমল আভা ঘর ছাইয়া দিয়াছে। বাহিরের দিকে পা বাড়াইয়া ইন্দ্রাণী বলিল, ছ্যাখো, আমার চল্লিশ টাকার ফ্ল্যাটের এই ছাদ—আশ্চর্য নয় ? ঘরের থেকে কি কম এর দাম ? যদি কোনো রাত্রিতে উঠে আসতে বুঝতে। দেখতে এই ছাদের দাম আদায় করে তারার আলো মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—কে, চিনতে পারতে তাকে ? না, তোমার নিয়তি নয়, সে আমার নিয়তি। সে পথের বাঁকে অপেক্ষায় থাকে না—ঘরের কোণে, ছাদের সীমানায়, অনন্ত রাত্রি ধরে সে আমাকে জানায়—কি জানায় জানো ? বড় ভাগ্যবতী তুমি, ইন্দ্রাণী। আনন্দ করো—এমন পৃথিবীর সীমানায় তোমরা আজ এসেছ যখন মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় বন্ধনহীন গ্রন্থিতে বাঁধবার দিন এসেছে। জানো, অমিত, কি বলে আমাকে আমার নিয়তি-নক্ষত্র ?

শুনি ?

ঘরের বাঁধনে বাঁধবার মানুষ নও তুমি, অমিত। তুমি, পথের বন্ধুত্বে পাবার মতো মানুষ।

অমিত চমকিত হইল : কি করে জানলে তুমি ?

জানলাম,—হাসিল ইন্দ্রাণী,—আমার পোড়াকপাল বলে। তোমাকে দেখেছি, চিনেছি, বুঝেছি আর ছাড়তে পারব না বলে। পথে বেরিয়ে

পড়লাম বলে। জানলাম—ভালোবাসা শুধু গৃহের নিভৃতিতে একান্ত উপভোগের মধ্যে একালে আর সীমাবদ্ধ থাকবে না, পথে পথেও আজ জীবন-রচনা করবার দিন এল পথচারী শতাব্দীর মানুষের।—চলো এখন।

কোথায়? পথে?

পথের বাঁধনেই ইন্দ্রাণী তোমাকেই গ্রহণ করবে।

ইন্দ্রাণী দুয়ারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরের সে স্বল্পপরিসর ছোট ঘর। বলিল: কোনো আয়োজন নেই তোমার জন্য। হগ সাহেবের বাজারে যাবার সময় ছিল না। জগুবাবুর বাজারই তোমার মর্যাদা রাখুক—বাঙালী ফুলের বাঙালী মালা দিয়ে।

কাগজের মোড়ক খুলিয়া ইন্দ্রাণী এক গাছি যুঁই ফুলের মালা বাহির করিল। অমিতের বুক অপূর্ব আনন্দে দুলিতেছে। ইন্দ্রাণী বলিল: শুকিয়ে যাবে মালা কাল সকালে। আজকের মতো তবু এ নিয়েই পথ চলো, কাল ফেলে দিয়ো পথের ধুলোয়।

সময় নাই, ভাবিবার সময় নাই, আত্ম-পরীক্ষার কোনো অবসর নাই। অভাবনীয়া ইন্দ্রাণী, অনিবার্য তাহার গতি। তাহার দুই সুন্দর বাহু উর্ধ্বে উঠিয়া আসিয়াছে—অমিতের দুই চক্ষু নিমীলিত হইয়া গিয়াছে, কণ্ঠে মালার স্পর্শ লাগিল। রূপে, গন্ধে, অদ্ভুত ইন্দ্রিয়ানুভূতির মোহে অমিতের সমস্ত চেতনা মথিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। ভালো করিয়া আপনার কথাকে সে রূপ দিতেও যেন পারে না আর। বলিল: তোমার কাছেই জমা রইল আমার এই সত্য। এ জীবনে অমিতকে আত্মস্বীকৃতির অবকাশ তুমি দিয়েছ; আমাকে মুক্ত করেছো আমার আত্মাভিমান থেকে।

কম্পিত কণ্ঠে, কম্পিত করে অমিত ইন্দ্রাণীর গলায় মালা পরাইয়া দিল, আর দুই হাতে তুলিয়া লইল তাহার দুইখানি কোমল কর।

তোমার হাতে নিজেকে তুলে দিলাম আজ—স্বেচ্ছায়, অমিত;—এই আমার গর্ব।—শান্ত নিরুদ্বেল কণ্ঠে বলিল ইন্দ্রাণী।

এতদিনকার নারীসম্পর্কহীন জীবনের সমস্ত বিস্ময়, চক্ষুর সমস্ত আকূতি, হস্তের, ওষ্ঠের, হৃদয়ের সমস্ত কামনা অমিতের ব্যাকুল বিপর্যস্ত দেহের তটে

তটে জোয়ার তুলিয়া দিল। স্মৃতির গহন তল হইতে গুঞ্জরিত হইয়া উঠিল প্রাণলীলার শাশ্বত স্বীকৃতি—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥

আর কোনো ভাষা, আর কোনো বাণী বুঝি অমিতের অন্তর্বেদনাকে প্রকাশ করিতে পারে না।...

ইন্দ্রাণীর দুই চক্ষুতে স্মৃতির স্বপ্নচ্ছায়া...পুরীর উদ্বেলিত সমুদ্র তরঙ্গের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেছে তাহাদের চেতনা। মাথার উপরে ভাঙিয়া পড়িতেছে এবার জীবনের অযুত-ফণা আলিঙ্গন।...'অমিত'—সে যেন তাহার কণ্ঠস্বর ছিল না, ছিল তাহার রক্তকণাব উদ্বেল আহ্বান।

ভাঙ্গিয়া-পড়া এই স্মৃতি-তরঙ্গের মধ্যখানে দুইজনায় দাঁড়াইয়া আছে চোখে-চোখ রাখিয়া আজ।...

কি বলিতে চাহিতেছে অমিতের স্ফুরিত অধর?—হয়তো কবিতা, হয়তো কবিতা নয়, কিন্তু জীবনের বেদমন্ত্র। ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি তাহার মুখের উপর হাত রাখিল,—এক নিমিষেব মতো মাথা রাখিল অমিতের বুকের উপর। তারপর মাথা তুলিয়া দুই হাত ধবিয়া বলিল, চলো।

দ্বার খুলিয়া সিঁড়িতে পা বাড়াইবে দুইজনা—ইন্দ্রাণী খুলিয়া রাখিল গলার মালা। প্রাণেব মাদকতা ছাপাইয়া পড়িতেছে অমিতের দেহ ও চেতনায়...

My desire and thy desire
Twining to a tongue of fire,
Leaping live and laughing higher.

Thro' the everlastiug strife
In the mystery of life.

অমিত বলিল: ইন্দ্রাণী, নিয়তি দুর্বার।

ইন্দ্রাণী বলিল: নিয়তির থেকে দুর্বার মানুষ।—তোমার নিয়তির

অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ তুমি। এই সত্যই ইন্দ্রাণীর নিয়তি জানিয়েছে সেই দর্পিতা হতভাগিনীকে।…

চলো!—স্বপ্নময় নীরবতা ভাঙিয়া সিঁড়িতে ইন্দ্রাণীই প্রথম পা বাড়াইল।

কোথায়? পথে?…

Thro' the everlasting strife

In the mystery of life …

হাত তখনো ইন্দ্রাণীর হাতে। অমিত বলিল: আবার কবে দেখা হবে, ইন্দ্রাণী?

ইন্দ্রাণী বলিল: যখন সময় হয়—পথের ভিড়ে, তারা-ভরা নিঃসঙ্গ রাতে—।

সম্মুখে ফুটপাত। একবার দাঁড়াইল দুইজনা। ফুটপাতে পা বাড়াইল অমিত। এবার সে প্রথম বলিল: আর না, এবার যাও, ইন্দ্রাণী।

যাব?—ইন্দ্রাণী শান্তকণ্ঠে কহিল।—আচ্ছা। ইন্দ্রাণী দাঁড়াইয়া পড়িল। হাত ছাড়িয়া দিল। একমুহূর্ত চোখের উপর চোখ রহিল।

যাও, অমিত।

আর ফিরিয়া তাকাইল না অমিতও। একজোড়া চক্ষু যে তাহার পশ্চাতে জীবন্ত দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া রহিয়াছে তাহা কি সে জানে না?

২

আকাশের নক্ষত্র হইতে পথের ধূলিকণা পর্যন্ত সমস্ত ভুবন আজ মুখ বাড়াইয়া দিয়াছে অমিতের দিকে, মাথা হইতে পা পর্যন্ত দেহের প্রত্যেকটি অণুকণায় তাহাদের নৃত্যোল্লাস। অমিত সমস্ত প্রাণ দিয়া বলিতে চায়, 'শোনো শোনো, বিশ্বজন, অমৃতের সন্তান আমরা।' আর, অমিত চিৎকার করিয়া বলিতে চায়—'শোনো, শোনো, পৃথিবীর মানুষ, সূর্য চন্দ্র তারকাকেও যে সত্য সমুজ্জ্বলতা দেয় আমি তাহাকে জানিয়াছি—ইন্দ্রাণী আমাকে ভালোবাসে, পৃথিবী বড় সুন্দর, মানুষ অপরূপ!'

কিন্তু এই পৃথিবী বড় ছোট,—অমিত্ত আবার নিজেকে না বলিয়া পারে না—আজিকার রাত্রির পক্ষে এই পৃথিবী বড় ছোট, অমিত। সপ্ত-সমুদ্রের বন্ধনে-বাঁধা এ পৃথিবী বড় সীমাবদ্ধ। তাহার দিগ্‌দিগন্তকে ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া উড়াইয়া দিবে এই সত্য 'ইন্দ্রাণী অমিতকে ভালোবাসে'। তাহার কূল ছাপাইয়া সেই সত্য মহাশূন্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবে, তারায় তারায়, নব-নব গ্রহনক্ষত্রের মালায় কাঁপিবে। অনন্ত মহাশূন্যের বায়ুতরঙ্গের মধ্যে বহিবে এই বাণীতরঙ্গ: 'ইন্দ্রাণী তোমাকে ভালোবাসে।' এই কানে কানে বলা কথা রহিয়া যাইবে নিখিলের কানে। বায়ুতরঙ্গ হইতে কী শুনিতেছে ইহারা? বেতারের বক্তৃতা! জানে না আকাশে আজ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে কী গুঞ্জরণ— ইন্দ্রাণী তোমাকে ভালোবাসে।' কোটি কোটি যুগের শেষেও মানুষের কোন সে বায়ুতরঙ্গে কান পাতিয়া এই সত্য শুনিবে। আর পথযাত্রী মানুষের চোখের পরে চোখ রাখিয়া এমনি করিয়াই এই নক্ষত্রলোক বলিবে,— এমনি করিয়াই ধরণীর অবলুণ্ঠিত ধূলিজাল সেই যাত্রী-মানুষের পদচুম্বন করিয়া বলিবে, 'তোমাদের ভালোবাসার পথ তৈরি করিয়া গিয়াছে অমিত ইন্দ্রাণীও— কলিকাতার এক পথপ্রান্তে এক শরতের সায়াহ্নে, চোখের দৃষ্টিতে, করের কম্পিত স্পর্শে, আর জীবন-স্বীকৃতির সানন্দ সাহসে।'...মানব-প্রেমের একালের এই নীহারিকা-স্রোত একদিন তারপর জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে দানা বাঁধিয়া উঠিবে।—সেই দিন কেহ জানিবেও না—উহার মধ্যে এই আবর্তিত দুইটি জ্যোতিঃকণাও মিশিয়া থাকিবে, ধন্য হইবে পূর্ণ হইবে।...

কেহ জানিবে না, কেহ জানে না। জানে না বাসযাত্রী ইহারা, জানে না পথের অপরিচিত এই পথিকেরা। জানে না এই গলির বহু পরিচিত প্রতিবেশীরা কেহ। একটি সন্ধ্যার দুইটি মানুষের এই জীবন-স্বীকৃতি অসীমের অঙ্গীকারের মধ্যেও রহিবে এমনি করিয়াই ব্যাপ্ত হইয়া, মিলাইয়া গিয়া—শাশ্বত হইয়া, পূর্ণ হইয়া।...

এত দেরি করছিলে কেন, দাদা,—দুয়ারে না পৌঁছিতেই দুয়ার খুলিয়া গেল। বুঝি পথ চাহিয়া অনু অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। মুক্ত দ্বারপথে এক

ঝলক আলোক আসিয়া পড়িল অমিতের চোখে-মুখে। আলোকে ও অনুর সম্বোধনে অমিত চমকিত হইয়া উঠিল। তাই তো, কখন সে কলিকাতা শহরের দীর্ঘপথ ও ছোট গলি, পথের নানা মানুষের ভিড় ও বাসের নানা মানুষের মুখ, সব পিছনে ফেলিয়া অভ্যাসমতো বাড়ির দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে আর দুয়ার খুলিয়া দিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে—মা নয়,—অনু। মায়ের মতো একটু উদ্বেগ, একটি অনুযোগ তাহার কণ্ঠেও।—এত দেরি করছিলে কেন, দাদা!

দেরি? হাঁ, দেরি হয়ে গেল।

ততক্ষণ অনু গৃহালোকে দেখিতেছে তাহার দাদার স্বপ্নাবিষ্ট মুখ—চক্ষু উদ্‌ভ্রান্ত, মুখ আরক্ত, কণ্ঠস্বর সদ্য সুপ্তোত্থিত।

কি, দাদা, কি হয়েছে?—অনুর মুখ হইতে এই উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা বাহির হইয়া পড়িল।…

কে বলিল, কেহ জানে না? জীবনের স্বীকৃতি শুধু দুইটি মানুষের চেতনার তলেই সীমাবদ্ধ, ইহা কে বলিবে? এই তো, অনু সেই সত্যের সংকেত পড়িয়া লইয়া অমিতের সম্মুখে এখনি দাঁড়াইয়াছে।…কিন্তু অমিতের এইবার একান্ত নিভৃতির বড় প্রয়োজন। সে ভাবিতে চায়, অনুভূতিকে বুঝিয়া লইতে হইবে। আপনাকে সংহত করিবার, সংযত করিবার শক্তিও তো দরকার। ইতিমধ্যেই অমিত তাহা সংগ্রহ করিয়া ফেলিতেছে।

অমিত আগাইয়া আসিয়া বলিল: কেন, অনু? খুব ভাবছিলে, না—'দাদা আবার শুরু করলে আগেকার মতো?'—বলিতে বলিতে অমিতের কথা সহজ হইতেছে।—এক জন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, অনু। কিছু হয়েছে নাকি, অনু?

নিজের উৎকণ্ঠা ও অনুযোগে অনুই এইবার লজ্জিত হইল। বলিল: না, না। বাবা অবশ্য দুবার তোমার খোঁজ করেছিলেন। এক-একবার কি ভেবে এ ঘরে তাকান, আবার ভুলে যান। পরে আবার বলেন, 'আপিসে গিয়েছে অমি', না? থাক, থাক। কিছু বলিস না অমিকে। ওর অনেক কাজ। বাধা দিস না। বাধা দিস না।—রাগ করবে অমি'। বাবা ধরে বসে আছেন

সেই আগেকার দিনের কথা—খবরের কাগজে তোমার দুপুর থেকে কাজ। তোমায় বেশি খোঁজ করলে তুমি বিরক্ত হবে।

সিঁড়ি দিয়া দুইজনে উঠিতে লাগিল।·· স্বপ্ন কল্পনা, উড্ডীয়মান চেতনা যেন এইবার এক সৌরলোকে প্রবেশ করিতেছে। এখানকার বায়ু, এখানকার আলোককেও অমিত কম সত্য বলিয়া অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু সাধ্য কি, যে নব সৌরলোকের মাদকতাময় আলো ও সুর সে বুক ভরিয়া লইয়া আসিয়াছে তাহাও সে গ্রহণ না করিয়া পারে? সেই সুতীব্র অনুভূতি এখনো তাহার হৃদয়ে স্পন্দিত হইতেছে। আবার, এই আজন্মের অনুদ্বেল মমতাও তাহার চোখে মুখে এ সংসারের সহজ মায়া মাখাইয়া দিতেছে।··· অসামান্য অভিজ্ঞতার জন্য অমিতের নিভৃতি চাই; আবার সহজ সাধারণ কথাও চাই অভ্যস্ত পৃথিবীর জন্য।

সহজ সুরে অমিত বলিল: বাবা জেগে আছেন?

এইমাত্র খাইয়ে দিয়েছি। শুয়ে পড়েছেন।

কিন্তু, এই পুরাতন পিতামাতা ভ্রাতা ভগ্নীর পৃথিবীতে অমিত-ইন্দ্রাণীর জগতের নতুন সত্যকে অমিত কেমন করিয়া ঘোষণা করিবে? কাহার নিকট ঘোষণা করিবে? কি করিয়া বুঝাইবে,—'তোমাদের পৃথিবী আমি ছাড়াইয়া চলিয়াছি,—অস্বীকার করিয়া নয়, নতুন সৌরলোকের বাণী শুনিয়াছি বলিয়াই।' কিন্তু অমিতের 'বিদ্রোহে', 'বিচ্যুতিতে' আহত হইবার মতো হৃদয়ই বা কোথায়? মাতা নাই, পিতা জরাগ্রস্ত,—কে আহত হইবে? মনু? অনু?

অনু বলিল: সন্ধ্যায় অনেকে এসেছিলেন দাদা, সকলে চলে গিয়েছেন। তথাপি বসে আছে শুধু শ্যামল—তোমার বইপত্র দেখছে, তোমার সঙ্গে দেখা না করে যাবে না। এখনি যেতে হবে ওকে ভবানীপুরের ফিরে।

কে শ্যামল? ওঃ, সেই তোমাদের ছাত্র সমিতির নেতা। চলো, চলো।

অমিত নিভৃতি চাহিয়াছিল। অনন্ত আকাশ ও অনন্ত অনুভূতির মধ্যে আজ এই সন্ধ্যায় সে ডুবিয়া থাকিতে চায়। কিন্তু শ্যামল বসিয়া আছে—সেই শ্যামল, অনুর যে বন্ধু। আর অমিতের মনে নতুন ঔৎসুক্য উঁকি মারিল, এক টুকরা নতুন আলো যেন চিন্তাচ্ছন্ন চেতনার দুয়ারে।

অনু জানাইতেছিল, মোতাহের সাহেবও রয়েছেন। আরও অনেকে কিন্তু চলে গিয়েছেন দাদা। কানাইর মা এসেছিল কালীবাড়ির নির্মাল্য নিয়ে, তোমার ঘরে রেখে গিয়েছে। রাতে চোখে দেখে না. বাসে যাবে কি করে? মিনতিদি আর ইন্দ্রাণী বউদি কাল সকালে আবার আসবেন। যুগল গুপ্ত আর তার বোন বুলু—খবর পাঠিয়েছেন। সুধীরাদি জানতে চেয়েছেন—আসা ঠিক হবে কিনা, না, পুলিশের উৎপাত আছে। মৈত্রেয়ীটা আব বসলো না—হস্টেলে থাকে কিনা।—অমিত শুনিতে শুনিতে ঘরে প্রবেশ করিল।

অনু ঘর গুছাইয়া ফেলিয়াছে। এ যেন অন্য ঘর। কিন্তু তাহা দেখিবার সময় জুটিল না। মোতাহের আগাইয়া আসিয়াছে—মুখে একটু সংযত হাস্য। পুরাতন বন্ধুর মতো অমিত তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। রোদে-পোড়া সেই ময়লা রঙের বাঙালী যুবক। একদিন খিদিরপুর ডকের মজুর আপিসে তাহাদের আলাপ-আলোচনা হইত। বন্ধুত্ব হয় নাই; কিন্তু মোতাহেরকে বুঝিবার মতো অবকাশ অমিতের তখনও হইয়াছিল। তাহা সকলেরই হয়—মোতাহের স্পষ্ট মানুষ। তাহার মনে দ্বন্দ্ব সংশয়ের অবকাশ নাই, শ্রেণীশত্রু বুঝিলে নিষ্কলুষ চিত্তে তাহাকে আঘাত করিতে পারে। হয়তো সেই ঐকান্তিকতার জন্যই তাহাকেও অমিতের মতো অবরুদ্ধ হইতে হইয়াছিল।

অনু বলিল: শ্যামল,—এই দাদা।—আর দাদাকে অনু জানাইল: এই শ্যামল রায়।

ছিপছিপে গড়নের একটি যুবক দুই হাতে অমিতকে নমস্কার করিল। রঙ ফরসা নয়। কিন্তু দেহে চোখে মুখে নাকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সক্রিয় চিত্তের ছাপ আছে; বেশভূষায় রুচিবোধ আছে; আর হাস্যে ও কথায় এখন ফুটিল সপ্রতিভ আত্মীয়তা।

অমিত কেমন চমকিত হইল। এমনি বয়সের যুবক ছিলো সুনীল···

অমিত সবলে নিজেকে সংযত করিল। পথ নয়, ইহা তাহার গৃহ;—ইন্দ্রাণী-অমিতের জগৎ নয়, পুরাতন পৃথিবীর; এবং সেই সঙ্গে যেন আরও একটি নতুন পৃথিবীও৷ চিরদিনের মধ্যে একটা অন্যদিন·· আবার।

অমিত সস্নেহে শ্যামলকে সম্ভাষণ করিল: এখনি যাবে? আচ্ছা, একটু,

দু'মিনিট বসো। তারপর মোতাহেরকে বলিল : খবর পেলে কি করে, ভাই মোতাহের?

এঁরাই বলেছেন—এই শ্যামলবাবু।

বেশ। তুমি কিন্তু বসবে মোতাহের। আগে শ্যামলের সঙ্গে পরিচয় করি, তাড়াতাড়ি এ যাবে। তোমার সঙ্গে কথা আছে—আর কাজও। হয়তো আজ তা শেষ হবে না—বলিয়া অমিত মোতাহেরকে বসাইল।

শ্যামলই প্রথম কথা কহিল : কেউ আমরা জানিই না আপনারা মুক্তি পেয়েছেন—

অমিত তাড়াতাড়ি তাহার এ ভুল দূর করিতে চাহিল : 'আপনারা' কোথায়? বহুবচন নয়, একবচনই।

শ্যামল অপ্রতিভ হইল না, বলিল : আমি আপনার কথাই বলছি। আরও অনেকে জেলে রয়েছেন, আপনি সেই জন্য ভাবছেন। আমরা কিন্তু ভাবি না—এবার আসবেন তাঁরাও সকলে।

সকলে আসবেন? তারা কিন্তু এ ভরসা তত পাচ্ছে না।···

আর সকলেই কি আসিবে?···আসিবে সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়?·· আসিবে সুনীল দত্ত? ··

ইন্দ্রাণী অমিতের জগতের পরে আর-একটা জগতও আবার উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল কাঁটাতারের ও উচ্চ প্রাচীরের, সান্ত্রীতে ঘেরা আর শ্রান্তিতে বিষাক্ত; বহু বহু হৃদয়ের রক্তে ও প্রতীক্ষায় গম্ভীর। প্রতিদিনের নানা আদান-প্রদানে তাহাও অমিতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য।

আমরা তাদের আনবই – শ্যামল সগর্বে বলিল, যেন কোনো একটা সভায় তাহাদের প্রস্তাব ঘোষণা করিতেছে।

তোমরা?—একটু হাসি ফুটিল অমিতের চোখে। ফজলুল হক নয়, নাজিমুদ্দীন নয়, গান্ধীজীও নয়—ইহারা! অমিত একবার মোতাহেরের দিকে তাকাইল। কিন্তু মোতাহের হাসিল না।

হাঁ, আমরা ছাত্ররা। বিশ্বাস করছেন না? কিন্তু দেখবেন। আপনাদের মুক্তির দাবিতে আরও বড় 'ডিমোনস্ট্রেশন' বের করব, আরও বড় সভা আমরা

অর্গ্যানাইজ করবো। এ্যাসেম্‌বলি ঘিরে বসবো, না হয় আরম্ভ করব 'ম্যাস্ অ্যাক্‌শন'। বাঙলা দেশের জনমত আমাদের পিছনে। ছাত্রশক্তিকে রুখতে পারে এমন সাধ্য কারো নেই।

অমিতের মুখে হাসি ফুটিল না। 'ডিমোনস্ট্রেশন', 'অর্গ্যানাইজ', 'ম্যাস অ্যাকশন' তাহার চোখে এই জগৎটা নতুন প্রকাশিত হইতেছে। সমস্তটা অদ্ভুত ঠেকিল—এই ভাষা, বক্তব্য বলিবার ভঙ্গি, সবই যেন নতুন। পরিচ্ছদে এমন রুচিশীলতা এমন বাকপটুতা, এমন উচ্চকণ্ঠে জোর দিয়া মত জাহির করা —এইসব ইহার পূর্বে এই দেশের তরুণ সমাজে কোথায় ছিল ? সেদিন ছিল মন্ত্রগুপ্তির যুগ। শুধু মিতভাষণ নয়. মৌনতাই ছিল সেদিন সংকল্পের, দৃঢ় চরিত্রের পরিচায়ক।···অন্য দিন আজ, সত্যই অন্য দিন। কেমন স্পষ্ট, সবল, সতেজ ইহাদের কথা। একটু বক্তৃতাভঙ্গী···একটু বেশি আত্মঘোষণাপর ? একটু বেশি অনভিজ্ঞ সরলতা ? তা হউক, তবু ইহা নতুন যুগ,—অমিতের যুগের তুলনায় কেন, স্থনীলের যুগের তুলনায়ও নতুনতর এই যুগ। আর, অমিতের এই যুগকে বেশ লাগিতেছে। সকুতূহলে অমিত দেখিতেছিল, বলিল: শক্তিকে কেউ রুখতে পারে না। কিন্তু আসল কথা—শক্তিটা তোমাদের শক্ত হয়েছে তো ?

দেখবেন ? কাল যাবেন আমাদের কলেজে ? কাল পারবেন না ? বেশ, পরশু যাবেন। ওঃ, ছাত্রদের সভায় যাওয়া আপনার পক্ষে নিষেধ!—শ্যামল শুনিয়া সোল্লাসে বলিল: দেখছেন, ওদের যত ভয় ছাত্রদের। বেশ, তা হলে আপনারা সবাই বেরিয়ে আস্থন আগে। আপনাদেব অভিনন্দন দোবই—দেখি কে বাধা দেয়। কলেজের কর্তারা ? কেন, কলেজ কার ? আমাদের, না 'গভর্নিং বডির' উকিল আর ফড়েদের ? প্রিনসিপাল আপত্তি করবেন ? কেন ? কলেজ কি তাঁব, না, আমাদের ? 'প্রোপাইটার' ও 'কলেজ বোর্ডের' সম্পত্তি কলেজ, না, সম্পত্তি দেশের ও জাতির ছাত্রের ও শিক্ষকের ?

বাঃ, চমৎকার একটা নতুন জগতের নতুন ধারার যুক্তি। অমিত কলেজে পড়িয়াছে। কলেজে পড়াইয়াছেও। এতদিন জানিত—সেখানে স্বাধীনতার কথা ইতিহাসে পড়া চলে, কিন্তু তাহা লইয়া আলোচনা করা চলে না। কারণ,

স্থানটা শত্রুশিবির, সাম্রাজ্যবাদেরই 'গোলাম-খানা'। কিন্তু আজ দেখিতেছে ইহারা ধরিয়া লইয়াছে কলেজ কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়; পুলিশের খাশমহল—নয়; তাহা জাতির ও জাতির ছাত্রদের।···অন্য দিন আজ, অন্য দিন···এযুগের দৃষ্টির কথা ভাবিতেছিল না অমিত দূরে বসিয়া? কে বলিল তাহা মিথ্যা? এই তো এই যুগের দৃষ্টি—এই যুগের মানুষের চক্ষে। ইহারা আরও একটু অগ্রসর হইবে, এই যুক্তিসূত্রেই আরও একটু আগাইয়া যাইবে, আর জানিবে—কলেজ তাহাদেরই সম্পত্তি আসলে যাহারা কলেজের ত্রিসীমানায়ও পা দিতে পারে না; তাহারাই জোগায় লেখাপড়ার খরচ লেখাপড়া হইতে পুরুষানুক্রমে যাহারা বঞ্চিত।

স্বাভাবিক আনন্দ কৌতূহলে আবার অমিত স্বাভাবিক কৌতুকস্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া পাইতেছে···। অমিতের পদদ্বয় তাহার আপনার জগতের সেই পরিচিত মৃত্তিকা স্পর্শ করিতেছে।

অমিত বলিল: এ যুক্তি কর্তারা মানে—বিশ্ববিদ্যালয়ে?

মানতে হবে। আসুন আপনারা ছাড়া পেয়ে, দেখবেন।

শ্যামলের উৎসাহ নিবিবার নয়। কিন্তু রাত্রি হইতেছে অনুই তাহা মনে করাইয়া দিতে ছাড়িল না। শ্যামল বিদায় লইবে,—মোতাহের সাহেবও বসিয়া আছেন। বিদায় লইতে লইতে শ্যামল বলিল, আপনার বইপত্র দেখছিলাম দাদা, আমরা। একটা ইউনিভার্সিটি খুলে বসেছিলেন দেখছি।

অমিত পুলকিত হইল। হাসিয়া বলিল: ফর জেল বার্ডস্। প্রিন্সিপ্যাল গবর্নিং বডির বালাই নেই। একেবারে কমপ্লিট ছাত্র-অটোনমি বলতে পার। যত খুশি পড়ো—অবশ্য পড়তে না চাও তাতেও আপত্তি নেই।

শ্যামল হাসিল। বলিল: তা হলে তো আপনারাই আমাদেরও পথ দেখাবেন এখানে। এবার লীড্ দিন।

'লীড্ দিন'·· সুনীল দত্ত বলিত 'দায়িত্বভার নাও'·· তাহারা জানিত রাজনীতির আসল কথাটা 'নেতৃত্ব' নয়—দায়িত্ব···

শ্যামলকে বিদায় দিতে অনু নিচে নামিয়া গেল।

অমিত মোতাহারকে বলিল: তারপর? বলো ভাই খবর।

মোতাহেরের বিড়িটা শেষ হইতেছিল, নিবাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। ঘরে একটু ছাই পড়িল। মোতাহের তাহা দেখিয়াও দেখিল না। বলিল: আমি বলব কি? আমি খবর শুনতে এসেছি।

আমি খবর কি করে জানব? রইলাম জেলখানায়।

খবর তো এখন সেখানেই। কি হচ্ছে বলো সব।

অমিত আজ এইমাত্র তাহার জীবনের একটা বড় মোড়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সে চাহিতেছিল। সেই নতুন জগতের প্রান্তে বসিয়া একবার দেখিবে, বুঝিবে, উপলব্ধি করিবে। কিন্তু মোতাহেরকে দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন সেই আত্মমুখিতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া সজাগ হইয়া উঠিতেছিল। মোতাহেরের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বদিনের বৃহৎ কর্মজগত যেন অমিতের চতুর্দিকে আবার প্রকাশিত হয়—সেই খিদিরপুর ডক, তাহার মজুর আপিস, মোতাহেরদের চঞ্চল অধীর সংগ্রামশীলতা। এতক্ষণে শ্যামলের সহিত কথা বলিতে বলিতে সে জগতের পথের দিকেই সে আসিয়া গিয়াছে। পূর্বে সে দেখিয়াছে সেদিনের সুনীলকে, দীনুকে, মোতাহেরকে। মোতাহেরও বুঝি তাহার ছয় বৎসর পূর্বেকার পৃথিবীটার সঙ্গে একটা সেতুবন্ধনের সুযোগ করিয়া দিল। আর, নিজে না জানিয়াও অমিতের অন্তরের কৃতজ্ঞতাও সে অর্জন করিল।

অমিত বলিল: জেলের খবর তো জানো। তোমার সামনেই তার সাক্ষ্য—বই, নোট্, লেখা, তর্ক, আলোচনা, দলবাধা, দলভাঙা—দলাদলি। জয় তোমাদেরই। যে-ই যা করুক, সবাই মেনে নিয়েছে তোমাদের তর্ক—সন্ত্রাসবাদের দিন ফুরিয়েছে।

এই মাত্র। তা হলে তো জয় আমাদের নয়, জয় এণ্ডারসনের গবর্নমেণ্টের।

না, না, আরও আছে। কিন্তু সেও তোমাদেরই জয়। আই-বি আপিস আজই জানাল—'সব কমিউনিস্ট হয়ে গিয়েছে'।

আই-বি'র কথা আমি শুনতে চাই নি। তুমি কি বলো, শুনি।

অমিত পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিল না।—হাঁ, অনেকেই কমিউনিস্ট।—অন্তত মতবাদে। কেউ কেউ দল হিসাবেও। আরও অনেকে মনে করে—ম্যাসের মধ্যে কাজ করতে হবে।

মোতাহের আর-একটা বিড়ি ধরাইবার আয়োজন করিল। বলিল : তাহলে তো জয়টা তোমার অমিতদা।

আমার ?—অমিত সবিস্ময়ে বলিল।

মোতাহের জানাইল—সে অমিতের আগেকার কথা বিস্মৃত হয় নাই। বাঙলার বিপ্লবী যুবকদের এইরূপ পরিণতির সম্ভাবনা অমিত পূর্বেই অনুমান করিয়াছিল। জোর দিয়াই সে নিজের সেই মত মোতাহেরের মতো শ্রমিক কর্মীদের নিকট প্রকাশও করিত। কিন্তু তখনো তাহাতে মোতাহেরদের সংশয় দূর হইত না—মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই রোম্যান্টিক যুবকেরা আপনাদের শ্রেণীগত স্বার্থ-সম্পর্ক বিসর্জন দিতে পারে কি ? অমিতের সঙ্গে শেষ যেদিন দেখা মোতাহেরের—সেদিনও এই কথাই দুইজনার হইয়াছিল। তারপর দিনই অমিত বন্দী হয় তাই সে কথাটা মোতাহের বিস্মৃত হয় নাই। অমিতের সেদিনের অন্য মতটাও বিস্মৃত হয় নাই—'স্বাধীনতার প্রয়াসে সম্মিলিত আয়োজন চাই।' সেদিন মোতাহের তাহা মানে নাই। আজ মোতাহেরও জোর দিয়া বলে—সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন করিতে হইবে, ডিমিট্রভের নিবন্ধের পরে ইহাই তাহাদের কর্তব্য। সেদিন অমিত কংগ্রেসেরও পক্ষভুক্ত ছিল ; মোতাহের ছিল কংগ্রেসের বিরোধী। অবশ্য আজ কংগ্রেস গণ-সংগঠনে রূপান্তরিত হইতেছে ; আর ফৈজপুরীর পরে তাহার দৃষ্টি এখন বঞ্চিত শ্রেণীর আর্থিক স্বার্থকেও স্বীকার করিয়া লইতেছে। অমিতের আশা ছিল, এইরূপই হইবে। তাহার আশা ফলবতী হইয়াছে, নিরর্থক ছিল মোতাহেরদের সন্দেহ। তাই মোতাহের বলিল অমিতের জয়,—

অমিত শুনিয়া উৎফুল্ল হইল। তবু বলিল : এখনো ওসব মনে করে বসে আছ নাকি ? তারপরে যে অনেক কাল কেটে গেছে। যুগান্তর ঘটেছে অনেক দেশে। জেলেও অন্যেরা অনেক এগিয়ে গিয়েছে !—শুধু কৌতুক নয়, একটা বিষাদও অমিতের কণ্ঠস্বরে।

কি রকম ?—মোতাহের গম্ভীর সন্ধিগ্ধভাবে প্রশ্ন করিল।

তারা অনেকে আজ মতে কমিউনিস্ট। কেউ কেউ কাজেও।

আর তুমি ? এটাই প্রশ্ন।

স্থনীল দত্ত যেন অমিতের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে…

কি করে জানব? রইলাম তো জেলে,—অমিত স্পষ্ট উত্তর জানে না।

মোতাহের আরও স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিল: সেখানে তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দাও নি?

…স্থনীল দত্ত ইহাই দাবি করিয়াছিল…

অমিত বলিল: তুমি কি জানো না—আমি কোনো বিশেষ পার্টিতেই 'নাম লিখাই' নি?

জানি। আর তাই শুনতে চাই, কেন?—মোতাহেরের কথা স্পষ্ট। তাহাতে সৌহার্দ্যের দাবি আছে, কিন্তু আছে সেইরূপ দলানুবর্তিতার সুস্পষ্টতা। ইহাই বিভূতিনাথের ভদ্র সুকৌশল আলাপে থাকিত না। কিন্তু এই স্পষ্টতা মোতাহেরের প্রকৃতিগত। এই বস্তু দিয়াই মোতাহেরের চরিত্রেরও পরিচয়।

অমিত মোতাহেরের দিকে তাকাইয়া একবার উত্তর দিল: কেন লেখাব নাম তাই বরং তুমি বলো। এটা কি কংগ্রেস, সকল দলের প্লাটফর্ম? চার আনা দিয়ে সই করলেই সভ্য হয়ে গেলাম, সারা বৎসর আর কিছু করি বা না করি যায় আসে না। মুখে একটা 'ইজম্' বললে কি হয়? কাজের মধ্য দিয়ে টিকি কি না-টিকি বাইরে না এলে তা জানা যায় কি?

মোতাহের বুঝিল। একটু নীবব থাকিয়া বলিল, বুঝলাম, অমিতদা। কিন্তু সবাই তোমার এ কথা বোঝে নি—অন্ততঃ জেলে। অমিত সবিষাদে হাসিতে চেষ্টা করিল। বুঝিতে চাহে নাই। স্থনীলও বুঝিতে চাহে নাই—ইহাই বরং সত্য কথা। হয়তো তাহাও সেই বন্দিশালারই একটা গুণ—কাজের অধিকার যেখানে নাই, কর্মশক্তি সেখানে এইরূপ কাজের স্বরূপ লইয়া তর্ক করিয়া করিয়া আত্মক্ষয় করে। মোতাহের অমিতকে নীরব দেখিয়া বলিল: যাক সেসব চুকে গেছে। বাইরে তো এলে, এখন তুমি কি করবে—কি ধরনের কাজ?

যার যোগ্য আমি এবং যার সুযোগ আমি পাই।

অর্থাৎ লেখাপড়ার?

অমিত হাসিয়া ফেলিল।—অন্য কিছুর পক্ষে অযোগ্য আমি—তুমিও একথা

বলো ? আমি কিন্তু মানি না। যে মেয়ে রাঁধে, সে মেয়ে চুলও বাঁধে। তোমাদের যে লেনিন মজুর ক্ষেপায়, সে-ই কলম চালায়,—এ কাজ এত অসম্ভব মনে করো না।

মোতাহের হাসিয়া বলিল, প্রমাণ পেলেই তা মানব। তুমি ভুলে গেলেও আমি তোমার কথা ভুলি নি, তা তো দেখলে। তবে বোমা পিস্তল নিয়ে আমাদের কাজ নয়, কলমই আমাদের বড় হাতিয়ার।—আর গলা, দুখানা পা। কলমটা তুমি চালাতে জানো ; তাতেও চলবে। তার ওপরে গলা আর পা-ও যদি চলে, তা হলে তো কথাই নেই।

কি চলবে, কি চলবে না, তাও বোঝা যাবে কর্মক্ষেত্রে নামলে। কিন্তু তোমার এখন কাজ কি মোতাহের ? এবারকার চটকলের ধর্মঘটের সম্পর্কে কাগজে তোমাব নাম দেখছিলাম একবার।

কোথায় কোন কাগজে ? মোতাহের জানিত না।

মোতাহের জানাইল—ল্যান্‌সডাউন হইতে জগদ্দল এলেকা, দুই পায়ের জোরে চষিয়া ফেলা, আপাতত ইহাই তাহার কাজ। তবে সুযোগ পাইলে মুখ খোলে, গলাও নিনাদিত করে, কথার বীজ বুনিতে চায় সেই পায়ে-চষা ক্ষেতে। অমিত যখন ধরা পড়িল তখন মোতাহের খুঁজিতে লাগিল অমিতের দলের মানুষদের। খুঁজিয়া পাইলও দুই একজনকে। সম্ভবত কেহই তাহারা অমিতের দলের নয়, কিন্তু সবাই বিপ্লববাদী। কে সাঁচ্চা কে ঝুটা, মোতাহের তাহা জানিতে না। কিছুদিনের মধ্যেই তাই তাহাকেও যাইতে হয় অন্তরীণে। বৎসর দুই পূর্ব-বাংলার একটা দ্বীপে কাটাইয়া যখন আবার মোতাহের ফিরিল তখন 'জাহাজীদের' নেতা শরফুদ্দীন জেনেভা হইতে ফিরিয়াছে। ডক মজুরদের আপিসে আর মোতাহেরকে সে জায়গা দিল না। হাওড়ার দাস সাহেব তাহার পূর্বেই একবার পুলিশের জেরায় তটস্থ হইয়া কলিকাতা ছাড়েন। এখন কানপুর না গোরখপুরে একটা চিনির কলের তিনি স্যুগার টেক্‌নোলজিস্ট—চিনির কল এই কয় বৎসর দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। একমাত্র বাঙলা দেশেই তাহা সামান্য। কিন্তু শরফুদ্দীন তখন মোতাহেরের বিছানাপত্র মজুর আপিস হইতে দালাল লাগাইয়া টানিয়া বাহিরে ফেলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিল। জাহাজীদের

বলিয়া দিল,—'টেরিটিবাজারের মধ্যে সিতের চালানির কারখানায় কয়লা তাহাদের মোতাহের ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠাঁই লইয়াছে নারকেলডাঙার একটা ঘরে। কাজ করে এই সেখান হইতে শুরু করিয়া জগদ্দল হাজীনগর পর্যন্ত চটকলের চক্রে।

খাওয়া-পরা ?—অমিত জিজ্ঞাসা করিল।

নিজেরাই জোগাড় করতে হয়।

অমিত বলিল, পার্টি থেকে পাও না ?

থাকলে পেতাম।

মোতাহের মিথ্যা বলিবার মতো লোক নয়, কিন্তু তবু অমিতের বিশ্বাস করিতে কষ্ট হয়। অর্থাভাবে 'স্বদেশী বিপ্লবী'দের ডাকাতির পথ ধরিতে হয়, —অমিত সে পদ্ধতি অবশ্য কোনোদিন অনুমোদন করিতে পারে নাই। কিন্তু বলিতেও পারে নাই অন্য কোথা হইতে টাকা আসিবে। সংগঠনের জন্য মস্কো টাকা পাঠাইলেও তাহাতে অমিত মোটেই আপত্তির কারণ দেখিত না। না হইলে কি সংগঠকরা ডাকাতি করিবে ? শ্রমিক-সংগঠকদের যদি শ্রমিকের পার্টি বা শ্রমিকের সংগঠন ভরণ-পোষণ না করে তাহা হইলে কি উপায়ে কর্মীরা কাজ করিবে ?

মোতাহের জানাইল : করবে না। কাজ যদি করতে হয় খেয়ে বা না-খেয়ে করবে। যাদের সংগঠন তারাই ক্রমে তাদের সংগঠকের ভরণ-পোষণ করবে। পার্টির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে লাভ হবে না। 'মস্কো গোল্‌ডের' প্রত্যাশা যে করে সে দূরে থাকাই ভালো। বরং ব্রিটিশ গোল্‌ড সে পাবেও সহজে, নেবেও দু'হাতে।

অমিত বুঝিল মোতাহের তাহার ও অন্য অনেকের সুপরিচিত বিশ্বাসের উত্তর দিতেছে। অমিত অবশ্য মানিত না—মস্কো গোলড ছুঁইলেই কর্মীদের জাত যাইবে। কিন্তু সাধারণের সন্দেহ তাহাতে বদ্ধমূল হইত। এমনিতেই কি তাহা বদ্ধমূল নয় ? মোতাহের হয়তো সত্যই বলিতেছে। অন্তত সে যাহা জানে তাহাই বলিতেছে, ইহা অমিতের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু তাই বলিয়া কে মোতাহেরের কথা বিশ্বাস করিবে ? আর কর্মীরা খাইতে পরিতে না পাইলে ইহাদের পার্টির কাজ কি করিয়া চলিবে ?

অমিত বলিল: তা হলে 'স্টার্ভ এ্যাণ্ড ওয়ার্ক', এই তোমাদের মতো?'

মোতাহের উত্তর দিল: না। 'ওয়ার্ক—স্টার্ভ অর নট।' তাছাড়া চলবে না।

অমিত চুপ করিয়া রহিল। মোতাহের হাসিয়া বলিল: কি অমিতদা, পছন্দ হল না কথাটা?

অমিত হাসিয়া বলিল, কি করে হবে? এতদিন ছিলাম জেলে—মানে, ছিলাম ঘর-জামাই। ছাখো, একঘর জিনিস সঙ্গে এসেছে, দেখে কার না হিংসে হয়? তখন শুনেছি সবকারী হুকুম, 'খাও। তুমি কাজ করো আর না করো, খাও।' অবশ্য যা খেতে পেতাম জেলের নিয়মে দুর্মূল্য হলেও তা অখাদ্য; তবু তার পরিমাণের অভাব ছিল না। আর তখন না-খেলে? তারই নাম 'হাঙ্গার স্ট্রাইক'। জেল কোডের মতে তা 'বিদ্রোহ'। না খেয়েছ কি পেয়েছ শাস্তি। এখন তোমবা একেবারে উল্টো হুকুম দিচ্ছ—'ওয়ার্ক—স্টার্ভ অর নট।' আর 'ওয়ার্ক' বলছ, কিন্তু সে 'ওয়ার্ক' যে কি তারই ঠিকানা নেই।

মোতাহের পরিহাস বোঝে। জানাইল: আছে। প্রথম ওয়ার্ক,—ঘোবো,—ভোঁ, ভোঁ, টো-টো,—দুপায়েব পবীক্ষা। তারপরের ওয়ার্ক—বকো, মানুষ পেলেই মুখ খুলবে, বক-বক কববে। তৃতীয় ওয়ার্ক—বৈঠক বসাও, সওয়াল তোলো, সভা মিলাও, ভাষণ দাও। চতুর্থ ওয়ার্ক—মিছিল করো—দাবি তোলো। পঞ্চম ওয়ার্ক—ইশতেহার লেখো, ইশতেহার বাঁটো। আব সব ওয়ার্কের সেরা ওয়ার্ক—হরতাল বাধাও, স্ট্রাইক চালাও। হাঁ, স্ট্রাইক এখন বাধে, অমিতদা, মজুবেবও মাথায় সে খেয়াল জুটছে। নিজেকেই তারা প্রশ্ন করে—তার নাফা কি হল? বাবুলোকেরা ভোটের জন্য দৌড়াদৌড়ি করে 'স্বরাজ' আনছে, কিন্তু তাতে মজুরের ফয়দা কি?

মোতাহেরেরও বুঝি মুখ খুলিল, সে ভুলিয়া গিয়াছে এটা চটকলের বৈঠক নয়। অমিত সাগ্রহে, সকৌতুকে শুনিল—মজুর কেন্দ্রের মজুর ভোট-দাতার নানা বাধা। তাহাদের নাম ভোটারের তালিকায় ওঠে না, ভোটের কেন্দ্রেও তাহাদের ঢোকা প্রায় দুঃসাধ্য। অবশ্য ভোটের বাকস দিয়া

মজুরের মুক্তি আসে না, আসে শাসকদের ক্ষমতা ভাগাভাগি, তাহা আর অমিতকে বলা নিষ্প্রয়োজন। তবু ভোটের ফাঁকটাও ফাঁক। আর সেই ফাঁকেও এবার যেটুকু হাওয়া বহিয়াছে, তাহাতেও উড়িয়া গিয়াছে কয়েকটা পুরাতন শকুনি। শরফুদ্দীনকে হটানো যায় নাই, আরও দুই-একজন রহিয়াছে। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নাম ভাঙাইয়া খায় যে বাস্তুঘুঘুগুলি সেই সুবিধাবাদীরাও এই সুযোগে কিছু কিছু আসিয়াছে। কমিউনিস্ট পার্টি তো বে-আইনীই। মীরাট মামলার পরে এখনো তাহাদের দাঁড়াইবার মতো অবস্থা হয় নাই। মজুরের নিজের পার্টি প্রকাশ্যে এখনো মজুরের কাছে তাই উপস্থিত হইতে পারে না। তবু মানুষের চেতনায় নতুন নতুন বোধ জাগিয়াছে। আর তাই এই অসম্ভব প্রতিকূল অবস্থা ঠেলিয়াও এখানে-ওখানে মজুরের খাঁটি প্রতিনিধিও দেশের সামনে আসিয়া এবার দাঁড়াইয়াছেন। ইহা শুধু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, ইহা বাঙলার মজুর আন্দোলনের ইতিহাসেরও এক নতুন সূচনা। মজুর আপনাকে চিনিতে শুরু করিল, তাহার পার্টিকেও চিনিতে শুরু করিবে।…

সেই দৃঢ় স্পষ্টভাষী মোতাহের, বিন্দুমাত্র যাহার মনে সংশয় নাই।…কত প্রভেদ তাহার সঙ্গে সেই অস্থির, অশান্তচিত্ত সুনীলের। সত্যই কি সে 'কমিউনিজম' এর জটিল তত্ত্ব ও রোমাঞ্চকতাহীন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারিত? না, তাহা আভিজাত্যগর্বিত পরিবারের ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে সুনীলের বিদ্রোহ, অমিতের সংযত বিচার-বুদ্ধির বিরুদ্ধে অভিমানের উগ্র বিক্ষোভ? না, আকৈশোর প্রিয়-বান্ধবী সেই নিরপরাধা ললিতার আত্মধীকৃতি? শত ইজম-ও ললিতার অপেক্ষা বড় নয় সুনীলের পক্ষে।

মোতাহের জানাইল—মজুরের মনেও প্রশ্ন জাগিয়াছে। বছরের পর বছর বাজার মন্দা গেল, কল-কারখানার কাজ কমিল। চটকলে তো মজুরের দুর্দশার একশেষ গিয়াছে। তাঁত বন্ধ, কাজের ঘণ্টা সংক্ষিপ্ত, ছাঁটাই বেপরোয়া। এইভাবে মজুরিও যাহা দাঁড়াইল তাহাতে মানুষ ছার, ইঁদুরও বাঁচিতে পারে না। মজুরেরাও আসলে বাঁচে নাই, মরিয়াছে। যাহার বাঁচিবার কথা ষাট বছর সে ইহার ফলে মরিবে পঞ্চাশে। আর তাহার ছেলেপিলে মরিবে

তাহার চোখের উপরে। ইহাকে বাঁচা বলে না—শ্লো ডেথ বলে। কিন্তু আজ তো সেই মন্দার বাজারও মালিকেরা কাটাইয়া উঠিয়াছে—তখনো তাহাদের অবস্থা অবশ্য সে তুলনায় খারাপ ছিল না। কাহারও পুত্র পরিবার মরে নাই, বেশি হইলে বিলাশের বহর কমাইতে হইয়াছে। এখন মালিকের অবস্থা আরও ভালো হইতেছে; তাহা হইলে মজুরের অবস্থা এখন ফিরে না কেন? ফিরিবে না, সংগ্রাম না করিলে ফিরে না। সংগ্রাম করিলেই কি সহজে ফিরে? না। এই তো চটকলের এত বড় ধর্মঘট গেল। গঙ্গার এপারে ওপারে আড়াই লক্ষ তিনলক্ষ মজুরের এমন ব্যাপক আয়োজন—কেবল মোতাহেরের মতো কর্মীদের উসকানিতেই কি তাহা জ্বলিয়াছে? না, অনেক আগুন মজুরের মনে জ্বলিতেছে বলিয়াই জলিল এই মজুর হরতাল। অবশ্য নতুন শাসনতন্ত্র, নতুন মন্ত্রিত্বের কথা আগুনের ফুলকির মতো ইহাদের মনে আসিয়া উড়িয়া পড়িয়াছিল তাহা ঠিক। কিন্তু খপ করিয়া নিবিয়াও গেল সব। কারণ সংগঠন নাই, মোতাহেররা কাজ করে নাই। সংগঠন থাকিলে মজুরদের প্রতারণা করা বা এই হরতাল বানচাল করা মালিকদের পক্ষে এত সহজ হইত না। প্রধান মন্ত্রী হক সাহেবের কথা দিতে কোনো দিন বাধে না। কোনো দেশের কোনো শাসকই কথা রাখিবার জন্য মজুরের নিকট কথা দেয় না। হক সাহেবও দেন নাই, ঠক সাহেবও দিতেন না। তাই এমন আম হরতালেও কী যে চটকলের মজুরেরা পাইল তাহার ঠিক নাই। মজুরেরা বড় রকমের ভুল করিয়াছে। উপায় নাই; এখনো তাহাদের চেতনা অনেকটা আচ্ছন্ন। এখনো তাহারা কথায় ভোলে, চালে ভোলে, কংগ্রেসের নাম শুনিলে আশা পায়, বড়লোকের ভরসা পাইলে নিঃশঙ্ক হয়,—এমন কি দুর্বৃত্ত ডাকাত যাহারা শরফুদ্দীনের মতো দালাল, তাহাদের হাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া স্বস্তি চায়। দেবতা না পাইলে ভাবে দৈত্যও সহায়তা করিতে পারে। অর্থাৎ বাঁচিবার পথ নয়, তাহারা ফিকির খোঁজে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চেতনায় এই বোধও আসিয়াছে—সংগ্রামেই মজুরের বাঁচিবার পথ। তাই শুধু বড়-কথার দালালদের ভোট দিয়া মজুরেরা নিশ্চিন্ত হয় না, ধর্মঘটও করে। মজুরের এই বোধকে দৃঢ় করা, ব্যাপক করা, তীব্র করা,—এই তো

মোতাহেরদের কাজ। ল্যান্সডাউন হইতে [illegible] পর্যন্ত সকালে বাহির হইয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘোরা, কথা বলা, বক্তৃতা করা—এই তো মোতাহেরের রুটিন।

যাবে অমিতদা ?—

বিদায় লইবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠিয়া মোতাহের বলিল। অমিতের আহারের প্রস্তাব লইয়া অহু যে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, না বলিলেও তাহা বুঝিবার মতো চক্ষু মোতাহেরের আছে তাই 'বক্তৃতা' শেষ করিল। না, ল্যান্সডাউনের মজুর বৈঠক নয়। তাই নিজেই বিদায় লইবার জন্য দাঁড়াইল প্রথম। আর বলিল : যাবে অমিতদা ?

নিশ্চয়।—অমিত দাঁড়াইয়া উঠিল। জানাইল, কিন্তু আপাতত কলিকাতা শহরের বাইরে পদার্পণও নিষিদ্ধ।

নিষিদ্ধ রাত্রি নটার পরে বাইরে থাকাও, আর আমাব মতো রাজনৈতিক সন্দেহভাজনের সঙ্গে বাক্যালাপও। সে হুকুম জানি। কিন্তু, শ্যামলের সঙ্গে দেখা হল। শুনলাম তুমি এসেছ, আর থাকতে পারলাম না। তোমাকে দেখতে আসি নি, শুনতে এলাম তোমাব কথা—কেন তুমি মজুরের পার্টিতে নাই ? বলতে এলাম তোমাকে মজুরের কথা—একদিন ডকের এলাকায় আমাদের মতো তুমিও মজুরেব আন্দোলনে ঝুঁকেছিলে। বলতে এলাম,—বসে নেই সে মজুর—নতুন দিন আসছে—মজুর পা বাড়িয়েছে পথে—

'পথে !'—অমিত দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, চমকিত হইল, 'পথে।' নিজেকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমিও তো পথেরই মানুষ অমিত—এই তো ইন্দ্রাণী বলিল। তাই না ?

বেশ, মোতাহের, আমি পথের মানুষ। পথেই তবে আমাকেও পাবে। মোতাহের হাত বাড়াইয়া দিল। সবলে হ্যাণ্ডশেক করিয়া বলিল, তা-ই চাই কমরেড অমিত।

জগৎ হইতে জগদান্তরের স্পর্শ যেন সঙ্গে সঙ্গে বহিয়া আসিল।

মনে পড়িতেছে সুনীলের মুখ।…

সমস্তটা দিনের এলোমেলো দুর্বার ঘটনারাশি এবার কি একটা পরিণতিকে

দিয়া পৌঁছিতেছে ?—সমস্ত শিল্পের জ্ঞান ও বিজ্ঞানরাশির স্তরে—সমস্ত তীব্র অনুভূতি ও সহজ কৌতুক কৌতূহলের মধ্যেও— একটা অদ্ভুত শপথ, একটা আত্মপ্রতিশ্রুতি—আপনার এই পরিপূরণই দাবি করিতেছিল কি ? এইবার কি অমিত অন্য দিনের নিশানা পাইবে ? অমিতের পৃথিবী নানা গ্রহ-উপগ্রহ আর নীহারিকা স্রোতের মধ্য হইতে গড়িয়া উঠিবে—গড়িয়া উঠিতেছে ; —অমিত এইবার সেই আশা, সেই আশ্বাস পাইতেছে !

সদর বন্ধ করিয়া অমিত ফিরিয়া আসিল। বলিল, বসো অনু। অনু আসুক, একসঙ্গে খেতে বসব তিন জনা। ততক্ষণ বসো কথা বলি—

এক মুহূর্তও সময় পেলাম না দাদা, তোমার সঙ্গে কথা বলি — অনু বলিল।

তাই তো সারা দিনে অমিত কি করিলে ? ··অনুর সহিতও ভালো করিয়া কথা বলিবার সময় হইল না ! আশ্চর্য মানুষ তুমি, অমিত ! দিনের জোয়ার ভাঁটায় একেবারে ভাসিয়া গিয়াছ। যাইবেই তো, উপায় নাই। এত কাল তোমার একান্ত জগতের যত সত্য আর যত মিথ্যা লইয়া তুমি খেলা করিতেছিলে, সেই খেলাঘর আজ ভাসিয়া যাইতেছে। পৃথিবীর দিগদেশের জোয়ার এবার তোমার জীবন-গঙ্গায় আসিয়া গেল ; তোমার স্বপ্ন ও সত্যকে উহার অন্তস্তলে টানিয়া লইল। ইহা সাধারণ জোয়ার নয়। কোটালের বান ডাকিতেছে আজ ইতিহাসে—তোমার জীবন গঙ্গায়—তোমার গৃহাঙ্গনেও।

কিন্তু অনু বসিয়া আছে—আর কী কাণ্ড অমিত নিজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেছে যে ! অথচ অনু অপেক্ষা করিতেছে—দাদা কি তাহাকে কিছু বলিবেন না ? সারাদিন দাদা কিছু বলেন নাই। বলিবার সময় পান নাই, অনুও যাচিয়া সময় চাহে নাই,—চাহিবে কেন ? দাদা কি অনুর এই আশাটুকু বুঝেন না ? হয়তো বুঝিলেও এতক্ষণ অবকাশ পান নাই। কিন্তু এখনো কি দাদা কিছু বলিবেন না ? কিছু বলিবেন না—তাহাদের বিষয়েও ?···একটি প্রশ্ন, একটি সহজ জিজ্ঞাসা, একটি পরিচ্ছন্ন ভদ্র ইঙ্গিত ?—এইরূপ কিছুই কি করিবেন না, দাদা ?

অমিত বুঝিল আপন মর্যাদায় ও ধৈর্যে অনু অপেক্ষা করিতেছে। অমিত

অহার দাদা,—হোক সে অমিত আজ আনন্দ উন্মাদনা স্মৃতিতে ভাবনায় আবর্তিত, তবু সে-ই অনুর অগ্রজ।

অমিত বলিল, তোমরা ছাত্ররা আজকাল সবাই কমিউনিস্ট, অনু?

না, দাদা। কেউ এ-দল, কেউ ও-দল। দলের শেষ নেই!

তুমি কোন দলে, অনু?—সস্নেহে অমিত প্রশ্ন করিল।

অনু আস্তে আস্তে মন খুলিল। সে কোনো দলে নয়। দল কি খেলা করিবার মতো জিনিস? ভাবিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, দেখিতে হইবে—তারপর পরীক্ষা করিতে হইবে—নিজেকে ও দলকে। তবেই তো দলে যোগ দিতে পারা যায়।

এ কি অনুর নিজের ভাবনা? না, মোতাহেরের সঙ্গে দাদার আলোচনা সে শুনিয়াছে। ইহার দাদার অনুগামিতা? অমিত প্রশ্ন করিল: তা হলে এই সভা মিছিল রাজনীতি এসব ততক্ষণ বর্জন করেই চলতে হয়, কি বলো।

বর্জন করলে আর বুঝব কি করে, জানব কি করে, পরীক্ষা করব কি করে?

না, অনুর কথা দাদার প্রতিধ্বনি নয়।—তা হলে কি করছ? ধরি মাছ না ছুঁই পানি?—পরিহাস-সহজ কণ্ঠে অমিত বলিল।

হাসিয়া সহজ কণ্ঠে অনু বলিল, না। ধরি মাছ. ঘোলাই না জল। মাছ ধরার জন্য জল ঘোলাবার দরকার নেই। সাঁতার না শিখে ডোবায়ও ডুবব না সমুদ্রেও ভেসে যাব না—

অমিত খুশী হইতেছিল। বলিল, কিন্তু জলে তো নামতে হবে—

নিশ্চয়। আমি বিজ্ঞান পড়ছি—প্র্যাক্‌টিস-এ কষে বুঝব কোন থিওরি কত সত্য। নইলে বিজ্ঞান পড়লাম কেন?

অমিত পুলকিত হইল,—এই তো নতুন যুগ, নতুন যুগের মেয়ে। মেয়েরা শুধু আর 'মেয়ে' নয়। সুর'র মতো শুধু মেয়ে নয়—ভালোবাসিয়াই যাহারা শেষ হয়। কিংবা ভালোবাসিতেই যাহারা পারে নাই, সমাজের চিরাগত প্রথায় পত্নীত্ব, মাতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে, গ্রহণ করিয়াছে, সংসার, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা। ইন্দ্রাণী সত্যকথা বলিয়াছে, তাহারা গ্রহণই করিয়াছে, কিন্তু অর্জন করিতে শিখে নাই—ইন্দ্রাণীর এই বিচার সত্য। সহজ সে জীবন, নিরুদ্বেগ সে

জীবন,—লতা-পাদপের মতো সরল আর সহজ। কোথায় তাহাতে মানুষের জীবনের অপার বিস্ময় ;—বেদনা, জটিলতা, সংগ্রাম, আত্ম-জিজ্ঞাসা—আর সবসুদ্ধ আত্ম-চেতনা ? কিন্তু সেই যুগ আসিয়াছে—অন্য দিন আজ। শুধু সমাজ-জিজ্ঞাসার, সত্য-জিজ্ঞাসার, আত্ম-জিজ্ঞাসার দিন নয় ; স্বীকৃতির যুগ, সৃষ্টির যুগও। সেই জিজ্ঞাসার যুগ ছিল অমিতের যুগ। অন্যদের যুগ শুধু জিজ্ঞাসার নয়, স্বীকৃতির যুগও। তাহারা হৃদয় দিয়া শুধু গ্রহণ করে না, বুদ্ধি দিয়াও বিচার করে। আর গ্রহণ যাহা করে গ্রহণ করে, মানুষের মতো। আজ অন্যদিন—সেদিন আর নাই—নাই বিচারহীন সেই অধীর আত্মদানের দিনও—সুনীলদের অধীরতার···

অমিত আবার বলিল : কিন্তু শ্যামল ? সেও কি কোনো দলে নেই ?

দলে ঠিক নেই এখনো, তবে সে কাজ করছে কমিউনিস্টদের মতো। আর কাজই সে চায়। বিচার-বিশ্লেষণ নয়, কাজেই বরং ওর আগ্রহ।

···কাজই সব, অমিত ; কাজই সকল চিন্তার প্রমাণ ; তাই না ?···

অনু শ্যামলের কথা বলিতে লাগিল কোথাও কুণ্ঠা নাই, আত্ম-বিস্মৃতি নাই, সহজ সৌহার্দ্যকে অকারণে জটিলতাময় করিয়া তুলিবার মতো কোনো কারণ নাই। অমিত শুনিতে শুনিতে আবার কখন শুনিতে ভুলিয়া যায়। সে বুঝিয়া উঠিতে পারে না—ইহা কি এই যুগের তরুণ-তরুণীদের সহজ বন্ধুত্ব ? না, বন্ধুত্বের ছলনায় ইহা চির-যুগের তরুণ তরুণীদের অনুরাগ ভালোবাসা ? হয়তো এই সৌহার্দ্য,—অকপট আর সংশয়-লেশহীন—যেমন মনু ও সবিতার প্রীতি-সম্পর্ক। · কিন্তু তাহাও কি শুধুই প্রীতি ? দুই সহপাঠীর সহজ প্রীতি ? প্রাণাবেগের আলোড়ন জাগে নাই মনু ও সবিতাকে ঘিরিয়া ?—জাগে নাই অনু শ্যামলকে জড়াইয়া ?—অমিত কি এই কথা অনুকে জিজ্ঞাসা করিবে ? অনু ছাড়া আর কে বুঝিতে পারিবে মনু ও সবিতার এই প্রীতি-সম্পর্কের নিগূঢ় রহস্য ? মনু না বুঝিতেও পারে। সংসারকে মনু সহজ প্রাণবান্ মানুষের মতো গ্রহণ করিয়াছে। হাসিবে, গল্প করিবে, নিজ শক্তিতে জীবিকা অর্জন করিবে, নিজের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া সবল সতেজ পুরুষের মত জীবনযাপন করিবে ;—অন্তর্মুখী হইবার অবকাশ তাহাদের অভাবের সংসার মনুকে দেয় নাই।

ভাবুক-চিন্তাশীল ও মনোবিশ্লেষণের সময় অনুর নাই, সেই প্রবৃত্তিও হয়তো তাহার বিশেষ ছিল না। কিন্তু অনুর জীবনে এইরূপ কর্মব্যস্ততার সুবিধা ঘটে নাই। মাতৃহীন গৃহে সে গৃহের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। আপনা হইতেই শিশুদের ভার লইয়াছে, নিজের ভারও লইয়াছে। সে দেখে, চিনে, জানে, বোঝে, বিচার করে—আর তারপরে তেমনি কুয়াশাহীন দৃষ্টিতে গ্রহণও করে মনে মনে। অনু কি তবে সবিতাকে মনুকে দেখে নাই? অথবা, অনুও এতদিন মনু ও সবিতাকে দাদার আদর্শছায়ায় সমাশ্রিত সহযাত্রী ও সহযাত্রিনীরূপে দেখিয়াছে? মনু ও সবিতা অমিত-তীর্থের দুই সতীর্থ মাত্র। আর, এবার দেখিবে, অবিলম্বে দেখিবে, অমিতের মতোই অনুও দেখিবে,—আপনাদেরই অজ্ঞাতে মনু ও সবিতা কোন নিগূঢ় সত্যকে সপ্তপাকে ঘিরিয়া গ্রহণ করিয়াছে। অনু নিশ্চয় বুঝিবে—এই সত্যকে অস্বীকার করা যায় না, আপনার অজ্ঞাতেও কোনো সত্যকে এড়ানো সম্ভব নয়। অস্বীকার করিতে করিতে, এড়াইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ কোনো বাঁকের মুখে·· কোন এক বাস স্টপের ছায়ায় হয়তো—সত্যের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াইতে হয়। আর সেই এক নিমেষে সকল জীবন এই কথা উপলব্ধি করে—হয়তো একটি আহ্বানে, একটি চাহনিতে—মিথ্যা দিয়া আপনাকে আবৃত করা কত মিথ্যা, কত অসম্ভব। সত্যের সেই প্রলয়দীপ্তির সম্মুখে সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক আলো কত নিষ্প্রভ। সত্যের সেই বজ্রালোকে তখনই আবার বুঝা যায়—পৃথিবী কত সুন্দর, মানুষ কত সত্য আর জীবন কত বড় এক জয়যাত্রা। সেই রূঢ় জাগরণ তবে মনু ও সবিতার চেতনায় আসুক—যাহা আজ অমিতের জীবনে আসিয়াছে!

অমিত বুঝিল তাহার চিন্তামগ্ন দৃষ্টি অনুর চোখ এড়ায় নাই—শ্যামলের কথা অমিত কখন ভুলিয়া গিয়াছে। অমিত তাই বলিল—শ্যামলের সম্বন্ধে আপনার আগ্রহ বুঝাইবার জন্যই বলিল:

শ্যামল কাল আসবে তো, অনু?

না। কাল তোমার কাছে অনেকে আসছেন। মিনতিদি, ইন্দ্রাণীদি'…

ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছে অনু!—অমিত সহজভাবে জানাইল।

'ইন্দ্রাণী'—না ইন্দ্রাণীদি'?—বলিল অনু।

অমিত 'ইন্দ্রাবউদি' বলে নাই, অমিত বলিয়াছে 'ইন্দ্রাণী',—অনুর তাহা কান এড়ায় নাই। কিন্তু সত্যের সেই বজ্রাগ্নি-লেখা এই গৃহে পড়ুক,—অমিত তাহা আর আচ্ছাদন করিতে চাহে না। অনু তারপর সবিস্ময়ে বলিল : তিনি যে তোমার খোঁজে এখানে এসেছিলেন।

অমিত স্থিরভাবে বলিল, তাও বললেন। দেখা হল স্টপের নিকটে, লোকের ভিড়ে। তাঁর ফ্ল্যাটে গেলাম, তাই দেরি হল,—কিছুই জানতাম না তাঁর খবর।

অমিত আর কিছু বলিতে চাহে না এখন। আজিকার মতো ইহাই যথেষ্ট। অনুর পক্ষে যথেষ্ট। আর অমিতের পক্ষে আজ যথেষ্ট হইবে এমন কথা কোথায়, বাণী কোথায়? কোথায় তেমন একখানা খেয়াল কিংবা ধ্রুপদ সেই শূন্যে শূন্যে অনুরণিত বিশ্ব-স্পন্দনের প্রতিধ্বনি?

অনু তথাপি একটু অপেক্ষা করিল। তারপর বলিল : আমরাও তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারি নি। তাঁর বাবা মা সেবার এখানে এসে তোমাকে দোষ দিয়ে গেলেন—তুমিই তাঁর মাথায় নানা খেয়াল ঢুকিয়েছে।

অনু চুপ করিল। অমিত হাসিতে লাগিল। পরে বলিল : কথাটা মিথ্যা। কিন্তু একেবারে মিথ্যা নয়, অনু। ওঁর মাথা ছিল, তাই এ খেয়াল ওঁর মাথায় ঢুকল। নইলে ঢুকত অন্য খেয়াল—হয়তো 'ভারতী' মাতা কিংবা 'মহানন্দী' স্বামী ; কিংবা ফ্যাসান ও ফিল্ম, নইলে · 'নারীস্বাধীনতা সংঘ'।

অনু প্রীত হইল না। একটু নীরব থাকিয়া বলিল : ইন্দ্রাবউদি'! আপনার খেয়ালেই আপনি চলেন। ভাবেন উনি একাই যথেষ্ট, 'উম্যান্ কোশ্চেন' মিটিয়ে দেবেন একাই। উনি যা করবেন তা হবে দৃষ্টান্ত, অন্যেরা অনুসরণ করবে। বড় 'ইনডিভিডুয়েলিস্ট'।

অমিত চমকিত হইল। 'দর্পিতা ইন্দ্রাণী' আপনার ভাগ্যজয়ের উন্মাদনায় উন্মাদ ইহাই অমিতও ভাবিয়াছে। তবু খানিক আগে ইন্দ্রাণী অমিতকে নিজের জীবনে স্বীকার করিয়াছে। তাহাকে 'দর্পিতা' বলিবে কি করিয়া কেহ? অমিত ইতস্তত করিতেছিল। কিন্তু অনু তাহার সংশয়কে যেন ছিন্ন করিয়া দিল।—ইন্দ্রাণী আপনাকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না, দশজনের মধ্যে নিজেকে

কোনো 'ব্যাপক আয়োজন সংযুক্ত করিতে পারে না। তাহার আত্মনির্ভরতা কি আত্মম্ভরিতায় পৌঁছিতেছে? শেষে কি উগ্র অসামাজিকতায়, সমাজদ্রোহিতায় গিয়া সে পৌঁছিবে?...ইন্দ্রাণী জানে না তাহার আসল শত্রু স্বামী নয়, সংসার নয়,—অমিত নয়,—সে নিজে, তাহার অস্থির আত্মস্বাতন্ত্র্য। উহা তাহাকে স্বাতন্ত্র্য দিবে, সার্থক হইতে দিবে না। নিজেকে না দিলে নিজেকে মানুষ হারায়। কিন্তু নিজেকে কি ইন্দ্রাণী দিতে পারে না, অমিত? দেয় নাই আজ সন্ধ্যায় কাহারও হাতে?...

প্রশ্ন অমীমাংসিত রাখিয়া অমিত হাসিয়া বলিল, ঠিক, অনু। কিন্তু অন্যদের সে আগ্রহও নেই। তাঁরা আসলে নারী সমস্যা মিটিয়ে দিতেও চান না, শুধু চান নিজেদেরই।...

অনু আপত্তি করিল না, সম্ভবত স্বীকারও করিল না। একটু পরে বলিল: যাই যিনি চান দাদা, চান তো নিজেরা,—কিন্তু তোমাকে দোষ দেওয়া কেন? গ্যাখো, সুরোদির স্বামী পশুপতিবাবু সেবার কি কাণ্ডই বাধালেন। তিনি বিলিতি কোম্পানির বড় অফিসার। মানী লোক, অনেক প্রোস্‌পেক্‌ট। তবু কিনা সুরোদি তোমাকে জেলে চিঠি লিখতেন। পুলিশ সে চিঠির সূত্র ধরে এসে খোঁজ করেছিল পশুপতিবাবুর বাড়িতে। এ করলে আর তাঁর মান থাকে? লোকেই কি ভালো বলবে সুরোদিকে? একটা বড় চাকরের ওয়াইফ্, মেয়েও আছে তাঁর,—ইত্যাদি। পশুপতিবাবুর কথাবার্তা বিশ্রী—স্থূল দাম্ভিকতা। ইদানীং সুরোদিও তুমড়ে মুষড়ে গিয়েছেন—সে মানুষ আর নেই। কিন্তু বলো তো দোষ কার?

একটা করুণ আখ্যায়িকা সাধারণ ভাবেই শেষ হইতেছে—সুর আর সেই সুর নাই। অমিত তাহা অনেকদিনই অনুমান করিয়াছিল। সেন্‌সরের মসী-লিপ্ত পত্র সুরর নিকট হইতে বহুদিন অমিতের নিকটে আসে নাই। অথচ তাহাদের সম্পর্কটুকু কত সরল ও অকৃত্রিম ছিল। বয়ঃকনিষ্ঠা অনুজার সগর্ব ভক্তি দাদার উদ্দেশ্যে—দাদার গৌরবে ভগিনীর গৌরব-বোধ। অন্য কেহ উহার মূল্য দিবে না—শত্রুও না, মিত্রও না! কারণ, সুর' সহোদরা নয়...অতীতপ্রায় পৃথিবীর আর-একটি বলি সুর'। এমনিতরই মধ্যযুগের সমাজের নারীর

পূজা। তাহারা কাব্যের উপেক্ষিতা নয় তাহারা মর্ত্যের উপেক্ষিতা। কিন্তু একালের মেয়ে অনু কি করিয়া তাহাতে সান্ত্বনা পাইবে? মাতৃহীনা, ভ্রাতৃ-গর্বিতা এই বালিকাকে যে অকারণে দাদার এই অপমান একা একা সহিতে হইয়াছে।

অমিতের বন্ধুদের কথা অনু ক্রমে জানাইল। সুধীরা প্রথম প্রথম আসিতেন পরে তাঁহার ছেলে হইল, আর সুধীরা সময় পান না।·· অমিত জানে—এমনি হয়। আর তাই মনে মনে হাসিল। শুনিল, সুহৃদও ফিল্ম লইয়া মাতিয়াছে, দক্ষিণ কলিকাতায় তাহাদের বাড়িতে গান-বাজনা লাগিয়াই আছে। সুধীরারও ঝোঁক সেদিকে গিয়াছে। আশ্চর্য মানুষ অপূর্বদা—অনু বলে। কিন্তু অমিত আশ্চর্যের কিছুই দেখে না। অপূর্ব আপনার গুণেই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করিয়াছে—এখন তাহার উঠিবার সময়। যতই সে অমিতকে ভালোবাসুক, পুলিশকে সে বড় ভয় করে।

কিন্তু এরূপ মানুষ লেখেন কি করে?—অনু তাহা বুঝিতে পারে না।

অমিত হাসিয়া বলে: মানুষটা লেখক-মানুষ বলে।

লেখাই কি সব? তার থেকে বড় আর কিছু নেই?

হঠাৎ অমিতের মন আবার চমকিত হইয়া উঠিল।—সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল দত্ত, জ্যোতির্ময়, তোমরা সত্য করিয়া বলো তো লেখাই কি মানুষের সব? চিন্তাই কি জীবনের ভাষা? না, তাহা জীবনের শুধু বক্রোক্তি? কীট্‌সেরও জীবনদর্শনে Fine writing আসে next to fine doing—। কীট্‌সের তুলনায় কে তুমি তবে অপূর্ব, আর কিই-বা তবে তুমি অমিত?—In the beginning was deed.

অনু বলিতেছে: তার চেয়ে বিকাশদার কথাও বেশি বুঝি। ছবি বিক্রি হয় না, ঘরে নিদারুণ অভাব। তাঁকে পাগলামোতে পেয়েছে। বলেন—'সব ফাঁকি। আর্ট নয় বুজরুকি।' মদ খেতে শুরু করেছেন। কোথা থেকে তোমার খবর পেয়ে তবু আজই ছুটে এসেছিলেন। কাল হয়তো সে কথাও ভুলে যাবেন নিজেই। আজ কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাকে বললেন, 'এবার আমাদের আসর জমবে আবার অনু।'

জীবনের খাতার এক-একটা ছেঁড়া পাতা যেন উড়িয়া উড়িয়া যাইতেছে। কিছুই মিথ্যা নয়, অসঙ্গত নয়, কিন্তু খাতার বাঁধন খুলিয়া সবই যেন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আবার কি ইহাদের সাজাইয়া, গুছাইয়া অমিত বাঁধিয়া লইবে আপনার জীবনের কাহিনীতে? আবার আসর জমিবে—সুহৃদের সঙ্গে গান লইয়া অমিত মাতিয়া উঠিবে, ছবি লইয়া মাতিয়া উঠিবে বিকাশের সঙ্গে। সাহিত্য লইয়া, কাব্য লইয়া অপূর্বর সঙ্গে অমিত রসাস্বাদনের আনন্দে যোগ দিবে?...কিন্তু 'লেখাই কি সব?' গতিময় পৃথিবীর জীবন ততক্ষণে দুর্বার দুর্জয় হইয়া উঠিবে,—স্পেনে, চীনে, ভারতে। প্রতি দেশের মাঠে-মাঠে কারখানায়-কারখারায়, স্কুলে-কলেজে! এ দেশের ছেলেরা যখন শ্যামলের মতো জনশক্তির পুরোধা হইয়া উঠিতেছে, মেয়েরা যখন পুরুষের সহযাত্রিনী হইয়া উঠিতেছে—ঘরে, বাহিরে, পথে,...গান-ছবি-লেখা? পথে পথে যখন অমিতের জন্য আহ্বান নতুন মিছিলের, পথে-পথে যখন অমিতের জন্য অপেক্ষা তাহার নিয়তির—এ যুগের দৃষ্টির, এ যুগের সৃষ্টির...

মন্নু আসিয়াই উৎসাহভরে জানাইল—মিস্টার মেহতা পরশু দিন অমিতকে চায়ে নিমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। তিনি জানিতে চাহিয়াছেন—এবার অমিতবাবু কি করিবেন? তাঁহার মতো লোকদেরই চাই আজ দেশগঠনে। গবর্নমেণ্ট্ অব ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট্ দিয়া কি হইবে? চাই স্যর বিশ্বেশ্বরায়ার মতো লোক। মিস্টার মেহতার হয়তো ইচ্ছা তাঁহার সামাজিক-আর্থিক সাপ্তাহিক পত্র ইণ্ডিয়ান ইকোনোমিস্ট্-এর ভার অমিতকে দেন।

অমিত শুনিতেছিল। অযাচিত ভাবে এই মুহূর্তে সুযোগ আসিতেছে!—ইহার পরে তাহা সুলভ হইবে না। দেশগঠন, শিল্পোন্নয়ন, ফাইব্-ইয়ার-প্ল্যান—আর অমিতের ভগ্ন সংসারের কোনোরূপে আবার পুনর্গঠন, কোনোরূপে অমিতের, মন্নুর, অনুর গৃহজীবনের প্রতিষ্ঠা; তাহার আত্ম-প্রতিষ্ঠাও...and by that sin the angels fell.. অমিত মেহতার কাগজে ভার লইবে কি? তাহাকে উপায় করিতে হইবে—নিজের জন্য, সংসারের জন্য।—ওয়ার্ক এণ্ড লিভ, না, 'ওয়ার্ক—স্টার্ভ আর নট্?' ইহার কোন পথ গ্রহণ করিবে, অমিত—কোন পথ?...In the beginning there was deed?

[illegible] [illegible], কাকে গল্প—বলিয়া অনু—দুইজনাকে ডাকিয়া লইল।—এখন সকলে আমাকে বলছে, এখন আর গল্প নয়।

অর্থাৎ গল্পই। যে গল্প এতকাল এ বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া ফিরিতে-ছিল, তাহাই এবার ভাই-বোনের একান্ত সংসারের মধ্যে এখন নামিয়া আসিতে পারিল। মনু এখনো পুরাতত্ত্ব বিভাগে চাকরি পাইতে পারে। সে বিভাগ তাহার ভালোই লাগিবে। তবে মনু কলিকাতা ছাড়িতে চাহে না। এতদিন ছাড়া সম্ভব ছিল না। নতুন নতুন আবিষ্কারের সাধ তাহার মনে। সবিতার মতো সে শুধু ভারতীয় সভ্যতাব আধ্যাত্মিকতায় বা রূপসাধনায় মুগ্ধ হয় না। সে সব অপেক্ষা মনু পুরাতত্ত্বেই আনন্দ পায়—আনন্দ পায় মানুষের জীবনযাত্রার উপকরণ বুঝিতে। তাহা যে মূলত বস্তু-প্রধান, ভাব-প্রধান নয়, অমিতের এই কথায় মনুর আপত্তি নাই। কিন্তু সকলে ইহাতে নিঃসংশয় নয়। সবিতা তো নয়ই······

আর আলোচনা নয়।—অনু খাওয়া শেষ হইতেই ঘোষণা করে।—আজ এখন বিশ্রাম করবে, দাদা, বিশ্রাম তোমার চাই, তোমার মুখ দেখেই তা বুঝতে পারা যায়—বিশ্রাম তুমি চাও।

অমিত হাসিল, কিন্তু তর্ক কবিল না। ঠিক মায়ের মতো, তাহাব মুখ দেখিয়া অনু বুঝিতে পারে সে বিশ্রাম চায়।···আরাম কেদাবায় দেহ এলাইয়া দিয়া অমিত ঘুমাইবে, বিশ্রাম করিবে। অনু ঠিকই বুঝিয়াছে—সে বিশ্রাম চায়। কিন্তু অমিত জানে এখনো সে ঘুমাইতে পারিবে না এই রাত্রে—আজ, এখন।

৩

এই অমিতের পুরাতন ঘর। কাঁচের আলমিরায় এখনো অমিতের পুরাতন বই রহিয়াছে, নতুন বই সেখানে এখনো স্থান পায় নাই। ছয় বৎসর ধরিয়া তাহার নয়নের স্পর্শ মাগিয়া অপেক্ষা করিতেছে সেই 'ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিসিং

হাউসে'র জাপানী কাগজের 'কাব্য-গ্রন্থাবলী', আর সচিত্র সংস্করণ শেক্‌স্‌পীয়র।
ইতিমধ্যেই বন্দী অমিতের মন দিনে দিনে যে সুরে গাঁথা হইয়া উঠিয়াছে—এই তাহার আলমিরার বন্দী বন্ধুরা? উহার সহিত একটা সহজ সম্পর্ক পাতাইয়া লইতে পারিবে কি…

অমিত চোখ ফিরাইয়া লইল। এই ঘরের দেয়ালের মধ্যে যে অমিত আর যে পৃথিবী পরস্পরকে দেখিত, চিনিত, আজও অমিতের পক্ষে তাহা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। শেক্‌স্‌পীয়র ও রবীন্দ্রনাথ তাহাকে পথ দেখাইয়াছেন কত নিস্তব্ধ নিশীথে, কত দুঃসহ ক্লান্তির মধ্যে। আর আজও তাঁহারা নির্ভয় হাসি লইয়া অমিতের অপেক্ষায় আছেন। এই প্রাচীর ও পৃথিবীর সঙ্গে অমিতের মায়ের নিরাশা, তাঁহার ভগ্ন প্রাণের নিঃশ্বাসও নিথর হইয়া আছে,—অমিতকে জড়াইবার জন্য দুই অদৃশ্য বাহু বিস্তার করিয়া দিতেছে।…মায়ের প্রাণের সমস্ত কামনা ও সমস্ত মমতা এই অন্ধকারের প্রতিটি সুপরিচিত শব্দের সঙ্গে ও নৈঃশব্দের সঙ্গে জীয়াইয়া উঠিতেছে। এই গৃহের প্রতিটি উপকরণ স্পর্শের সঙ্গে, ও প্রতিটি জিনিসের স্পর্শহীন অপেক্ষার মধ্য দিয়াও তাহাই নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। আলো হইতে, অন্ধকার হইতে, বাতাস হইতেও যেন অমিত মায়ের নিঃশ্বাস শুনিতে পাইতেছে।…

পরিচিত একটা গন্ধ ক্রমশ অমিতের চক্ষুকে শয্যাশিয়রের দিকে টানিয়া লইল। অন্ধকারেও সে বুঝিতে পারিল একটা পরিচিত ঘ্রাণ সেখানে প্রাণ লাভ করিতেছে। অমিত বুঝিতে পারে না কী তাহা, কী? স্তিমিত চেতনার মধ্যে কী যেন জ্বলি-জ্বলি করিয়া আবার জ্বলিতে পারিতেছে না। শুধু কৌতূহল নয়, একটা অস্বস্তি তাই অমিতের মনে দেহে জাগিয়া উঠিল। কী ওখানে, কী?… অমিত হাত বাড়াইল, শিয়রের তলে হাতে যেন কী ঠেকিল—কোমল, মসৃণ, মৃদুস্পর্শ। তারপর এক মুহূর্তে সেই ঘ্রাণ তাহার চেতনায় জাগিয়া উঠিল—নির্মাল্যের ফুল, কানাইর মায়ের রাখা নির্মাল্যের ফুল। এবাড়ির সে বৃদ্ধা প্রায়-অশক্ত পুরাতন ঝি। অমিতের জন্য বসিয়াছিল, অমিতের উদ্দেশ্যে বালিশের তলায় এই নির্মাল্য রাখিয়া গিয়াছে। মোহগ্রস্তের মতো অমিত তাহা হাতে লইয়া বসিয়া রহিল।

শুধু তাহাও নয়,·· শুধু তাহাও নয়। অমিতের চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে একার স্মৃতি-বিজড়িত অনুভূতির প্রস্রবণ শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।···

দূর-মরুভূমিতে যাত্রার পূর্বক্ষণে বাহু-নিবদ্ধ অমিত জেলখানায় মায়ের আশীর্বাদ-পুষ্প, মায়ের শেষ দেওয়া সেই নির্মাল্যের ফুল দুইটি সে ফেলিয়া দিতে পারে নাই। গোপনে মুঠোর মধ্যে লইয়া কারাকক্ষে ফিরিয়াছে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই গন্ধ গিয়া মায়ের আকুল প্রার্থনার মতো মরুবক্ষের বন্দিশালায় গিয়াছিল—জেলখানার বুকের মধ্যে সেই গন্ধ আর স্পর্শ নিজের বুকের কাছে লইয়া অমিত মাকে শেষবার দেখিয়াছে—এই পৃথিবীতে শেষবারের মতো বিদায় দিয়াছে!···দূর-মরুভূমিতে মায়ের সেই নির্মাল্যের ফুল কবে বাক্সের এক কোণে শুকাইয়া গেল। গ্রন্থ ও বস্ত্রের মধ্যে তাহা চাপা পড়িয়াছিল, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে অবরুদ্ধ পেটিকার মধ্যে কাঁদিয়া মরিয়াছে। কনক-চাঁপার একটা নিষ্পিষ্ট সুবাস তবু বাক্সের কোণটিতে জাগিয়া ছিল; কোনো একটা বই-এর মধ্যে, কোনো একটি পরিধেয়ের ভাঁজে মাঝে মাঝে তাহার আভাস মিলিত। তারপর মরুভূমির শুষ্ক বায়ুতে শুকাইয়া গুঁড়াইয়া বাক্সের সেই অন্ধকার কোণে বাঙলার সেই কনকচাঁপা নিঃশেষ হইয়া গেল, অমিত তাহা জানেও নাই। তবু উহারই মধ্যে তাহার মায়ের শেষ দীর্ঘশ্বাস ও শেষ প্রার্থনা মিশিয়া ছিল, তাহাতেই সন্দেহ। মাতৃবিয়োগের বেদনা তাহার মনের মধ্যে একটু একটু করিয়া যখন রূপ গ্রহণ করিল, তখন অমিত মায়ের স্মৃতিচিহ্নও একটি-একটি করিয়া খুঁজিতে লাগিল। খুঁজিতে গিয়া অমিত তখন কিছুই তেমন খুঁজিয়া পায় না। অর্ধশিক্ষিত শিথিল হাতের বাঁকা-চোরা অক্ষরের দুই-একখানি চিঠি, তাহা ছাড়া আর কিছু কোথাও নাই। হঠাৎ এক মুহূর্তে বাক্সের কোণের বস্ত্রমধ্য হইতে সেই অর্ধবিস্মৃত আঘ্রাণ জাগিয়া উঠিল। অমিতের স্নায়ুতে স্মৃতিতে মা:য়র কোমল মমতায় স্পর্শখানি সেই ঘ্রাণ জীয়াইয়া তুলিল। মনে হইল মা যেন শিরশ্চুম্বন করিলেন—অমিত তাঁহার দেহঘ্রাণ লাভ করিল। এখন কানাইর মায়ের নির্মাল্য-গন্ধও অমিতের চেতনার অন্ধকার হইতে আজ এক মুহূর্তে মরুভূমির সেই মরিয়া-যাওয়া নির্মাল্যের সুবাস টানিয়া তুলিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই মরুভূমির স্মৃতির সহিত আবার,

জাগিয়া উঠিল কানাইর মায়ের মমতায় স্পর্শ, অমিতের মাতৃ-দেহের শেষ আঘ্রাণ!...

অমিত অস্থির হইয়া উঠিল। সেই দেবদারু-ছায়ায় শেষ দেখা মাতৃমুখ এবার অমিতের মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে! সেই শ্বাস, সেই বুকের দোলা, সেই চোখের দৃষ্টি, সেই দেহের আঘ্রাণ—সমস্ত দিয়া অমিতের চেতনা পরিবৃত, তাহার সত্তা বিজড়িত, তাহার ইতিহাস আজন্ম-আমৃত্যু পরিব্যাপ্ত।...কে বলিল তুমি এ গৃহের নও—তুমি শুধু পথের মানুষ? মানুষের বিশ্বলোকের পথযাত্রী? এই গৃহ, অনাত্মীয়া কানাইর মায়ের এই মমতা শুভকামনা আর মায়ের গড়া রক্তমাংসে এই নাড়ীতে নাড়ীতে গাঁথা অচ্ছেদ্য বন্ধন,—ইহা ছাড়াইয়া তুমি কোথায় যাইবে, অমিত? কোন পথে, প্রবাসে, মায়া-মিছিলে, ছায়া-সৃষ্টিতে আশ্রয় পাইবে?...

এক অদৃশ্য সত্তার উপস্থিতিতে অমিতের সমস্ত দেহ ভরিয়া গিয়াছে। অমিত আর স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছে না। একবার সে বাইরে গিয়া দাঁড়াইবে।...বড় গুমোট। বাঙলা দেশের আশ্বিনের রাত্রিতেও আজ ভাদ্র-শেষের গুমোট এই ঘরে জমিয়া উঠিয়াছে।

ঘরের সঙ্গেই ছাদ। সেই ছাদে গিয়া অমিত দাঁড়াইল।

অবারিত পৃথিবীর স্পর্শ অমিতের গায়ে লাগিল। দেহ শীতল হইল। মস্তিষ্ক শান্ত হইল। ছোট একটি ছাদের টুকরা, তবু মনে হয় ইহার মধ্যে প্রশস্ততা আছে। কাছেই উঁচু বাড়ি এদিকে-সেদিকে, কিন্তু উপরে আছে আকাশ। আবরণ নাই, ঊর্ধ্বে মহাকাশের সঙ্গ লাভ করিবার পক্ষে কোনো বাধা নাই। আর আকাশ যেন একটা অসীম আহ্বান—মানুষের আত্মীয়। পৃথিবীর বন্ধন মানুষকে বাঁধিয়া ধরে;—তাই সে বন্ধন একদিন শিথিলও হইয়া যায়। কিন্তু আকাশের বন্ধন যেন মুক্তির আহ্বান, তাই কোনো মানুষই তাহা কাটাইতে পারে না।..অমিত চোখ মেলিল, দেখিল—সেই তারা, সেই আকাশ, সেই মহাশূন্যের ঘূর্ণ্যমান জ্যোতিষ্কপুঞ্জ, শান্ত শূন্যলোকের অগণিত নক্ষত্ররাজি;—যাহাদের আলোক পৃথিবীতে এখনো আসিয়া পৌঁছে নাই, যেই নীহারিকা-স্রোত এখনো আবর্তিত হইয়া ঘনায়িত নক্ষত্রে পরিণত হয় নাই...

সে নীহারিকার স্তরে অমিতেরও কালের প্রাণবীজ অঙ্কুরিত হইবার প্রয়াসে এখনো পাখা ঝাপটাইতেছে…

কেমন সুদৃঢ় ও সুনিবদ্ধ আস্থায় আবার অমিতের বুক ভরিয়া উঠিল… সেই অনাগত আলোকের আগমনী সঙ্গীত কি তুমি শুনিতে পাও, অমিত? —নিজেকে অমিত জিজ্ঞাসা করিল।—লক্ষ লক্ষ আলোক-বর্ষ ধরিয়া যাহারা যাত্রা করিয়াছে মহাশূন্যে? জ্যোতির্ময় নীহারিকা-প্রবাহে যে নক্ষত্রের জন্মক্ষণ নিমেষে নিমেষে সন্নিকট, সুস্থির ও অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে সেই নক্ষত্রের বার্তা কি তুমি পড়িতে পারিতেছ না, অমিত? একালের বাষ্পাচ্ছন্ন দিনরাত্রির মধ্য দিয়া মানব-প্রেমের ঘূর্ণ্যমান, ভ্রাম্যমান দুই জ্যোতিঃকণা ইন্দ্রাণী-অমিতের বিচ্ছেদ-মিলনের ইতিহাসও রচিত হইতেছে। তাহার মধ্যেও কি দেখিতে পাইতেছ না আগামী দিনের মানব-মহানক্ষত্রের সম্ভাবনা, চিরন্তন বিরহ মিলনের নবতন অভিসার? ইতিমধ্যে পৃথিবীতে কত কত তুহিন ও উষ্ণ মন্বন্তর আসিল গেল,—কত প্রাণের কত বুদ্বুদ, ফুটিল, ফাটিল—ক্ষুদ্র পৃথিবীর সুখদুঃখ-ঘেরা গৃহকোণের কত অফুরন্ত বিস্ময় শিহরিত, কণ্টকিত হইল! উহারই মধ্যে ইতিহাসের অচেতন যাত্রা হইতে সচেতন আত্মনিয়ন্ত্রণের সন্ধি-সীমানায় আজ সন্ধ্যায় জন্মিয়াছে ইন্দ্রাণী, অমিত। প্রাগৈতিহাসিক পর্ব হইতে ইতিহাসের পর্ব-প্রবেশের শুভসাক্ষী তাহারা,—তাহারা সঙ্গী, তাহারা সহযাত্রী মোতাহেরের ও আরও অগণিত মানুষের…

ইন্দ্রাণী এখন কি করিতেছে?

অমিতের মাথার উপরকার এই আকাশের আবরণ তাহারও মাথার উপর বিস্তারিত। নিশ্চয় ইন্দ্রাণীও তাহার চল্লিশ টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাটের ছাদে, আকাশের তলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখানকার আকাশ তবু আরও একটু উদার, আরও কম্পমান, স্পর্শকাতর—সে যে ইন্দ্রাণীর মাথার উপরকার আকাশ! ওই তারার সঙ্গে ইন্দ্রাণী দৃষ্টিবিনিময় করিতেছে, উহারই মধ্য দিয়া এই রাত্রিতে, এমনি নিদ্রাহীন নয়নে দাঁড়াইয়া দৃষ্টি-বিনিময় করিতেছে অমিতের সঙ্গেও। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই ছাদের আলিসায় ভর দিয়া দাঁড়ানো দেহ অমিত দেখিতেছে। দেহের সেই দর্পিত সতেজ ঋজুতা এখন স্বপ্নে-

কল্পনায়-ধ্যানে আবেশ-শ্লথ হইয়া আসিয়াছে। কর-ন্যস্ত মসৃণ সুডৌল চিবুকের দৃঢ়তা আবার নম্রসুকোমল হইয়া গিয়াছে। আকাশের তারার দিকে চাহিয়া দীপ্ত, উজ্জ্বল নেত্র স্বপ্নে জিজ্ঞাসায় শান্ত, ধ্যান-স্নিগ্ধ। আর ইন্দ্রাণীর প্রাণ আনন্দে আশঙ্কায় থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দুঃসাহসিকা অভিসারিকার মতো বাহির হইয়াছে এই শরতের আকাশের তলে—সংকট-কণ্টকিত এই পৃথিবীর দুনিরীক্ষ্য পথে…

পিছনে কী একটা শব্দ হইল,—পিতার ঘরের দিক হইতে। অমিতের চেনা শব্দ—পিতার পায়ের শব্দ। একটির পর একটি পা এখনো তেমনি সুনিশ্চিত নিয়মে পড়ে—কিন্তু পড়ে একটা ভারী শব্দ করিয়া, যেন পদতলের পৃথিবী সম্বন্ধে আর তাহার স্থির নিশ্চয়তা নাই। তথাপি এই পদশব্দ ভুল করিবার নয়।

অমিত চমকিত হইল। তাকাইয়া দেখিল সত্যই বাবা গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রাচীর ধরিয়া ধরিয়া সেই মূর্তি অমিতেরই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অমিতের দুয়ারের পার্শ্বে একবার প্রাচীর ধরিয়া সে দেহ স্থির হইল। সন্তর্পণে দুয়ারের বাহির হইতে মুখ বাড়াইয়া একবার গৃহাভ্যন্তরে তাকাইল, আবার দাঁড়াইল দুয়ারের বাহিরে, বুঝি অতি অস্ফুটকণ্ঠে একবার ডাকিলও—'অমিত!' তারপর আর দাঁড়াইল না, তেমনি সন্তর্পণে পা ফেলিয়া দেয়াল ধরিয়া ধরিয়া ফিরিয়া গেল আপনার গৃহে। আপনার শয্যায় আবার নিঃশব্দে শুইয়া পড়িলেন বুঝি পিতা।

অমিত নির্বাক নিস্পন্দ। গভীর নিশীথে লুপ্তস্মৃতি সেই পিতৃ-হৃদয় বুঝি আপন চেতনায় একটা ক্ষীণরেখাকে দেখিতে পাইয়াছে, আর অমনি জরা-নিয়মের বন্ধন-মধ্যেও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। অদ্ভুত তাহার নীরব আকৃতি—এই সশঙ্ক গোপন ব্যাকুলতা। অদ্ভুত মৃত্যুর তীরেও মানব-মমতার এই মৃত্যুহীন আত্ম-প্রকাশ!

অমিতের মাথা নত হইয়া পড়িল। অমিত ছুটিয়া আপনার গৃহমধ্যে চলিয়া গেল, শয্যায় লুটাইয়া পড়িল। কে জানে হয়তো বাবার জাগরণের শব্দ পাইয়া অমুও জাগিয়া উঠিবে। হয়তো এমনিভাবে অমিতের দুয়ারে আসিয়া

দাঁড়াইবে, কান পাতিয়া অমিতের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনিবে—আসিতেন যেমন অমিতের মা।

অমিতের বুকের মধ্যে একটা আবেগের আলোড়ন। শয্যায় সে মুখ লুকাইল। একটি নিমেষের জন্য মনে হইল এই জীবন্মৃত মানুষের মায়ামোহের সম্মুখে তাহার সমস্ত দিনের অভিজ্ঞতা, সমস্ত সন্ধ্যার আবেগ-উদ্বেলতা ও সাধনাদর্শ, সবই অগভীর, অসার, অযথার্থ।

বহু বৎসর পরে এইবার অমিতের চোখে,—অশ্রু ছাপাইয়া উঠিল—আর, সেই ধারায় তাহার জ্ঞাত ও অজ্ঞাত চিত্তের অনেক স্মৃতি, অনেক বেদনাভার মুক্তি পাইল।

অপরূপ! অপরূপ!—আর বড় আপনার!

মন শান্ত স্থির হইতেছিল। কিন্তু কাহার পদশব্দ আবার? অভ্রান্ত পদশব্দ, ছোট দুইখানি পায়ের আত্ম-পরিচয়। তাহারও পদশব্দ অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সত্যই অনু আসিয়া দাদার ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইল। অমিত নিদ্রার ছলনা করিয়া আছে। তাহার নিদ্রায় বাধা না জন্মাইয়া দুয়ার হইতে আবার অনু ফিরিয়া গেল। পিতার ঘরে কি-কি কথা যেন হইল। সম্ভবত অনু তাঁহাকে জল আগাইয়া দিল, শরৎ-রাত্রিতে কোনো একখানি মোটা চাদরে তাঁহার পা ও দেহ ঢাকিয়া দিল। উৎকর্ণ হইয়া অমিত সে গৃহের সামান্যতম শব্দটুকু শুনিতে চায়। প্রত্যেক কর্ম, প্রত্যেক দৃশ্য অনুমান করিতে লাগিল। বুদ্ধিমতী, বিচার-কুশলা, বিজ্ঞানের ছাত্রী তাহার বোন অনু—সে সুব নয়, সবিতা নয়, ইন্দ্রাণীও নয়।—কেমন করিয়া সে দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল, শান্ত মমতায় ফিরিয়া গেল।

মনে মনে অমিত একটু খুশীও হইল, অনুকে সে ফাঁকি দিয়াছে—যে অনু বিজ্ঞানের ছাত্রী, আর মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারে দাদার আজ বিশ্রাম চাই, সে অনু জানে না দাদার আজ বিশ্রাম নাই।

বিশ্রাম নাই, অমিতের বিশ্রাম নাই। অমিত ধীরে ধীরে শয্যায় উঠিয়া বসিল, ধীরে নামিয়া গিয়া দেহ ঘরের চেয়ারে এলাইয়া দিল। চোখ শুষ্ক, মন শান্ত। একটু মৃদু কৌতুকও অনুভব করিতেছে সে কাঁদিল কি করিয়া?

অশ্রুমুক্ত দেহে এখন শ্রান্তি আসিতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া নিদ্রা কি আজ অমিতের পক্ষে সহজ? সে জেলে নাই, নিজ গৃহেই পৌঁছিয়াছে। কিন্তু কোথায় তাহার চোখে ঘুম? অথচ হয়তো নাক ডাকিতেছে জেলের বিছানায় নিত্যকারের মতো লক্ষ্মীবাবু। জ্যোতির্ময়ও ঘুমাইতেছে। আবার ঘুমাইতে পারে নাই সম্ভবত নিরঞ্জন,·· হয়তো শশাঙ্কনাথও। কিই বা করিতেছে রঘু ওড়িয়া? একশ জনের লম্বা ওয়ার্ডে পাশাপাশি শুইয়া থাকে সেই কয়েদীরা। রঘু সেখানেই শোয়, গোপনে বিড়ি খায়—এক-আধবার। দুই ঘণ্টা পরে পরে পাহারার ডাকে জাগে আর রাত্রি শেষ না হইতেই আবার 'গিণতির' তাড়নায় উঠিয়া বসে।—ইহারই মধ্যে ঘুমায়, জাগে, বিশ্রাম করে, জুয়া খেলে রঘু ও তাহার বন্ধুরা। রাত্রির কুৎসিত রূপকে কর্মহীন দুষ্কৃতির সঙ্গে মানিয়া লয়। তাঁহারা বিশ্রাম করে···বিশ্রাম করিবে কী করিয়া অমিত? জেলখানার এই কত কত সতীর্থের মুখ অমিতের মনে আসিয়া ভিড় করিতেছে, অমিতের কানে ডাক দিতেছে—'অমিত, তুমি আমাদের, তুমি আমাদের'।

শুধু মুখ নয়, নিরবয়ব অন্ধকারও তাহাকে ডাকিতেছে। নির্জন কারাকক্ষের সেই ক্রুর অন্ধকার এই গৃহের পরিচিত অন্ধকারের সঙ্গে গা মিলাইয়া আছে। এই ঘরের অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তাহা কাঁপিতেছে। · গোপনে হউক, প্রকাশ্যে হউক, কোনো কথা অমিত বলিবে না। এই একটি সংকল্পই সেই কারাকক্ষের অন্ধকারের কানে কানে সেদিন অমিত বলিয়াছে,—'কোথায়, সুনীল কোথায়?'—অমিত তাহার আশ্রয় স্থির করিয়াছে। 'অন্ধকার, তুমি তোমার অঞ্চলতলে সুনীলকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিও, আশ্রয় দিও। বলিও তাহার কানে কানে—'অমিত তাহাকে ভোলে নাই—অমিত তাহাদের ভুলিবে না'···

দুই বৎসর দণ্ড ভোগের পরে সেই সুনীলও অবশেষে অমিতের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল—'এসে গেলাম অমিদা'—

মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ুতে তখন আঁধি উঠিয়াছে। আকাশের দেখা নাই। নতুন প্রাণের আশ্বাস নাই। বন্দিশালায় যৌন-মনোবিজ্ঞান ও সাম্যবাদের ঝড় বহিতেছে। জ্যোতির্ময় - অমন তেজীয়ান জ্যোতি—সেও কমিউনিস্ট? সুনীল দত্ত উপস্থিত হইয়াই এই কথা শুনিল। আর শুনিয়াই বিদ্রোহ ঘোষণা

করিল। কে মার্কস? কে এঙ্গেলস? হউক তাহারা বিশ্ববিজয়ী পণ্ডিত, ভারতবর্ষের তাহারা কে? ভারতবর্ষ চায় স্বাধীনতা। তাহাদের এই অভিযানের সেই সারথিপদ অমিতদা কি লইবে না?

'যুক্তি-বিচার থাক, দায়িত্ব নাও অমিতদা।'

কিন্তু অমিত ইতিহাসের ছাত্র—রাজনৈতিক রথীসারথি নয়।

অভিমান-আহত হৃদয়ে সুনীল এস্রাজ লইয়া বসিল। গানের আসরে জমিয়া গেল। শ্রান্ত মানুষের দলে সুনীলের মতো উৎসাহী যুবক আসিয়া পড়িয়াছে—তাহার কান আছে, গান বোঝে, এস্রাজেও আছে বেশ মিষ্টি হাত। আসর জমিল। অমিতকেও সে দূরে থাকিতে দিল না। সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সঙ্গীতকে ভয় করিত অমিত। ভালো সঙ্গীতের মধ্য দিয়া সে যেন বিশ্ব-রহস্যের বিবক্ষস্পন্দন শুনিতে পায়। ফৈয়জ খাঁর সেই খেয়ালখানা! বায়ুস্তরের বিচিত্র এক আলোড়ন মাত্র সেই খেয়াল, বলিবে পদার্থ-বিজ্ঞান। কিংবা, উহার মধ্যে দিয়াও এক সামাজিক সত্য আপনাকে প্রকাশিত ও বিকশিত করিয়া চলিয়াছে, বলিবে সমাজ-বিজ্ঞানী। অমিত ভাবিয়া পায় না, কী সেই সত্য। শুধুই সামন্ত যুগের একটা আলস্যবিনোদন মাত্র ধ্রুপদ ও খেয়াল? ইহার এই যুগান্তরে কোনো আবেদন নাই—আজ ও আগামী কালের সঙ্গে এই মল্লারের দ্বন্দ্ব!

সুনীল নিরঞ্জনকে নিজ পক্ষে পাইল। কিন্তু বই সুনীল পড়িতে চাহিল না। কি হইবে তর্ক পড়িয়া? যুক্তিশক্তিতে সুনীলের কোনো বিশ্বাস নাই। তর্ক তো তাহার ছোট দাদা অনিল দত্তও করিতে পারেন;—তিনি অমিতের সহপাঠী বন্ধু। 'সন্ত্রাসবাদ' যে মধ্যবিত্ত বেকার-সমস্যারই একটা বিসদৃশ রূপ, এই কথা তাঁহার মতো ইকোনমিক্সের এম-এ'রা অমিতদার মতো ইতিহাসের এম-এ'দের নিকটে সহজেই প্রমাণ করিতে পারে। তর্ক করিতে কি কম অপটু সুনীলের বউদিরা—ফিল্ম ও ভয়েল ছাড়াইয়া যাঁহাদের বিদ্যা কলেজের পথে বিপথগামী হয় নাই? অথচ তর্ক করিয়া, লেনিন পড়িয়া, প্রস্তুত হইতে হয় নাই তাহার ছোট বউদি ললিতাকে। গাম্ভীর্য-গভীরতা-হীন চঞ্চল ললিতা আপনার সহজ বুদ্ধির বশেই তবু সুনীলের প্রেরিত ছেলেটিকে

পুলিশের ফাঁদ হইতে সেবার বাঁচাইল। অনিল দত্তের মারফত সংবাদ পাইয়াও পুলিশ তাহাকে ধরিতে পারিল না অবশ্য অনিল দত্ত ললিতাকে এ জন্য ক্ষমা করে নাই। গুম হইয়া গিয়াছে ক্রোধে। এবারও গোপনে-গোপনে সুনীলের দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ললিতাই আপীল চালায়; তাই সুনীলের দ্বীপান্তরও ঠেকানো গিয়াছে। ললিতাকে এইজন্য 'ক্যাপিটেল' পড়িতে হয় নাই—বাঙালী সমাজের নানা অপমান সহিত হইয়াছে। কখনো সত্য বলিয়া কখনো মিথ্যা বলিয়া হাসিয়া উড়াইতে হইয়াছে আত্মীয় পরিজনের বাধা, স্বামীর গঞ্জনা, শ্বশুরকুলের শাসন। হিটলারী বিচারগৃহে ডিমিট্রভের সবল আত্মপক্ষ-সমর্থনই কি একালের ইতিহাসের মহা-দুঃসাহসিক কাজ? বাঙালী মেয়ে, বাঙালী বধূর এই সরল প্রতিরোধ, স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন কিছু নয়? অতএব—

নিরঞ্জনের বাঙালী 'স্টর্ম ট্রুপার' সুনীল ও শেখর অদম্য উৎসাহে প্যারেড চালাইয়া যায়। জীয়াইয়া রাখে ওস্তাদি সঙ্গীতের আসর।

সুনীল জানিত—সুনীলের জন্যই অনিল দত্তের চাকরি লইয়া গোলমাল বাঁধিয়াছিল। কিন্তু দাদাবাই কেহ জানাইলেন—'ছোট বউমা' বরাবরই অবুঝ। বরাবরই অনিলকে বলিতেন—'চাকরি ছাড়ো, তুমি ব্যারিস্টার হয়ে এসো।' চাকরিটা অনিল রাখিতে পারিল না—শেষ পর্যন্ত বউমা'র বাড়া-বাড়িতে। বাধ্য হইয়াই সে ব্যারিস্টার হইতেই বিলাত যাইতেছে। ততদিন ললিতা পিতৃগৃহেই থাকিবে। তবে ললিতাকে লইয়া দত্তদের আরও কত ভুগিতে হইবে তাহার ঠিকানা কী? 'ছোট বউমার' জন্যই অনিলের চাকরি গেল।

সুনীলের মনে একটা অস্বস্তি জাগিয়া উঠিল। তাই মাত্রা বাড়ে প্যারেডের ও সঙ্গীতের।

অমিতই সুনীলকে একদিন বলিল সঙ্গীতই কি চরম কথা? পঁয়ত্রিশ কোটি মানুষের মুক্তি-সমস্যায় কত গৃহ-সংসার ভাঙিয়া যায়;—আর সঙ্গীতে সেই সত্য চাপা দিবে সুনীল?—সংশয় ও প্রশ্ন জাগে ক্রমে সুনীলের মনে। অমিত জানাইল—কাজের কষ্টিপাথরে যাহা গ্রাহ্য হয় তাহাই না হয় পরে

সুনীল গ্রহণ করিবে। কিন্তু ততক্ষণ সুনীল ও শেখর দেশের সেই সমস্যাটা চিনিয়া বুঝিয়া লউক।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে কষ্টিপাথরে সেই দাগ পড়িল। দাগ পড়িল এবার শেখরের চিত্তে—এবং পুরাতন বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল।

'শেখরকেও বর্জন করিলাম—বর্জন করিলাম', তখন সুনীল স্থির করিল। অসহিষ্ণু সে ? হাঁ, সে অসহিষ্ণু, কারণ সে স্বদেশে বিশ্বাসী।

বন্ধুর বন্ধন ছাড়া যেখানে আর কিছুই নাই. সেখানে এই বন্ধুবিচ্ছেদ রক্তাক্ত ভয়ঙ্করতায় বিকৃত হইতে বাধ্য।

'প্রতিশ্রুতি দাও, আমরা ভারতবর্ষের বিপ্লবী।'—সুনীল অমিতের নিকটে প্রস্তাব করিল।—'কোনো সম্পর্ক নেই শেখরের সঙ্গে—'

অমিত জানায়ঃ অন্যায় হবে এমন প্রতিশ্রুতিদান—কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে গিয়ে দেখি না কী হয়।

সুনীল তাহা মানিবে না, অমিত শেখরকে বর্জন করিবে না, সুনীলকে প্রতিশ্রুতি দিল না। সুনীল তখন অভিমান করিল। শেষে আরও দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হইল খেলায়, গানে, প্যারেডে।

বন্দিজীবন তখন পর্বান্তরে চলিয়াছে। প্রত্যেকটি বন্দি-চিত্তে নানারূপ প্রশ্ন আসিয়া হানা দিয়াছে। অনিশ্চিত অবরোধ আর ফুরায় না, ফুরায় শুধু দিন মাস বৎসর। ফুরায় শুধু পিতা-মাতার আয়ু; ভ্রাতা, বন্ধু প্রিয়জনেব আয়ু। ফুরায় নিজের আয়ু, নিজের যৌবন; স্বপ্ন, কামনা, কল্পনা দুঃসাহসিক জীবনের দাবি। আর ফুরায় বিরাট পৃথিবীব সংগ্রামে সহযোগী হইবার শুভদিন।...রোগ-জর্জর দেহে শক্ত সবল কারাবদ্ধ যৌবন পঙ্গু হইয়া পড়ে। যক্ষ্মা বন্দিশালার কোটরে কোটরে আসিয়া বাসা বাঁধে। পিত্ত অম্ল, যকৃতের শূলে-শেলে দেহ ছিন্নভিন্ন করিয়া আনে।...তারপর ভাঙিয়া পড়ে সেই মন্দির—সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো। অস্ত্রোপচারের শেষে রক্ত বমন করিতে করিতে শেষ হইয়া গেল দেবেন ঘোষ। রোগের জ্বালায় হাসপাতালের কক্ষে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল যতীন সেন। নরেশ বোস আত্মহত্যা করিল—কেন? পুলিশের অত্যাচারে না, বিশ্বাসঘাতকতার অনুশোচনায়? ফণী

চাটুজ্জে পাগল হইয়া গেল—শুধু এটেব্রিনের সাময়িক প্রতিক্রিয়ায়? কিন্তু এবার মুখ থুবড়াইয়া পড়িতেছে ব্যাহত-শক্তি যৌবন—একে একে উন্মাদ হইয়া গেল বিনোদ লাহিড়ী, সুরেশ চন্দ; তারপর তাসের চ্যাম্পিয়ান হরেনদা, জিমনাষ্টিকের চ্যাম্পিয়ান সুবল সেন। প্রতি সপ্তাহে নতুন দুঃসংবাদ। এখানে-ওখানে প্রতি চক্ষে আশঙ্কা কাঁপিতেছে। নিজের সুস্থ মস্তিষ্কের উপর কাহারও আর বিশ্বাস নাই।

কিন্তু বিশ্বাস চাই। স্থির বিশ্বাস চাই। বিশ্বাস চাই নীতিতে, বিশ্বাস চাই আপন শক্তিতে। তবে বিশ্বাসের সেই ভিত্তিতে চাই যুক্তি, বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তা, প্রমাণ, সাক্ষ্য। অমিতের এই কথা সুনীল এবার স্বীকাব করিল। সুনীলও তাই এবাব বই লইয়া বসিল অমিতের সঙ্গে। কিন্তু শেখরকে সে ক্ষমা করিবে না।

সুনীলও বুঝিতে বসিল কালের সমস্যা। সে সমস্যাব যে স্বরূপ বোমাবিধ্বস্ত গুয়েনিকা, বার্সিলোনার মধ্য দিয়া স্পেন তাহার সম্মুখে ধরিয়াছে তাহাই কি সুনীলের আপন সমাজ, আপন সংসাবও তাহার সম্মুখে তুলিয়া ধরে নাই—ললিতার নির্যাতনের মধ্য দিয়া!

নিরঞ্জনের সঙ্গে এবার সুনীলের তর্ক বাধিল। দূব হইতে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিল শেখব, জ্যোতির্ময়। তীক্ষ্ণ, তীব্র, উগ্র সুনীল—হাঁ, সে অস্থির, কারণ, সে বিশ্বাসের মধ্যে ফাঁকি সহিতে পারিবে না।

আবার সে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল—নিরঞ্জনকে বর্জন করিতে হইবে। বন্ধুবিচ্ছেদের বিকৃতি আরও বুঝি উগ্র হইয়া উঠিতেছে। অমিত কিন্তু নিরঞ্জনের বন্ধুত্ব পরিত্যাগ করিবে না।

'তোমার এ আত্মছলনা। আমি তা প্রত্যাখ্যান করি।' অসহিষ্ণু সুনীল তীব্র কণ্ঠে অমিতকে জানায়। যুক্তিতে, নিষ্ঠায়, আগ্রহে ফাঁক রাখিবে না সুনীল। 'আবিরাবির্গ এধি।' হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণ মুখ দেখিতে চাহে না সুনীল দত্ত, সে পরিত্রান চাহে না। হিরণ্ময়-পাত্র দূর করিয়া, চূর্ণ করিয়া এ মর্তের সত্যকে সে দেখিবে, দেখিবে দেখিবে।

'The International unites the human race.'—সুনীল দত্ত ঘোষণা করিল।

অমিতকে বলিল, সভায় চলো। জেলে বা যুদ্ধক্ষেত্রে যায় আসে না—চলো, আমরা সেই সংঘ গড়ব-- ইন্টারন্যাশানালের নামে শপথ নিয়ে।

অন্যায় হবে তা কর্মক্ষেত্রে না নামলে।

কর্মক্ষেত্র সর্বত্র—এখানেও বিস্তৃত।

না, অমিত কোনো দলে যোগ দিবে না।

তুমিও তবে আমাদের নও, অমিদা? আহতের আর্তনাদের মতো কথাটা বাহির হইল স্নীলের মুখ হইতে।

স্নীলের প্রয়াস ব্যর্থ হইল। অমিতদার অভাবেই ভাঙিয়া গেল তাহাদের দল গঠনের আয়োজন। স্নীলের স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। ভাঙিয়া গেল—ভাঙিয়া গেল, ভাঙিয়া গেল।···

ঠিক সেই সময়ে ক্ষুদ্র একটি পত্র আসিয়া অকস্মাৎ আঘাত করিল। স্টোভ-এর আগুন কেমন করিয়া শাড়িতে ব্লাউজে লাগিয়া যায়; তারপর আর ললিতা নাই।

চিড় খাইয়া গেল স্নীলের আকাশ!

একটি স্নন্দব শুভ্র প্রভাত যেন অমিতেব চক্ষের উপরে মধ্যাহ্ন হইতে না হইতেই মিলাইয়া গেল। প্রভাতের কলকণ্ঠ কাকলির মতো ছিল ললিতা। ঝর্ণার জলের মতো স্বচ্ছ, স্বতঃপ্রবাহিতা। হাসিতে কথায় আপনি ফুটিয়া উঠিতেছে, পৃথিবীর সব কিছুতেই খুশী হইয়া উঠিতেছে। ললিতাকে বুঝি অমিত ভালোও বাসিয়াছিল—যেমন ভালোবাসে অমিত ঝর্ণার জল, তরাইর উড়িয়া-যাওয়া প্রজাপতি, প্রাণোজ্জ্বল জীবন-রসেব স্বচ্ছতা। সেই ভালোবাসা আনন্দ হইতে মত্ততায় পরিণত হইতে পাবিত কি? সেই প্রীতি-কৌতুক কি যৌবন-বেদনায় রূপান্তরিত হইতে পাবিত না? কিন্তু কি হইতে পাবিত, তাহা কল্পনা করাই চলে। কারণ সত্য যাহা তাহা এই—সহজ নিশ্চিন্ত চিন্তা সেই তরুণী স্নীলের ও অমিতের সরল মমতাময়ী বান্ধবী ছিলেন। অজিকার ধ্বংসধর্মী কাল তাহাকে সহ্য করিতে পারে না,—ইহাই বুঝিবার মতো কথা অমিতের পক্ষে, স্নীলের পক্ষে, সকলের পক্ষে।

সমস্তটা দিন স্নীল এস্রাজ বাজাইল। আজ তাহার সঙ্গীতেরই প্রয়োজন।

উগ্রতা নাই, উচ্ছ্বাস নাই। 'আজিকে সকল শান্তি, সব ভুল সব ভ্রান্তি।' ললিতা নাই; অমিতও আর তাহার জীবনে নাই। অমিত সুনীলকে সান্ত্বনা দিতে গেল। সুনীল কথা বলিল না, শুধু স্তব্ধ হইয়া রহিল। এস্রাজ বাজাইয়া চলিয়াছে সুনীল। বাজাইতে বাজাইতে তাহার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে সুনীল। কেহ তাহাকে বাধা দিল না—কাহারও দিকে সে ফিরিয়া তাকাইল না।

অমিত বুঝিল আজ সুনীল নিজেকে খুঁজিতেছে, তাই তাহাকে আজ সঙ্গীতে পাইয়াছে। সঙ্গীতেই বুঝি বিশ্বের পরিচয়। অমিত উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

তারপর? শুধু এস্রাজটা রহিয়াছে অমিতের ঘরে, সুনীল নাই। আছে দড়িতে লম্বমান সেই সুন্দর যৌবন-পুষ্ট দেহের শেষ বিকৃত চিহ্ন। অমিত তাহা দেখিতে চাহিল না। একটি পংক্তি কোথাও কাহারও জন্য লেখা নাই। একটি অভিযোগ কোথাও কাহারও উদ্দেশ্যে নাই। একটি অনুরোধ নাই কোথাও কাহারও নিকট। অমিতের উদ্দেশ্যেও নাই কোনো অভিমানের আঘাত।

যেখানে পুষ্করের জলে সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিতাভস্ম মিশিয়াছে, মিশিয়াছে আরও কত জনের—সেখানে মিশিয়া গিয়াছে সুনীলের দেহ-শেষ।

আর আকাশে আকাশে রাখিয়া গিয়াছে সেই প্রশ্ন—তুমি কাহাদের অমিত, কাহাদের? সুনীল তাহাকে এই প্রশ্ন ভুলিতে দিবে না।

সুনীল দত্তের নাম অমিত আর মুখে আনে নাই—নাম করিত না অমিত যেমন ইন্দ্রাণীর। হৃৎপিণ্ডের সংকোচ-প্রসারের মধ্যে সেই অস্থিরপ্রাণ অনুজের জীবনের সাক্ষ্য জীবন্ত হইয়া ছিল; হৃৎপিণ্ডের আর-এক কোঠায় বসিয়া অজ্ঞাতসারে ইন্দ্রাণীও ছিল তেমনি অমিতের প্রাণকে আপনার দৃঢ়মুষ্টিতে আঁকড়াইয়া ধরিয়া। সাধ্য কি অমিত কাহাকেও ছাড়াইয়া যাইবে—সাধ্য কি অমিত তাহাদের জীবনের এই সাক্ষ্য না শুনিয়া পারিবে?

…'তুমি আমাদের, তুমি আমাদের'—কত মুখ এই অন্ধকারে ভিড় করিয়া আসিতেছে। আজিকার সমস্ত দিনের অতিব্যস্ত দৃষ্টিতে দেখা সেই বন্ধু-মুখগুলি অন্ধকারে ফুটিয়া উঠিতেছে… শশাঙ্কনাথ ও নিরঞ্জন, ভুজঙ্গ সেন ও বিভূতিনাথ,

রঘু ও গফুর, সেই কাঠে-বাঁধা বারীন নন্দী ও উন্মাদাগারের বিনোদ লাহিড়ী, পুকুরের জলে মিশিয়া-যাওয়া সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় আর সুনীল দত্ত ··

আবার, অমিত অনুভব করিতেছে তাহার চারিদিকে তাহার আপন জীবনের অপরিহার্য দাবি—ঘরে, বিছানায়, প্রাচীরে আজন্মের পরিচিত স্বর, মায়া-মমতার স্পর্শ, মৃত্যুপারের দেহাঘ্রাণ, জীবন্মৃত জীবনের মূঢ় আকৃতি, ভ্রাতা-ভগিনীর স্নেহ-শ্রদ্ধায় মধুময় এই পৃথিবীর রজঃ, এই গৃহ-পথ। এই গৃহের প্রত্যেকটি ধূলিকণায়ও কি সেই প্রশ্ন নাই—'তুমি কি আমাদের নও, অমিত ?'

তথাপি অমিত অনুভব করিতেছে ব্যষ্টিজীবনের বাহুবন্ধন যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে—'কাব্য-গ্রন্থাবলী'র পাতায় আর তেমন করিয়া অমিতের চোখে পড়িবে না। সেখানকার অক্ষরের মধ্যে এখন শশাঙ্কনাথের অনুভূতি, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিবে। শেক্‌স্‌পীয়রের পাতা খুলিয়া জীবনের সেই বেদনা-মহৎ রূপ দেখিয়া আর মাতিয়া উঠিবে না অমিত। মানব-মহাবিদ্যালয়ের মূর্তিমালা সেখানে বসিয়া যাইবে—রঘু ওড়িয়ার শ্রীহীন দৃষ্টি··· বিনোদ লাহিড়ীর উন্মত্ত প্রলাপ। অমিত ইতিহাস আবার পড়িবে—কেম্‌ব্রিজ হিস্টরি, অমনি দেখিবে Life marches, আর বেত্রারক্ত বাঙালী বালকের ঘোষণা রাসেল বা টয়েনবির সমস্ত তত্ত্বকে ডুবাইয়া দিয়া তখন বলিবে: 'আই চ্যালেঞ্জ দি ব্রিটিশ এম্‌পেয়ার।'·· তবু পাখা ঝাপটাইতেছে তাহার এক কালের ব্যক্তি-প্রাণের আশা আনন্দ স্বপ্ন কল্পনা,—এই বন্ধ কাঁচের আলমিরায় মধ্যে পড়িয়া পাখা ঝাপটাইতেছে। তাহার অতীত হইতে তাহার বর্তমানের মধ্যে প্রবেশ-পথ উহা পায় না। কাঁদিয়া ডাকিতেছে, "অমৃতলোকের অধিবাসী তুমি অমিত, কাব্য গান রূপ রসের পূজারী। পৃথিবীর চিরন্তন সত্যের সাক্ষী তুমি, অমিত, প্রেম প্রীতি স্নেহ মমতায় বিমুগ্ধ। অমিত, তুমি আমাদের, তুমি আমাদের ;—আমরা তোমার স্বপ্ন, তোমার প্রাণের প্রাণ, তোমার আত্মার আত্মীয়।"

মিথ্যা কথা। না, না, অমিত, লেখা নয়, চিন্তা নয়। সেই ধ্যানের আসন তোমার নয়। তুমি পথের মানুষ পথচারী। কর্মেই জীবনের পরিচয়, only in action do we know reality ·· কর্মেই এযুগের পরিচয়—অমিতের পরিচয়।

অসহ্য যন্ত্রণায় অমিত আবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মহাকাশের মুখামুখি দাঁড়াইয়া আপনার পরিচয় সে ঘোষণা করিবে।

শান্ত স্তব্ধ আকাশের আশীর্বাদ, উন্মুক্ত পৃথিবীর আলিঙ্গন অমিতকে ঘিরিয়া ধরিল। তাহার আলোকে অমিত আপনার অতীতকে ভবিষ্যৎকে পাইতে চায়। ছয় বৎসরের জীবনেব দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠে: 'ধরণীর বিকৃত দুস্বপ্নকেও দেখিয়াছি। দেখিয়াছি ব্যর্থ প্রয়াসের মধ্যে সার্থক মনুষ্যত্ব,—ভাঙা দেউলের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় দেবতার অধিষ্ঠান। ধূলি-ধূসরিত পথের মোড়ে দেখিয়াছি দিগন্ত-জোড়া আবির্ভাব প্রেমেব দেবতাব, মানব-মহাতীর্থের দিকে যাত্রার আহ্বান, অনন্ত সংঘাতের মধ্য দিয়া জীবনের পবম পবিণতির ইঙ্গিত':

আনন্দে অমিতের চিত্ত অভিষিক্ত হইয়া উঠে।—আপনার মধ্যে আপনি সে শ্রদ্ধায় প্রেমে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, বলিতে চাহে: 'অপরূপ, অপরূপ!' বাত্রিশেষের তারাব উদ্দেশ্যে অমিত বলিতে থাকে, 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গুরুগৃহ হইতে আমি অমিত আজ নতুন সংসাবে এই সত্য লইয়াই আসিয়াছি—বড় সুন্দর, বড় সুন্দর মানুষের মুখ—অপরাজেয় এই মানুষেব মিছিল। '

কিন্তু শুধুই কি 'অপরূপ'? মরুভূমির বুকের উপরেও এমনি করিয়া তাকাইয়া থাকিত রাত্রিশেষের তাবা—নিদ্রাহীন অমিতের দিকে—সুনীলের দিকে। কি কহিত সেই তারা? কি কহে আজ: "তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? "

দূরেকাব কোনো দেবালয়ে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—বুঝি কোনো দেবতা জাগিতেছেন। আবও দূবে গঙ্গাব বুকে স্টিমারের বাঁশি বাজিল—স্রোতের বুকে মানুষেব জীবনযাত্রা জাগিতেছে। পূর্ব সীমান্তেব কোনো কারখানায়—হয়তো বা ল্যান্‌সডাউন জুট মিলেই—সাইবেন্‌ চিৎকার করিয়া উঠিল…বিশ্বকর্মার সৃষ্টিশালাব দুয়াব খুলিতেছে। অমিত ফিরিয়া তাকায়—চিমনির মুখে ধোঁয়া উঠিতেছে। একটা বক্রকুণ্ডলী শবতের উষাকাশকে কুৎসিত করিয়া চলিয়াছে।…

অমিত তাকাইয়া থাকে, অপলক চক্ষে তাকাইয়া থাকে। আকাশের পার হইতে তেমনি সেই নক্ষত্রেব প্রদীপ্ত জিজ্ঞাসা নামিয়া আসিতেছে পৃথিবীর পানে, মানুষের মাথায়, অমিতের মুখের কাছে:

"তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ ?"

অসংখ্য মুখের অসংখ্য প্রশ্ন জ্বলিতেছে এই দীপ্তিতে, এই একটি প্রশ্নে। আর জ্বলিতেছে অমিতের কত দিন কত রাত্রির জাগরণে চিন্তায় অনুভূত, আহৃত সত্যও...

'ইতিহাস ক্ষমাহীন, কারণ, ইতিহাস সৃষ্টিশীল। আমি অমিত ইতিহাসের ছাত্র ; ইতিহাসের অস্ত্রও। ক্ষমা করিলেও ক্ষমাহীন বন্ধুর পথের পদাতিক আমি, স্বাগত করি ইতিহাসের সৃষ্টিশক্তিকে !'

রাত্রি-শেষের পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছে কারখানার বাঁশির ডাকে কারখানার মানুষ।

——————